পটভূমি কলকাতা

বিজয় দত্ত

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬২

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৮

প্রচ্ছদ : শেখ জান মহম্মদ

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

আমার পুনর্জীবনদাতা
ডাঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে, গত কয়েক বছর যাবৎ পাঁচ শতাধিক উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ও-গুলি এক অসাধু জুয়াচোরের কাণ্ড। আমার লেখার জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহু লোক ওই নামে পুস্তক প্রকাশ করে আমার পাঠকবর্গকে প্রতারণা করছে। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

বিমল মিত্র

ভূমিকা

অতুল সুর

মনে নেই কথাটা কোথায় পড়েছিলাম। কিন্তু কথাটা এখনও মনে আছে। কথাটা হচ্ছে : 'The world is full of goody-goody people but hardly a good man.' পৃথিবীতে গণ্ডা গণ্ডা দৃশ্যত ভালোমানুষ লোক দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু একজন সত্যিকারের ভালোমানুষ পাওয়া কঠিন। কেন কঠিন? তার উত্তর দিয়েছিলেন আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে একজন গ্রীক দার্শনিক। নাম তাঁর প্লেটো। প্লেটোর সেই স্মরণীয় উক্তিটা বিমল মিত্র প্রতিধ্বনিত করেছেন তাঁর 'রাগ-ভৈরব' উপন্যাসের একেবারে শেষাংশে ভৈরব-বাবুর মুখ দিয়ে। উক্তিটা হচ্ছে : 'The punishment that the wise and good men of a country, who decline to take interest in the affairs of his country, must suffer,—is to be gladly ruled by the rest, viz. fools and knaves.' দেশের জ্ঞানীগুণীরা যখন দেশের হিতসাধনে মন না দিয়ে, প্রসন্নচিত্তে দেশের শাসনভার ন্যস্ত করেন পাজী ও মূর্খদের হাতে, তখন তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হয়। অথচ যাঁরা সৎকাজ করতে প্রবৃত্ত হন, তাঁদেরও আত্মাহুতি দিতে হয় নির্মম নিয়তির কাছে। যেমন যীশুখ্রীস্টকে ক্রুশ-বিদ্ধ হতে হয়েছিল, জোয়ান অভ্ আর্ককে আগুনে দগ্ধ হতে হয়েছিল, গান্ধীজীকে আততায়ীর হাতে নিহত হতে হয়েছিল, বা বিমল মিত্রের 'আসামী হাজির' উপন্যাসের সদানন্দকে, 'রাগ-ভৈরব'-এর ভৈরববাবুকে, বা 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' উপন্যাসের লোকনাথকে। দস্তয়েভস্কির 'ইডিয়ট' লেখার কাল হতে আজ পর্যন্ত অনেকেই সেই 'সৎ' লোকের চরিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিমল মিত্রের মতো কেউই সক্ষম হননি। সেখানেই বিমল মিত্রের লেখার সার্থকতা। সেখানেই তাঁর শিল্পী-জীবনের সাফল্য।

'পটভূমি কলকাতা' একখানা উপন্যাস নয়। তিনখানা উপন্যাসের সমাহার। এই তিনখানা উপন্যাসই বিমল মিত্রের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ছাপ বহন করে। লেখক দ্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা, যা দেখেছেন, তাই তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সংলাপের মাধ্যমে। ফলে তিনখানা উপন্যাসই হয়ে দাঁড়িয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের বিশ্বস্ত দলিল। সমাজজীবনের এক বিশিষ্ট ইতিহাসও বটে। তিনি মানুষের জীবনধারাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ঋদ্ধিবান ও ঋদ্ধিহীন, এই উভয় শ্রেণীর লোকেরই জীবন-ছন্দের উত্থান-পতন ফুটিয়ে তুলেছেন পাঠকের চোখের সামনে। তার ফলে তাঁর উপন্যাসগুলি মনুষ্যজীবনের অনুপম মহাকাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পটভূমি কলকাতা

প্রথম উপন্যাসখানার নাম হচ্ছে 'রাগ ভৈরব'। নামটা অনেকের কাছেই বিচিত্র ঠেকবে। কিন্তু যাঁরা উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন, এটা খেয়াল সঙ্গীতের একটা রাগ-বিশেষ। এই নামের পিছনে লুকিয়ে আছে মাত্র এই উপন্যাসের কাহিনীর বীভৎসতাই নয়, লেখকের নিজ জীবনের প্রথম দশার অনুরাগ ও সাধনার স্মৃতি। বিমল মিত্রের উপন্যাসসমূহ নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এমনকি নেপালী ভাষাতেও। সেজন্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে, দেশের নানা অংশে ছড়িয়ে আছে তাঁর হাজার হাজার গুণমুগ্ধ পাঠক। কিন্তু তাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই তাঁর জীবনের প্রথম দশার অনুরাগ ও সাধনার কথা জানেন। অথচ কোনও লেখকের শিল্পকর্মের মূল্যায়ন করতে হলে সেটা জানার এক জরুরী প্রয়োজন আছে। কলকাতা শহরেই তাঁর জন্ম, কলকাতা শহরেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, কলকাতাতেই তিনি মানুষ হয়েছেন, এক কথায়, তিনি কলকাতারই মানুষ। এ-রকম মানুষ কলকাতা-প্রেমিক না হয়ে থাকতে পারেন না। সেজন্যই আমরা দেখি যে, তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেরই পটভূমি কলকাতা। সর্বদ্রষ্টা হয়ে কলকাতার সমাজজীবন তিনি হন্দমুন্দ দেখেছেন, চিনেছেন, আর কলকাতার অতিক্রান্ত সমাজজীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য দিনের পর দিন তিনি 'জাতীয় গ্রন্থাগার'-এ নিবিড় অনুশীলন ও গবেষণা করেছেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর দ্বিতীয় অবলম্বন, আসল অনুরাগ ছিল সাহিত্যসাধনার প্রতি। কিন্তু অন্তরায় ছিল অনেক। সসম্মানে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাস করলেন, পিতা আশা করলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যেমন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিমলও তেমনই চাকুরীক্ষেত্রে ঢুকে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করবে। কিন্তু চাকুরীর প্রতি ছিল বিমলের বৈরাগ্য। সাহিত্যসাধনার প্রতি তার অনুরাগ দেখে পিতা বিমলের প্রতি হলেন রুষ্ট। এই সংঘাতের মধ্যে পড়ে, বিমলের মন জর্জরিত হল দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে—দুই বিপরীত সত্তার লড়াইয়ে। কোন্ পথে অগ্রসর হবেন তিনি? চাকুরী-জীবনের নিশ্চয়তার পথে, না সাহিত্যিক জীবনের অনিশ্চয়তার পথে? শেষ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হয়ে চাকুরীর পথেই পা বাড়ালেন। কিন্তু সেখানে পেলেন না তিনি স্বস্তি ও আনন্দ, যে আনন্দ চেয়েছিল তাঁর সাহিত্যিক সত্তা। শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক-সত্তারই জয় হল। মাত্র একজনের কথায়। সে একজন হচ্ছেন তাঁর এক নির্মম সমালোচক, নিজ সহধর্মিণী, তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখের অনুগামিনী। তিনি যখন স্বচ্ছন্দমনে 'গ্রীন সিগন্যাল' দিলেন, বিমলবাবু তখন ছেড়ে দিলেন তাঁর সরকারী উচ্চপদ এবং দাসত্বের স্মারক সরকারী পেনশন নিতেও অস্বীকার করে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হলেন। বরণ করলেন দেবী সরস্বতীকে, এবং তাঁর আশীর্বাদেই পরিণত হলেন বাংলা সাহিত্যের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী দিক্‌পালে।

'রাগ-ভৈরব' বহন করছে তার নামের সার্থকতা। সেদিন নটরাজ তার প্রলয়-

নাচন নেচেছিল কলকাতার বুকে। কাহিনীর ঘটনাবলী মাত্র নস্করপাড়া লেনের ঘটনা নয়। কলকাতার সর্বত্রই সেদিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মানবিক বর্বরতার নৃশংস হত্যাকান্ড। নকশালদের উৎপীড়নে কলকাতা সেদিন কেঁপে উঠেছিল শান্তিপ্রিয় সন্ত্রস্ত নাগরিকদের আর্তনাদে। আমি যে-পাড়ায় বাস করতাম সেটাই ছিল নকশালদের প্রধান দুর্গ। সূচনাটা হয়েছিল সকলেরই অজ্ঞাতসারে ও অতর্কিতে। প্রথম দিন কাগজে পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার পাড়ার মতো শান্তিপ্রিয় পাড়ায় খুন হয়েছে দুজন পুলিশ অফিসার। দুদিন পরে অফিসে বসে কাজ করছি, হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনটা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হু ইজ্ দ্যাট স্পিকিং প্লীজ?' উত্তর পেলাম, আর ইংরেজি ফলাতে হবে না, যা বলি, তাই শোন, তুমি এখন বাড়ি এস না। অপর প্রান্তে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? কি হয়েছে? বলল, সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে, আমাদের বাড়ির সামনে 'নিবেদিতা গার্ল স্কুলে'র বাসটা পুড়িয়ে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কারা? মেয়েগুলোর কি হল? উত্তরে আমার স্ত্রী বলল, কারা কি করে জানব। মেয়েগুলো ভয়ে বাস থেকে লাফিয়ে পড়ে আশপাশের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। দমকল এসেছে, পুলিশের ভ্যান এসেছে। দমকল ও পুলিশের ভ্যানে এলাকাটা ভরে গিয়েছে, তুমি এখন বাড়ি এস না।

তারপর দিনের পর দিন গিয়েছে আমাদের অতন্দ্র রজনী। দিনের বেলাতেও থেকেছি সন্ত্রস্ত হয়ে। নকশালরা আমার স্ত্রীর কাছে এসে দাবি করেছে, 'মাসীমা, আজ আমাদের দশগণ্ডা রুটি ও ডিমের কালিয়া দিতে হবে।' সেসব দাবি মেটাতে হয়েছে। 'প্রভা' শুধু নস্করপাড়া লেনেই ছিল না। আমাদের পাড়াতেও ছিল। সরু গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে পথচারীদের লক্ষ্য করত। অপরিচিত লোক হলেই তাকে পুলিশের গুপ্তচর ভেবে পিহনের মাঠে ধরে নিয়ে গিয়ে কোতল করত। আত্মীয়স্বজনদের মানা করে দিয়েছিলাম, তারা যেন ভুলেও আমাদের বাড়ি না আসে।

প্রভার বাবা ভৈরববাবু শান্তিপ্রিয় সৎ লোক। সেদিন নস্করপাড়া লেনে ভৈরববাবুর চোখের সামনেই খুন হয়ে গেল থানার দারোগা। পুলিশ তদন্তে এল। সন্ত্রস্ত পাড়ার লোক সকলেই বলল তারা কিছুই দ্যাখেনি। ভৈরববাবুও সেই কথা বলতে বাধ্য হলেন। মেয়ে ভৈরববাবুকে বলে, 'তুমি খাও-দাও, আরাম কর, তুমি ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেও না। মনে রেখ বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, নেতাজী, গান্ধী ভাঙিয়ে আর চলবে না। আজকের অবস্থা অন্য রকম, এর চিকিৎসাও চাই অন্য রকম।' ভৈরববাবু মেয়ের কথা শুনে স্তম্ভিত। আরও স্তম্ভিত হন, থানার নতুন দারোগা অধীরবাবু। তদন্তে এসে যখন তিনি প্রভাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এসব খুনখারাপী গুন্ডামি সমর্থন করেন? প্রভা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে থাকে, করি, করি, করি। কেন করব না বলুন?

গভর্নমেন্ট আমাদের জন্য কি করেছে যে সমর্থন করব না ? আপনাদের গভর্নমেন্ট আমাদের খেতে দিয়েছে ? এই বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার রিফিউজি এসেছে, তাদের কথা ভেবেছেন কখনও ? পাঞ্জাব থেকে যে-সব পাঞ্জাবী রিফিউজি এসেছে, তাদের ফেলে-আসা সমস্ত সম্পত্তির হিসেব করে পরিবার পিছু জমি, বাড়ি, টাকা সবকিছুর জন্যে কোটি কোটি টাকা দিয়েছে। আর বাংলাদেশের রিফিউজির বেলায় ? তাদের শুধু দিয়েছে ক্যাশ্ ডোল্। তাদের বেলায় শুধু ভিক্ষে। কোটি কোটি বাঙালী বাস্তুহারাকে শুধু ভিখিরির জাতে পরিণত করেছে। তবু বলছেন কেন আমি এই গুণ্ডামি সমর্থন করি ?

ভৈরববাবু কিন্তু সৎ লোক। পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন সেজন্য মেয়ে তাঁকে ঘরবন্দী করে রেখেছে। কিন্তু বিবেকের দংশন আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না। মেয়ের অজ্ঞাতসারে রাত্রে ছুটলেন থানায় সব ফাঁস করে দেবার জন্য। কিন্তু গিয়ে দেখলেন থানার ও.সি. তাঁর জবানবন্দী নিতে নারাজ। তিনিও বলেন, তাঁরও ছেলেমেয়ে আছে, তাঁকেও চাকরি করে খেতে হয়, তাঁকেও চাকরির প্রমোশনের কথা ভাবতে হয়। আবার যখন ভোট হবে, তখন আবার কোন্ পার্টি হোম্-মিনিস্ট্রি পাবে, তা ভেবে কাজ করতে হয়। ভৈরববাবু জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে কার কাছে যাব ? কার কাছে গিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার চাইব ? ও.সি. বলেন, আমাদের কেউ নেই ভৈরববাবু, আমরা অসহায়, হেলপ্‌লেস্। ইতিমধ্যে থানার এক সিপাই ছোট্টুলাল পার্টি অফিসে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দেয়। ভৈরববাবু থানা থেকে বেরিয়ে বিক্ষিপ্ত মনে ভাবতে ভাবতে চলেছেন, তবে কি একজনও সৎ মানুষ নেই ? তখন কোথা থেকে কারা এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভৈরববাবু মাটিতে লটকে পড়লেন। সেখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ছেলের দল ছুটে গিয়ে প্রভাকে বলল, প্রভাদি, আমাদের তুমি ক্ষমা কর, আমরা ভুল করেছি, আমরা চিনতে পারিনি। প্রভা উত্তর দিল, তোরা ভুল করিসনি, ঠিক করেছিস। তারপর নিজ ঘরে গিয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে বিছানার ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'চলো কলকাতা' উপন্যাসখানা স্বাধীন ভারতের সামাজিক ও নৈতিক জীবনে মূল্যবোধের অধঃপতনের এক কলুষিত কাহিনী। বিলেত থেকে কলকাতায় এসেছে জুডি হবসন ও তার সদ্যঃপরিণীতা স্ত্রী ক্লারা, ভারত স্বাধীনতা পেয়ে কিরকম হয়েছে, তা দেখবার জন্য। ইংরেজ আমলে জুডির খুড়ো ছিল গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী। ছুটিতে খুড়ো দেশে গেলে, এই বিচিত্র দেশ ভারত সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনাত জুডিকে। বলত, 'বড় আলসে জাত এই ইন্ডিয়ার নেটিভরা, ভীষণ ঝগড়াবাজ। যদি ইন্ডিয়াকে স্বাধীন করে দেওয়া হয়, সব গোলমাল করে ফেলবে ইন্ডিয়ার নেটিভরা।' এখন ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে, তাই জুডি এসেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ার রূপ দেখতে। কলকাতায় এসেছে 'হনিমুন' করতে।

আশ্রয় নিয়েছে অভিজাত 'হোটেল স্ট্র্যাণ্ডে'। দমদম বিমান বন্দর থেকে সিধে চলে এসেছে এই হোটেলে। ক্লারার প্রতিক্রিয়া—'ন্যাস্টি হোটেল, আর ন্যাস্টি সিটি। এই সিটিরই গর্ব করত তোমার আন্‌কেল্? কিন্তু হোয়াই সো ডার্টি টাউন?' কেন এত নোংরা?' কাল নেটিভ টাউনটা ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছে দুজনে। বড় পুওর পিপল্ সব। পুওর কান্ট্রি। এই নাকি এককালে ছিল সেকেন্ড সিটি অভ্ দি ব্রিটিশ এম্‌পায়ার। হিজ মেজেস্টিজ্ প্রাইড্। শুনেছে, জুডির খুড়ো বলত বাঙালীরা হচ্ছে ভীষণ ঝগড়াটে জাত। কেউ কারোর ভালো দেখতে পারে না। কারোর কিছু ভাল হলে জ্বলে পুড়ে মরে যায়—ইন্ডিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কোয়ার্‌লিং রেস্। আজ বিকেলে দেখে এসেছে গভর্নর-হাউসের সামনে রাস্তার দিকে মুখ করা একটা কামান। জুডি বলে ওটা চাইনিজ কামান। ওই কামান দিয়েই এতদিন বাঙালীদের শায়েস্তা করে রেখেছিল ইংরেজরা। এখন ঠিক তেমনি করে ভারতের স্বাধীন সরকার শায়েস্তা করে রেখেছে বাঙালীদের।

ক্লারা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চলে গেল কেন? জুডি বলে, এই বেঙ্গলীদের জন্য। এরা কারো অথরিটি মানে না। আমাদের অথরিটি মানেনি। আজ নিজেদের গভর্নমেন্টের অথরিটিও মানছে না। আমরাই একদিন নেটিভদের ইংরেজি ভাষা শিখিয়েছি। কোটি কোটি টাকার বই আমরা ইন্ডিয়ায় পাঠিয়েছি। কিন্তু সেইসব বই পড়েই নেটিভদের একদিন চোখ খুলে গেল। তারা ভাবতে শিখল যে তারাও মানুষ। নেটিভদের মধ্যে একটা একটা করে গজিয়ে উঠতে লাগল ম্যাটসিনি, গ্যারিবলডি, আর উইলিয়াম দি কন্‌কারার।

স্ট্র্যান্ড হোটেলের আর্কেডে বসেই কথা হচ্ছিল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে ক্লারা ইন্ডিয়ার নেটিভদের দেখছে। হঠাৎ বলে উঠল, 'জুডি, দ্যাখ দ্যাখ হাউ বিউটিফুল'। বলেই ক্যামেরাটা সেদিকে ধরে একটা ছবি তুলে নিল। যে ছবিটা তুলল, তা অনেক পয়সায় বেচবে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে। ছবিটা জয়চণ্ডীপুরের বুধবারীর। বুধবারী চলেছে কালীঘাটে মায়ের দর্শনে, কাঁধে একটা ছাগল আর তার কাপড়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা বুড়ী মা ও স্ত্রী, পাছে তারা শহরের ভীড়ের মধ্যে ছিটকে পড়ে।

কিছু পরেই দেখল এক মিছিল। লোকগুলো চেঁচাচ্ছে, বলছে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। ওই মিছিলেই আছে হারান নস্কর লেনের অরবিন্দ। অরবিন্দর বোন সুসীই হচ্ছে 'চলো কলকাতা'র প্রধান নায়িকা। অরবিন্দ বেকার। বাড়িতে বৃদ্ধা মা, যক্ষ্মায় আক্রান্তা স্ত্রী, আর অবিবাহিতা বোন সুসী। শুধু পার্টির মিছিলে গেলেই অরবিন্দের হাতে আসে দু-এক টাকা। তা না হলে 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র মালিক দিলীপের সাহায্যেই তার সংসার চলে। সুসী কলেজে পড়ে। কিন্তু কোথা থেকে সে নতুন নতুন সিফন শাড়ি ও দামী জুতো পায়, তা নিয়ে কোনদিনই কেউ মাথা ঘামায় না। সুসী রোজ কলেজ যাবার নাম করে

একখানা খাতা হাতে করে বেরিয়ে পড়ে। সোজা গিয়ে ওঠে পূর্ণ থিয়েটারের সামনে একটা সরু গলির ভেতর বেণুদির তিনতলা বাড়িতে। বেণুদি করপোরেশনের ভ্যাকসিনেটার। সকালে কাজে বেরোয়, আর দুপুরের পর মেয়ে ভাড়া দেবার কারবার চালায়। কলেজের ছেলেরা তার ক্লায়েন্ট। মেয়েরা তাদের সঙ্গ দেয়। সিনেমায় যায়। সব খরচ-খরচা বাদে মেয়েদের দশটাকা রেট। তারপর যদি লেকে যায়, বা অন্য কোথাও যায় তো ঘণ্টা পিছু আরও দশটাকা করে দিতে হয়। এটা চলমান কলকাতা সমাজের এক সজীব চিত্র। কেননা, বেণুদি শুধু ভবানীপুরেই নেই, শ্যামবাজারেও আছে। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি।

দু'নম্বর টাকার মালিক জুয়েলারস্ ও ডিলারস্ শিরীষবাবুর নজর পড়েছে সুসীর ওপর। ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দিলীপই অরবিন্দর সঙ্গে শিরীষবাবুর আলাপ করিয়ে দেয়। শিরীষবাবু অরবিন্দের বাড়ি যায়, ওর মায়ের জন্য এক হাঁড়ি করে রাবড়ি নিয়ে। মা তাতে বিগলিত হয়ে যায়। কিন্তু অরবিন্দ সুসীকে একদিনও শিরীষবাবুর সামনে আনতে পারল না। শিরীষবাবু এর প্রতিশোধ নেবার জন্য কৃতসংকল্প। চর লাগিয়ে সুসীর গতিবিধি বের করে ফেলল। এক পাঞ্জাবী ছেলেকে ক্লায়েন্ট সাজিয়ে বেণুদির ওখানে পাঠিয়ে দিল। ওই পাঞ্জাবী ছোকরা সুসীকে নিয়ে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে ওকে একেবারে পটিয়ে ফেলল। লেকে গিয়ে দুজনে বসল এক ঝোপের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে শিরীষবাবুর নিযুক্ত পুলিশ এসে সুসীকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দিলীপ জামিন দিয়ে সুসীকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল। সুসী আর বাড়িতে রইল না। বেণুদির কাছেই আশ্রয় নিল। শেষ পর্যন্ত সুসীকে দেখা গেল, 'গ্রীন গোভ' এ শিরীষবাবুকে ইমপোর্ট লাইসেন্স দেবার হর্তাকর্তা বাগচীসাহেবের কোলে। একসঙ্গেই সেদিন বলি হল কালীঘাটে বুধবারীর পাঁঠা, আর গ্রীন গ্রোভে সুসী। আর অরবিন্দ তখনও মিছিলের মধ্যে চেঁচাচ্ছে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' বিমল মিত্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসসমূহের অন্যতম। এর নায়ক লোকনাথ। লোকনাথ 'অটো ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠাতা উঠতি বড়লোক কার্তিক রায়ের একমাত্র সন্তান বীণার একমাত্র সন্তান। কার্তিক রায় ছিলেন একজন করিৎকর্মা লোক—স্বাধীন ভারতের এক প্রতীক পুরুষ। তাঁর বৈঠকখানায় টাঙানো ছিল সার সার অনেক মহাপুরুষের ছবি—যীশুখ্রীস্ট, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যমহাপ্রভু প্রভৃতি। আবার একালের জওহরলাল, মতিলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, গান্ধীজী, শরৎ বোস, সুভাষচন্দ্র প্রমুখেরও ছবি। এঁদের সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর অন্তরঙ্গতা এবং এঁদের দৌলতেই তাঁর অটো ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস-এর উন্নতি ও তাঁর বিপুল বৈভব। দানবীর ও কর্মবীর হিসাবেও তাঁর ছিল সুনাম। মুক্তহস্তে দান করেছেন

এইসব নেতাদের এবং তার পরিবর্তে সংগ্রহ করেছেন অটো ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস-এর জন্য সুযোগ ও সুবিধা। এহেন কার্তিক রায় ও তাঁর স্ত্রী বসুমতী দেবীর একমাত্র বংশধর লোকনাথ। বসুমতী দেবী কথায় কথায় লোকনাথকে বলতেন কর্তার যা-কিছু সম্পত্তি, যা-কিছু নাম-ডাক সবই ওই দেওয়ালে টাঙানো যাঁদের ছবি, তাঁদের জন্য। নিজের বংশগৌরব সম্বন্ধে লোকনাথের ছিল উচ্চ-ধারণা। সেজন্য স্কুল-কলেজে সহপাঠীদের হীনতর জীব মনে করে অবজ্ঞার চোখে দেখত। লোকনাথ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ইংরেজিতে এম. এ.। পিতা সন্তোষ রায় ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পালিত পুত্র। কার্তিক রায়ের মৃত্যুর পর সন্তোষ রায়ই হয়েছিলেন অটো ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস-এর ম্যানেজিং ডিরেকটর। কোম্পানির কর্মোপলক্ষে বিলাতে গিয়েছিলেন। সেখানেই হয় তাঁর মৃত্যু। তখন লোকনাথ হয় অটো ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ম্যানেজিং ডিরেকটর। কিন্তু একখানা বই পড়ে তার মাথাটা গেল বিগড়ে। বইখানা হিরোশিমায় অ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপ করা নিয়ে লেখা এবং যে-নিক্ষেপের ফলে হাজার হাজার লোকের শোচনীয় মৃত্যু ও যারা বেঁচে রইল তাদের পঙ্গুতা, যার প্রভাব তাদের বংশধরদের ওপরও বর্তাল। বইখানা পড়বার পর একদিন কর্মচারীদের ডেকে লোকনাথ বলল,- অটো ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একান্ন শতাংশ শেয়ার যা রায়বংশের হাতে আছে, তা তাদের বিলিয়ে দেবে। তারাই হবে কোম্পানির মালিক, তারাই চালাবে কোম্পানি। আর যারা শেয়ার নিল না, তাদের দিল নগদ টাকা। কোম্পানির অ্যাকাউন্টটেন্ট কেদার সরকার শেয়ার নিল না। পেল পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই কেদার সরকারই একসময় ছিল ওই কোম্পানির কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারী।

রায়বংশ ছিল উঠতি বড়লোক। লোকনাথের ধারণা হয়ে গিয়েছে উঠতি বড়লোকরা হচ্ছে সমাজের ক্যানসার স্পট্। পৃথিবীতে যারা বড়লোক হয়েছে তারা সবাই চোর। চুরি ছাড়া ঋদ্ধিলাভ হয় না। আর যারা পৃথিবীতে প্রাতঃ-স্মরণীয় বলে কীর্তিত হন তাঁরা কেউই প্রাতঃস্মরণীয় নন। একদিন লোকনাথ বৈঠকখানায় টাঙানো ছবিগুলো ভেঙে চুরমার করে দিল। মাথায় তেল-মাখা বন্ধ করল। ধোপদুরস্ত কাপড়-জামা পরা বন্ধ করল। গাড়ি-চাপা বন্ধ করল। একটা ঝোলা কাঁধে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল। টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। বন্ধুরা বলে, লোকনাথ পাগল হয়ে গিয়েছে। লোকনাথ খিদিরপুরে মনসাতলা লেনে রেল কর্মচারীদের এক মেসে যায়, প্যারাগন সিনেমার পিছনে যাদু-গোপালের তেলেভাজার দোকানে যায়, বেলগেছিয়ায় নিতাই সাহার চায়ের দোকানে যায়, বরানগরে সিধু ওস্তাগর লেনে বকুল নামে এক পাঁচ-ছয় বছরের জন্মান্ধ মেয়েকে দেখতে যায়।

যাদুগোপালের তেলেভাজার দোকানে একদিন সরযূ নামে এক মেয়ে এসে লোকনাথকে ধরল একটা চাকরির জন্য। লোকনাথ বন্ধু বিকাশকে একটা চিঠি

লিখে দিল। বিকাশ এক কোম্পানির একজিকিউটিভ্। সরযূর চাকরি হল। তারপর সে ঘোড়া ডিঙিয়ে কোম্পানির ডিরেকটরের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল, তারপর ইউনিয়নের লিডার কেদার সরকারের সঙ্গে। এদের দৌলতে সরযূ এখন সিঁথিতে এক চারতলা ফ্লাটের মালিক। সরযূর বৈভব দেখে বিকাশ আক্ষেপ করে বলে, পুরুষ হয়ে জগতে জন্মানোই একটা অভিশাপ। মেয়েছেলে হয়ে জন্মালে সেও সরযূর মতো বিপুল বৈভবের মালিক হতে পারত। কিন্তু সরযূর বাবার কাছে থানা থেকে একদিন খবর এল সরযূ থানার হাজতে। সরযূ এক স্মাগ্‌লিং গ্যাঙের লিডার হিসাবে ধরা পড়েছে। এর জন্য পুরস্কারের আশায় থানার লোকরা খুব উল্লসিত। কিন্তু সব ভেস্তে গেল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অর্ডার এল, সরযূ নিকদারকে এখনই ছেড়ে দেওয়া হোক। সকলেই বিস্মিত। খুব নিপুণতার সঙ্গে এসব চিত্র এঁকেছেন বিমলবাবু।

আবার সেই একই কলমের গুণে খুব মর্মস্পর্শী ও বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে বকুলের কাহিনী। বকুল জন্মান্ধ। আলোর জন্য সে পাগল। রাস্তায় আলো জ্বললে, মাত্র আবছা আলোর প্রতিফলন হয় বকুলের মনে। অপার আনন্দ পায় সে তাতে। সেজন্য ছাপরা জেলার কালিকাপ্রসাদ, যে রাস্তায় মিউনিসি-পালিটির আলো জ্বালে তার সঙ্গে বকুলের খুব ভাব। তার জন্য রোজ জান-লার ধারে বসে থাকে। দেরী হলে আলোওয়ালার কাছে অনুযোগ করে। এই করুণ দৃশ্য একদিন চোখে পড়ল লোকনাথের। লোকনাথও ভাব করল বকুলের সঙ্গে। একদিন এসে দেখল বকুল জানলার ধারে নেই। চিন্তিত হয়ে বাড়ির কড়া নাড়তে লাগল। বকুলের মা অজয় সরকারের স্ত্রী রানু এসে দরজা খুলে দিল। শুনল বকুলের জ্বর। কত জ্বর? বাড়িতে থার্মোমিটার নেই। গায়ে হাত দিয়ে দেখল গা খুব গরম। লোকনাথ বেরিয়ে গেল থার্মোমিটার আনতে। সঙ্গে পাড়ার পশুপতি ডাক্তারকেও নিয়ে এল। পশুপতি ডাক্তারের ফি আট টাকা। লোকনাথ তার হাতে একখানা একশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু আমার বকুলকে তাড়াতাড়ি ভাল করে দিন। তার পরদিন পশুপতি ডাক্তারের ডাক্তারখানায় বকুলের খবর নিতে এল। পশুপতি ডাক্তারকে আবার একখানা একশ টাকার নোট দিল। পশুপতি ডাক্তারের ডাক্তারখানায় লোকে গুলতানি করে, পশুপতি ডাক্তারও তাতে যোগ দেয়। তারা বলে লোকটার মতলব কি? বোধ হয় অজয় সরকারের সোমত্ত বউটার ওপর লোকটার নজর পড়েছে।

বকুল ভালো হয়ে উঠল। লোকনাথ এবার উঠে-পড়ে লাগল বকুলের চোখ নিয়ে। কলকাতার বড় বড় চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। সকলেই নিরাশ করে। বলে, একমাত্র বিলাতে অপারেশন হতে পারে। লোকনাথ বকুলকে বিলেত নিয়ে যাবে। এমন সময় খবরের কাগজে পড়ল বিলেত থেকে একজন বড় চোখের ডাক্তার কলকাতায় আসছেন এক মাড়ওয়ারী ভদ্রলোকের চোখ অপারেশন

করতে। লোকনাথ তার সংগে যোগাযোগ করল। অনেক টাকা তাঁর ফি। লোকনাথ নিজের বসতবাটিটা একজনকে বেচে দিল তিরিশহাজার টাকায়। বকুলের চোখ অপারেশন হল। চোখ-বাঁধা অবস্থায় বকুল বাড়ি এল। আর দুদিন পরে চোখ খুলে দেওয়া হবে। বকুল পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে।

বকুলের পাড়ায় দুই দলে লেগেছে সংঘর্ষ। ভীষণ বোমাবাজি হচ্ছে। বোমার শব্দে বকুলের চোখ নষ্ট হয়ে গেল। আগে যাও-বা আবছা দেখতে পেত, এখন তাও পায় না। একেবারে অন্ধ হয়ে গেল।

লোকনাথ দুই দলের সংঘর্ষ মেটাতে গিয়ে, বোমার আঘাতে মারা গেল। তাকে ভগবানের দরবারে নিয়ে আসা হয়েছে। ভগবানের দূতরা বলল, লোকটা ভীষণ পাজী, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের ছবিগুলো লাথি মেরে চুরমার করে দিয়েছে, কেবল অপরের হিত করবার জন্য পাগল। ভগবান তাদের কথায় সায় দিয়ে বললেন, আমি যেসব সৎ লোকদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম তুমি তাদের অসম্মান করেছ। তুমি নিজে লোকের হিত করবে? তুমি সাজা পাবে। লোকনাথ বলল, আপনি যেমন লোকের হিত করবার জন্য সৎ লোক পাঠিয়েছিলেন, সংগে সংগে তিনজন শয়তানকেও পাঠিয়েছিলেন—ট্রুম্যান, চার্চিল ও স্টালিন। ভগবান বলেন, তিনি যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তা এক বিরাট পাণ্ডুলিপি বিশেষ। তার শেষ পৃষ্ঠায় সব কথা লেখা আছে। কিন্তু লোকনাথের সে শেষ পৃষ্ঠা আর পড়া হল না। বোধ হয় সেই শেষ পৃষ্ঠার লেখার সংগে প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক অসওয়ালড স্পেংগলারের ভবিষ্যদ্বাণীর মিল আছে। অবশ্য এটা বিমল মিত্রের কথা নয়, শেষ পৃষ্ঠা সম্বন্ধে বিমল মিত্র রেখেছেন এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন।

আগেই বলেছি যে, বিমল মিত্রের এ তিনখানা উপন্যাস হচ্ছে সমকালীন সমাজের জীবনীর বিশ্বস্ত দলিল। এ তিনখানা উপন্যাস প্রমাণ করে বিমল মিত্র কত বড় নিপুণ গল্পকার ও দক্ষ ভাষাশিল্পী। তিনি কল্পনাবিলাসী লেখক নন; সর্বদ্রষ্টা প্রত্যক্ষদর্শী লেখক। নিজ চক্ষে যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই গ্রন্থিত করেছেন তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ ভাষায়। তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, কাহিনীর নাটকীয় সুষমা তাঁর উপন্যাসগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রাগ-ভৈরব'-এর কাহিনী আমাদের পরিচিত ঘটনাবলীরই অভিব্যক্তি। দ্বিতীয় উপন্যাস 'চলো কলকাতা'য় তিনি দেখিয়েছেন যে, আজকের সমাজে সুসীর মতো মেয়েরা কি-ভাবে গ্রীন-গ্রোভের হাড়িকাঠে বলি হচ্ছে, ঠিক যেভাবে বলি হচ্ছে কালীঘাটের হাড়িকাঠে বুধবারীর পাঁঠা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে: কেন? পয়সার লালসায়, না পুরুষের হাতছানিতে? মেয়েগুলো দায়ী, না পুরুষরা দায়ী? এটা আজকের সমাজের সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। কেন মেয়েগুলো আজ বিপথে যাচ্ছে?

তৃতীয় উপন্যাস 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' সৎলোকের মর্মান্তিক ও শোচনীয় পরিণতির ইতিবৃত্ত। সমকালীন জগৎ সৎলোককে বুঝতে পারে না, তাদের কলুষিত দৃষ্টিকোণ দিয়ে দ্যাখে। এটা আমরা পশুপতি ডাক্তারের ডাক্তারখানার গুলতানি থেকেই বুঝতে পারি। নিজের বন্ধুরাও লোকনাথের মতো সৎলোককে পাগল বলে। আবার মৃত্যুর পর ভগবানের দরবারেও তারা বিকৃত বিচারের শিকার হয়। বিজ্ঞান যে মানুষকে কতটা অমানুষিক করে তুলেছে বইখানা তারই প্রতিচ্ছবি।

বিমল মিত্রের রচনাশৈলীর মধ্যে আছে যাদু। তাঁর বর্ণনার মধ্যে আছে প্রাণ ও অনুভূতির অত্যাশ্চর্য গভীরতা, এবং বেদনাময় অভিব্যক্তি। তাঁর চরিত্রগুলি এক একটি দীপ্তিমান ভাস্কর হয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। তাঁর ভাষার মধ্যে কোনরূপ অমিতব্যয়িতা নেই। অনুপম ঘটনাবিন্যাস দ্বারা তিনি কশাঘাত করে গেছেন সমকালীন সমাজকে—যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেছে পাপ। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে তাঁর লেখার মধ্যে আছে সততা। সেজন্যই গত বইমেলায় বাঙলার অপর একজন কথাশিল্পী 'শংকর' তাঁকে অভিনন্দিত করে বলেছিল যে শরৎচন্দ্রের পর বিমল মিত্রের মতো উপন্যাসকার বাঙলায় আর দ্বিতীয় জন্মায়নি। বস্তুত বিমল মিত্র হচ্ছেন সর্বদ্রষ্টা লেখক, সমকালীন অধোগামী সমাজের প্রবক্তা ও দূরদর্শিতার প্রতীক। তাঁকে এক কথায় বলা যেতে পারে the prophet of our day।

রাগ ভৈরব

নস্কর-বাগান লেন বড় বনেদী পাড়া। বনেদী মানে এই নয় যে সেকালের বড় বড় বনেদী বংশ সেখানে বাস করে। বনেদী মানে বহুকালের পুরনো রাস্তা। এককালে হয়ত এমন ইলেকট্রিক লাইন ছিল না, এমন পিচের রাস্তাও ছিল না। এমন পাকা দোতলা তিনতলা বাড়িও ছিল না।

তা বলতে গেলে কোন্ পাড়াতেই বা তা ছিল!

এমন বহু লোক এখনও কলকাতা সহরে বেঁচে আছে যারা সেই পুরনো কলকাতার চেহারা দেখেছে। সেই ঘোড়ায় টানা গাড়ি দিয়ে রাস্তায় জল দেওয়া, সেই কেরোসিন তেলের বাতিতে আলো জ্বালানো, আর ঘোড়ার মাথায় বাক্স-প্যাঁটরা চাপিয়ে শেয়ালদ' ইস্টিশান থেকে বাড়িতে ফেরা।

সে-সব দিন আর এখন নেই। নেই বলেই নস্কর-বাগান লেনের চেহারাও বদলে গেছে। আগে যেখানটায় পানা-পুকুর ছিল সেখানে এখন দেবসুন্দরবাবু নত ন তিনতলা বাড়ি করে ফেলেছেন।

রিটায়ার করার পর দেবসুন্দরবাবু এই নস্কর-বাগান লেনে বাড়ি করে ভেবেছিলেন বুঝি এক মহা কীর্তি করে ফেললেন। আর আজকালকার দিনে কলকাতা সহরে বাড়ি করাও তো একটা কীর্তি বটে! যেখানে পঞ্চাশ-ষাট টাকা দরে কাঠা দিলেও কেউ ছুঁতো না, সেইখানেই এখন পাঁচ হাজার টাকা হাতে নিয়ে খদ্দেরদের ঝুলোঝুলি।

করুণাকান্তবাবু মাঝে মাঝে আসেন।

জিজ্ঞেস করেন—জমি কী দরে কিনলেন?

দেবসুন্দরবাবু বলেন—পাঁচ হাজার টাকা করে কাঠা—

করুণাকান্তবাবু বলেন—খুব সস্তায় পেয়ে গেছেন মশাই, এখন হেরম্ববাবু কিনলেন সাত হাজার দরে—

হেরম্ববাবুও বাড়ি করেছেন সামনেই। দেবসুন্দরবাবু একদিন পায়ে-পায়ে গিয়ে হেরম্ববাবুর বাড়ির সামনে দাঁড়ান। সেখানে চুণ-সুরকি-সিমেন্টের পাহাড়। রাজমিস্ত্রি কুলি-মজুর খাটছে। আর হেরম্ববাবু ঝাঁ-ঝাঁ রোদের মধ্যে বাড়ি-তৈরি তদারক করছেন।

দেবসুন্দরবাবুকে দেখে বললেন—নমস্কার। আপনি?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—এই আপনার বাড়ি দেখতে এলুম। জমি কত করে কিনলেন মশাই আপনি? আমিও বাড়ি করেছি কি না···

এমনি করেই পাড়ার নতুন অধিবাসীদের মধ্যে ভাব হয়ে গেল। আসা-যাওয়া চলতে লাগলো। এককালে নস্কর-বাগান লেন ছিল আঁকা-বাঁকা খোয়ার রাস্তা আর দু'চারটে নোনা-ইঁটের পুরনো ধাঁচের ভাঙা বাড়ি। আর অনেকখানি

জায়গা জুড়ে ছিল বাগান। আম-জাম-নারকেল-তালের গাছ আর পানা-পুকুর।

সে-যুগের সে কলকাতা এ-যুগে মানায় না। বাগান এখন বিলাসিতা। তুমি বাগান চাইলেও কলকাতা-করপোরেশান তোমার বাগান রাখতে দেবে না। রাখলে মোটা ট্যাক্স চাপাবে। তাই নস্করবাবুরা প্লট্ করে জমি বিক্রি করে দিলে। বাইরের লোক জমি কিনতে পায় না। তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো নস্কর-বাগানে।

তখন থেকেই এই নস্কর-বাগান লেনের রব্-রবা। এক-এক করে বাড়ি তৈরি হতে লাগলো। কিছু আগেকার পুরনো বাসিন্দা, আর কিছু নতুন আমদানি। অর্থাৎ পাঁচমিশেলি প্রতিবেশী। এক পাড়ায় এক সঙ্গে বসবাস, বাজার করতে গেলে একই লোকের সঙ্গে রোজ মুখোমুখি, সেইটুকুতেই যা-কিছু চেনা জানা শোনা। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। তার চেয়ে বাড়তি কিছু নয়।

পাড়া যখন গম্-গম্ করে উঠলো তখন রাস্তা দিয়ে লোকের চলাচল বাড়লো। আশেপাশের বড়-রাস্তা দিয়ে বাসের নতুন রুট্ হলো। তখন আর অফিস যাবার জন্যে ছেলে-ছোকরাদের হেঁটে হেঁটে কাহিল হতে হলো না। নস্কর-বাগান লেনটা পেরিয়ে গিয়ে মোড়ের পার্কটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই হলো। সেখানে বাসের নতুন স্টপেজ। সেখান থেকে উঠলেই সোজা ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিস-পাড়ায় চলে যাও। ছ' পয়সা খরচ করলেই একেবারে কর্মস্থল। এ কি একটা কম সুবিধে?

তাই নস্কর-বাগান লেনের জমির দাম বাড়লো। তাই নস্কর-বাগান লেনের বাড়ির চাহিদা বাড়লো, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভাড়াও বাড়লো, নতুন ভাড়াটেরা আসবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার লোকসংখ্যাও যেমন বাড়লো তেমনি বাড়লো অচেনা লোকের ভিড়। বাড়িতে বাড়িতে যেমন নতুন লোকের আনা-গোনা সুরু হলো তেমনি জানালায় ঝুলতে লাগলো নতুন-নতুন পর্দা। নতুন-নতুন মুখ, নতুন-নতুন পরিবেশ। এ যেন সেই নতুন লোকের বসবাস সুরু হলেও এ-পাড়ার বনেদী গন্ধটা গেল না।

এখন সন্ধ্যে হলেই যার-যার বাড়িতে রেডিও বাজে। নতুন-নতুন গান, নতুন নতুন সুর। বাঙলা গান কারো রেডিওতে বাজে না। শুধু হিন্দী গান। বোম্বাই ফিল্মের লচক্দার গীত।

হেরম্ববাবুর মাথা ধরে ওঠে। ব্লাড-প্রেসারের রুগী হেরম্ববাবু। বাড়ি করতে গিয়েই তাঁর পরমায়ু নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার ওপর হিন্দী ফিল্মী-গানের চাপ। এক-একটা বাড়ির ছেলে-মেয়েরা নতুন কেনা রেডিওগুলো ফুল-ফোর্সে খুলে দেয়। আওয়াজটা সারা পাড়ায় গাঁক-গাঁক করে ওঠে। যাদের ভালো লাগে তারা তালে-তালে তাল ঠোকে, কিন্তু যাদের ভালো লাগে না তাদেরই বিপদ।

দেবসুন্দরবাবুর ভালো লাগে না। পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা

করে বলেন—কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলবো ?—

ভদ্রলোক বলেন—কী বলুন—

দেবসুন্দরবাবু বলেন—আপনার বাড়ির রেডিওটা একটু আস্তে বাজাতে পারেন না—

ভদ্রলোক বলেন—আরে মশাই, ছেলেমেয়েদের তো আমিও তাই বলি। রেডিও শুনবি তোরা শোন্, কিন্তু একটু আস্তে বাজা না বাপু—তা, আজকালকার ছেলে-মেয়েরা কি বাপ-মায়ের কথা শোনে! আপনার বাড়িতেও তো ছেলে-মেয়েরা আছে, আপনিও তো জানেন—

দেবসুন্দরবাবুরও ছেলে মেয়ে আছে। তবে তারা বড় হয়েছে। বড় হয়ে সব বাঙলা-দেশের বাইরে চলে গেছে। কেউ চাকরি করছে সেখানে। কারো আবার বিয়ে হবার পর শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে।

দেবসুন্দরবাবু আর কী বলবেন ? কিছুই তাঁর বলবার থাকে না। নস্কর-বাগান লেনের বাসিন্দারা যেন বিরাট কলকাতারই একটা ছোট সংস্করণ। তাদের অভিযোগ অনুযোগ তা সে যত বড় আর যত ছোটই হোক, তার যেন কোথাও কোনও প্রতিকার নেই, আপিল নেই, আর তাই তার ফয়সালা-মীমাংসাও নেই। নস্কর-বাগান লেনের বাসিন্দারা যখন ট্রামে-বাসে ওঠে, ভিড় নিয়ে, ঘেঁষা-ঘেঁষি নিয়ে বচসা হয়, একজনের জুতো আর একজন মাড়িয়ে দিলে কথা-কাটাকাটি হয়, তখন সকলেরই রক্ত খানিক ক্ষণের জন্যে গরম হয়ে ওঠে। তারপর আপনাআপনিই আবার তা থেমে যায়। কখনও দু'একটা বোমা ফাটে, ট্রাম-বাস জ্বলে ওঠে। তারপর আবার শহর চলে। নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নেই চলে। যেন না-চললে সমস্ত কিছু অচল হয় বলেই চলে।

এর কোনও প্রতিকার নেই। প্রতিকার চাইলেও প্রতিকার পাওয়ার উপায় নেই। কে প্রতিকার চাইবে, আর কে-ই বা প্রতিকার করবে ? প্রতিকার চাইবার মানুষ যেমন নেই, প্রতিকার করবার সংস্থারও তো তেমনি অভাব। নস্কর-বাগান লেনের বিধাতাপুরুষের মত বাঙলা-দেশের বিধাতাপুরুষও বুঝি ইন্তেকাল করেছেন।

তাই যখন নস্কর বাগান লেনের বাড়িগুলোতে রেডিও বাজে, অনুষ্ঠানে উৎসবে লাউড্-স্পীকার চিৎকার করে, তখন নিরুপায় হয়ে সবাই সব কিছু সহ্য করে।

বলে—আঃ, আর পারি নে এদের জ্বালায়—

কিন্তু লাউড্-স্পীকার তো নীরস যন্ত্রই শুধু। সে মানুষের যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপ করে না। সে একমনে বোম্বাই সিনেমার দুর্বোধ্য যন্ত্রণাগুলো ভাষা দিয়ে মানুষের করোনারিতে গিয়ে আঘাত করে। ঘা দেয় আর আর্তনাদ করে করে সকলকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

এই সময়ে একদিন করুণাকান্তবাবুর বাড়িতে এক ভাড়াটে এল।

করুণাকান্তবাবু তখন আহ্নিক শেষ করে সবে উঠেছেন, এমন সময় নিচে থেকে ডাক এল।

নিচেয় এসে দেখলেন একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস। মাজা-ঘষা গায়ের রং। বেশ চটপটে, ছটফটে, চনমনে ভাব।

মেয়েটি ঘরটা দেখলে। ঘরের লাগোয়া একটা ঢাকা বারান্দা।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে—কল? কল কোথায়?

করুণাকান্তবাবু বললেন—ওই যে, ওই উঠোনের কোণে—

বলে আঙুল দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে দিলেন। প্রভাও চেয়ে দেখলে সেদিকে। বড় জোর এক হাত কি দেড় হাত উঠোন। ওপরে টিনের চাল।

করুণাকান্তবাবু তখন একমনে মেয়েটার সিঁথির দিকে চেয়ে দেখছিলেন। সিঁদুর-টিদুর কিছু নেই। তবে কি বিয়ে হয়নি নাকি?

—তুমি কি একলাই থাকবে নাকি মা?

প্রভা বললে—হ্যাঁ—

—তোমার সঙ্গে আর কেউ থাকবে না?

প্রভা বললে—সঙ্গে যদি কেউ না থাকে তো আপনার কি আপত্তি আছে?

করুণাকান্তবাবু একটু হাসতে চেষ্টা করলেন।

বললেন—না না, আপত্তি হবে কেন? আমি এমনিই জিজ্ঞেস করছি। তুমি মা একলা থাকলে তো আমারও দায়িত্ব বাড়লো। মানে আমাকে একটু দেখাশোনা করতে হবে তো। আজকাল কলকাতার অবস্থা তো ভালো নয়।

প্রভা বললে—না, তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি বাঙলা দেশে মানুষ হইনি। আমি রায়পুর থেকে এখানে চাকরি নিয়ে এসেছি—

—কোথায় চাকরি করো মা তুমি?

—গার্লস্ স্কুলে। তীর্থময়ী বালিকা বিদ্যালয়। আমার সম্বন্ধে যদি কিছু খোঁজ-খবর নিতে চান তো নিতে পারেন। আপনার ভাড়া আমি ঠিক নিয়ম করে মাসের প্রথম সপ্তায় দিয়ে দেব। আর যেদিন ভাড়া দিতে পারবো না সেদিন আপনার বাড়ি ছেড়ে দেব, কথা দিচ্ছি—

কথা একরকম সেইদিনই পাকা হয়ে গেল। বাড়ির ভেতরে যেতেই করুণাকান্ত-বাবুর বউ বললে—মেয়েটা কে?

করুণাকান্তবাবু বললেন—একটা ইস্কুল-মাস্টারনী।

—তা মেয়েটার বর কী করে?

—বিয়ে হয়নি এখনও।

বউ অবাক হয়ে গেল। বিয়ে যদি হয়নি তো সঙ্গে কে থাকবে?

—কেউ না।

—ওমা, ওই সোমত্থ মেয়েকে তুমি ঘর-ভাড়া দিলে? শেষকালে যদি আবার

বাইরের কাউকে জুটিয়ে বাড়ির ভেতরে রাখে ? তখন ?

করুণাকান্তবাবু বললেন—তা রাখে তো রাখবে। তাতে যার চরিত্র খারাপ হবে তার খারাপ হবে, তাতে তোমারই বা কী আমারই বা কী ? তখন যাদের মেয়ে তারা বুঝবে।

ঘরটা ঘুপচি বলে অনেকে এসে ফিরে গেছে। কারোর পছন্দ হয়নি এতকাল। নইলে নম্কর-বাগান লেনে বাড়ি এতদিন খালি পড়ে থাকে না।

তা প্রভা একদিন এল এই বারো নম্বর নম্কর-বাগান লেনে। আসার পর প্রথম রাত্রেই সেই রেডিওর গান। বোম্বাই-ফিল্মের হাল্লা-গুল্লা। কান ঝালা-পালা হয়ে গেল প্রভার !

অনেক রাত পর্যন্ত চললো সেই গান। কোনও গান হাসতে হাসতে, কোনও গান লাফাতে লাফাতে। সমস্ত পাড়া মাত হয়ে গেল সেই গানের পাগলামিতে। প্রভার মনে হলো সে নিজেও বুঝি পাগল হয়ে যাবে—

তারপর বিছানা ছেড়ে উঠলো···

আর তারপর···

কিন্তু তার আগে আর একটা দিনের আর একটা দেশের আর একটা ঘটনা বলে নিই :

১৯৪০ সালের ১০ই মে। হল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে জার্মানির। গরীব দেশ হল্যান্ড। জার্মানির তুলনায় তার না আছে ঢাল, না আছে তরোয়াল। তবু লড়াইয়ে হেরে গেলে চলবে না। তাহলে কীসের দেশপ্রেম, কীসের মাতৃভূমি ! মাতৃভূমির অপমান তো দেশবাসীর অপমান। দেখতে দেখতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে দেশের মধ্যে। তারা কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেনি এমন করে জার্মানি তাদের ওপর একদিন হঠাৎ হামলা করবে।

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তার লোভ নয়, তার বিলাসিতা নয়, তার পাপ নয়, তার অমিতব্যয়িতা নয়, কিছু নয়। তার সবচেয়ে বড় শত্রু হলো মানুষ। জার্মানি তার নিজের যত ক্ষতি করেছে, রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন বা আর কেউ তা করতে পারেনি।

রাতারাতি হল্যান্ডের জেনারেলরা মিটিং করতে বসলেন।

একজন জেনারেল বললেন—জার্মানির তুলনায় আমরা কতটুকু ? আমাদের সামর্থ্যই বা কতটুকু ? আমরা কী নিয়ে লড়বো ?

আর একজন জেনারেল বললেন—জার্মানির সঙ্গে প্যাক্ট করাই ভালো—

মিটিং-এ আরো অনেকে বসেছিলেন। শিয়রে দুর্দান্ত শত্রু। যে কোনও

মুহূর্তে শত্রু এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তখন বাজে কথা বলে নষ্ট করবার মত সময় নেই কারো। সীমান্তের লোক ঘর-বাড়ি ছেড়ে সরে পড়তে আরম্ভ করেছে। সমস্ত দেশ সন্ত্রস্ত। যে কোনও মুহূর্তে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হতে পারে।

—চুপ করুন!

শব্দ শুনে যে-যেখানে ছিল সেইদিকে চেয়ে দেখলে।

হল্যান্ডের কম্যান্ডার-ইন-চিফ্ দাঁড়িয়ে উঠেছেন।

—আপনারা প্রাণ দিতে পারবেন? প্রাণ? লাইফ?

সমস্ত ঘরখানা কম্যান্ডার-ইন-চিফের কথায় গম-গম করে উঠলো।

—আপনারা প্রাণ দিতে যদি রাজী থাকেন তো বলুন। নইলে আপনাদের সকলকে আমি ডিসচার্জ করে দেব। আমি নতুন জেনারেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবো, আমি এমন সব লোক চাই, যারা প্রাণ দেবে। আপনারা যদি প্রাণ দিতে রাজী থাকেন তো বলুন। বলুন—হ্যাঁ কি না—

কম্যান্ডার-ইন-চিফের কথা, কে আর আপত্তি করবে? সবাই একবাক্যে বলে উঠলো—হ্যাঁ—

—প্রাণ দেবেন?

—হ্যাঁ, প্রাণ দেব।

সঙ্গে সঙ্গে মিটিং শেষ হয়ে গেল।

মানুষের ইতিহাসে সে এক বিরাট রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা। পৃথিবীময় বেজে উঠলো রণ-দামামা। মানুষকে লোভ ত্যাগ করতে হবে, বিলাসিতা ত্যাগ করতে হবে, পাপ ত্যাগ করতে হবে, অমিতব্যয়িতা ত্যাগ করতে হবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করতে হবে তার প্রাণ।

সেই প্রাণ ত্যাগ করবার জন্যেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল সেদিনকার সেই হল্যান্ডে।

কিন্তু সেই দুর্যোগের দিনে হঠাৎ আবার আর এক কাণ্ড হলো। বলা নেই কওয়া নেই, দেশের সব জায়গায় একসঙ্গে হঠাৎ আলো নিভে গেল।

সমস্ত হল্যান্ড তখন অন্ধকার। আলো নেই, পাখা নেই, জল নেই, কাজ-কর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। কে এমন সর্বনাশ করলে? এ কি অন্তর্ঘাত?

হার মেজেস্টির রাজ্যে গোরগোল পড়ে গেল চারদিকে। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল সর্বত্র। কোথায় এর মূল? কে এই বিপর্যয়ের উৎস? তাকে ধরে আনো, তার বিচার করো, তাকে ফাঁসি দাও।

সমস্ত দেশে তোলপাড় সুরু হলো সঙ্গে সঙ্গে। বিপর্যয়ের উৎস খুঁজতে হার মেজেস্টির পুলিশ মিলিটারী গোয়েন্দা, মেকানিক সবাই হিমসিম খেয়ে গেল। অর্ডার হলো—কালপ্রিটকে খুঁজে-বার করতেই হবে। আর কালপ্রিটকে যদি খুঁজে না-ও পাও তো অন্তত পাওয়ার-হাউসটা মেরামত করে আবার চালু

করো। আমরা আলো চাই, হাওয়া চাই, জল চাই। আমরা বাঁচতে চাই। আমরা জার্মানির ফুরর হিটলারের সঙ্গে লড়াই করতে চাই।

—তারপর ? তারপর কী হলো ?

—তারপরের কথা বলবার আগে আপনাকে আর একটা কাহিনী বলি।

কাহিনী মানে বানানো গল্প নয়।

আপনি তো এ-যুগে বাস করেন। এ যুগেও আর একটা যুদ্ধ বেধেছে আমাদের দেশে। আপনি আমি আরো সবাই সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি।

আমাদের শত্রুরাও এবার আমাদের দেশে হামলা করেছে। আমাদের দেশেও হঠাৎ সব আলো নিভে গেছে। আমরাও খুঁজে বেড়াচ্ছি চারদিকে। কোথায় এর মূল ? কে এই বিপর্যয়ের উৎস ? তাকে ধরে আনো, তার বিচার করো, তাকে ফাঁসি দাও। আমরা আলো চাই, হাওয়া চাই, জল চাই। আমরাও প্রাণ দিয়ে আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করতে চাই—

—তারপর কী হলো ?

—তারপরের ঘটনাটা শুনতে গেলে আমার এই কাহিনী শুনতে হবে। শুনবেন ?

বললাম—বলুন—

—তবে শুনুন—

ভৈরববাবু যখন নস্কর-বাগানে মেয়ের বাড়িতে এলেন তখন সেখানেও সেই একই অবস্থা।

বরাবর বাইরে চাকরি করেছেন ভৈরববাবু। রায়পুরের মিউনিসিপ্যালিটির বড়বাবু ছিলেন চল্লিশ বছর।

লোকে বলতো—ভৈরব-সাহাব সাচ্চা আদমি—

ভাগ্যের কোন্ এক তাড়নায় ছোটবেলাতেই মধ্যপ্রদেশে গিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ভাগ্য ফেরাতে দেশ-দেশান্তর ঘুরতে ঘুরতে সেদিন কাঁহা কাঁহা চলে গিয়েছিলেন তার ঠিক নেই। কখনও পায়ে হেঁটে কখনও ট্রেনে চড়ে, কখনও বা টাঙায় চড়ে। তখন বোধ হয় ভৈরববাবুর পায়ে চাকা ছিল। ঘুরতে তাঁর কষ্ট হতো না। তা আজও যে তাঁর স্বাস্থ্য এখনও চালু রয়েছে, তা কেবল ওই পায়ের জন্যেই হয়ত।

ভৈরববাবু বলতেন—যেদিন আমার পায়ের চাকা থেমে যাবে সেদিনই আমি শুয়ে পড়বো হে, আর উঠবো না—

প্রভা রাগ করে। বলে—কিন্তু বাবা, এ তো আমাদের রায়পুর নয়, এ কলকাতা। এখানে তুমি কোথায় হাঁটবে ?

ভৈরববাবু বলেন—কোন রাস্তায় ? সরকারি রাস্তা পড়ে রয়েছে, আমার যেখানে খুশী হাঁটবো। কে আমায় বারণ করবে শুনি ?

প্রভা বলে—বা রে, কলকাতার রাস্তা কি আমাদের সেই রায়পুরের মতন ? এখানে ট্রাম-বাস একেবারে ঝড়ের মতন মানুষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। তুমি তো জানো না বাবা, এ বড় বিচ্ছিরি জায়গা।

—বিচ্ছিরি জায়গা মানে ?

—বিচ্ছিরি জায়গা মানে এখানে কারো জন্যে কারো মায়াদয়া নেই। যে যেমন করে পারে আগে যাবে। তাতে তোমার পা-ই মাড়িয়ে দিক আর চশমাই পড়ে যাক। বুড়ো-মানুষ বলে কেউ এখানে তোমাকে রেহাই দেবে না, তা জেনে রেখো—

কিন্তু ভৈরববাবু সে-সব কথায় কান দেবার লোক নন। তিনি বলেন—তা বলে আমি সারাদিন বাড়িতে বসে-বসে কী করবো ? ভেরেণ্ডা ভাজবো ?

তা সত্যি। ভৈরববাবু কাজের লোক। সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মধ্যপ্রদেশ যেমন ঠাণ্ডা দেশ, তেমনি আবার গরমও। আসলে গরমটাই যেন অনুপাতে বেশি। গরমের দিনে রাত ন'টা পর্যন্ত লু চলতো সেখানে। তবু ভৈরববাবুর ক্লান্তি ছিল না। লোকজন না এলে নিজেই কুড়ুল দিয়ে কাঠ কেটেছেন, নিজের হাতে গরুর দুধ দুয়েছেন। ঘর ঝাঁট দিয়েছেন, আবার ঘরের মেজেও মুছেছেন। দরকার হলে নিজের হাতে রান্নাও করেছেন। ওই মেয়েকে খাইয়ে ইস্কুলে পাঠিয়েছেন, আর তারপর ঘর-দোর বন্ধ করে তালাচাবি দিয়ে অফিসে ফাইল সাফ করেছেন।

তা অফিসে কাজই কি কম ছিল নাকি ?

আজকালকার তো সব সাহেব। কোট-প্যান্ট-টাই পরে বাবুরা এদানি সব সাহেব হয়ে গিয়েছিল। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ফাইল পাঠাবে, তাও চাপরাশি চাই। চাপরাশি না হলে এক গেলাস চা এনেও খেতে পারবে না বাবুরা।

কিন্তু বড়বাবু হলে কী হবে, তাঁর কোনও ঝুটা ইজ্জতবোধ ছিল না।

বলতেন—দাও হে, ফাইলটা আমাকে দাও, আমি ফাইল দিয়ে আসছি ও-ঘরে—

বাবুরা একটু লজ্জায় পড়তো।

ভৈরববাবু বলতেন—চাপরাশিরাও মানুষ হে, তাদের অত হতচ্ছেদ্দা করতে নেই। যদ্দিন আমার হাতে-পায়ে বাত না হচ্ছে তদ্দিন আমিই তোমাদের চাপরাশির কাজ করবো, দাও, ফাইলটা আমাকে দাও—

গৃহিণী যখন মারা গেলেন, তখন ওই প্রভাকে কে মানুষ করেছে শুনি ? কে তাকে খাইয়েছে, ঘুম পাড়িয়েছে আর সেবা-যত্ন করেছে ? এই রকমের মানুষ

ভৈরববাবু। চেয়ারম্যান ছিল মহাজন সাহেব। মহাজন সাহেব মানুষটি ভারি ভাল। একদিন নিজেই হঠাৎ এসে পড়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। এসে তাঁর গামছা-পরা চেহারা দেখে অবাক। ভৈরববাবু তখন স্নান করবার আগে খালি গায়ে গামছা পরে ঝাঁটা হাতে উঠোন সাফ করছিলেন।

চেয়ারম্যান মহাজন সাহেব বললেন—এ কী, আপনার নোকরওকোর কেউ নেই?

ভৈরববাবু বললেন—আমিই তো আমার নিজের নোকর মহাজন সাহেব, আমি আবার নোকর রাখবো কী জন্যে?

বলে হো হো করে হাসতে লাগলেন ভৈরববাবু।

তারপর সেই রায়পুরেই প্রভা এর-ওর কোলে বড় হতে লাগলো। বড় হয়ে ইস্কুলে পড়তে গেল। কলেজ থেকেও একদিন পাশ করে বেরোল। তারপর এই কলকাতার নস্কর-বাগানে একটা চাকরি পেয়ে গেল।

বাপু জানেই না কিছু। অ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটারটা দেখাতেই ভৈরববাবু অবাক।

—ওমা, তুই কবে দরখাস্ত করলি, আর কবেই বা তোর চাকরি হলো?

প্রভা মিটিমিটি হাসছিল। বললে—তোমাকে কিছু বলিনি বাবা—জানি, বললে তুমি আপত্তি করবে—

—তা সেখানে যে যাচ্ছিস, কোথায় থাকবি? কী খাবি? কে তোর দেখাশুনো করবে?

প্রভা বললে—সে আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। একটা ঘর ভাড়া করে দিয়েছে আমার এক বন্ধু। সেও ওই ইস্কুলের টিচার—

—খাওয়া-দাওয়া?

প্রভা বললে—সে আমি যেমন করে হোক রান্না-বান্না করে নেব। আর না হয় একটা কুকার কিনবো—

ভৈরববাবু তো শুনে অবাক। এইটুকু মেয়ে নিজে রান্না করে খাবে, বিদেশ-বিভুঁই-এ পড়ে থাকবে, সে কেমন কথা! কলকাতায় তো আত্মীয়-স্বজন কেউ তেমন নেই যে সেখানে থেকে চাকরি করবার ব্যবস্থা করবে।

—তাহলে তাই-ই যাও মা। কিন্তু আমি তো মা এখন তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না। আমার যে আবার অফিস রয়েছে। এখন ইয়ার-এন্‌ডিং বাজেটের কাজ চলছে, এখন তো ছুটিও পাওয়া যাবে না।

তা সেই প্রভা তখন থেকে এই নস্কর-বাগানের বাড়িতেই এসে রয়েছে। দেড়খানা ঘর। সেই ঘরের ভাড়াই তখন দিতে হতো কুড়ি টাকা। তা বেড়ে বেড়ে এখন চল্লিশ হয়েছে। আর বাড়িওয়ালাও লোকটি তেমন খারাপ নয়—

মেয়েকে একদিন ট্রেনে তুলে দিলেন ভৈরববাবু। তারপর কলকাতায় গিয়ে

প্রভা চিঠি লিখলে যে, সে নিরাপদে নির্বিঘ্নে গিয়ে কলকাতায় পৌঁছেছে।

তারপর থেকে অনেক চিঠি লিখেছে প্রভা। প্রত্যেকবারই লিখেছে—সে ভালো আছে।·· ভালো থাকলেই ভালো। ভৈরববাবু প্রত্যেকবারই চিঠিতে লিখেছেন স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে।—স্বাস্থ্যটাই হচ্ছে আসল মা। টাকার আমার দরকার নেই। আমার যা মাইনে তাতে আমি পরম নিশ্চিন্তেই আছি। আমার জন্য চিন্তা করো না।

এসব অনেকদিন আগেকার ব্যাপার। গরমের ছুটির সময় প্রভা প্রথম-প্রথম বাবার কাছে এসেছে। বাবা জিজ্ঞেস করেছেন—কী রে, কোনও অসুবিধে হয় না তো তোর সেখানে?

প্রভা বলেছে—কী যে তুমি বলো বাবা, আমি কি কচি খুকি আছি আর আগের মতন?

—কী রাঁধিস রোজ?

প্রভা হাসতে লাগলো।

বললে—তুমি যে কী বাবা, তার ঠিক নেই! আমি কি আর কালিয়া-পোলোয়া রাঁধবো নাকি? শুধু ভাতে-ভাত আর ডাল রান্না করেই আমি ইস্কুলে চলে যাই। তারপরে কাছেই তো ইস্কুল, দুপুরবেলা এসে খেয়ে নিই। দুপুর বারোটার মধ্যে আমার ছুটি হয়ে যায়—

কিন্তু গরমের ছুটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে আসে। তখন আবার কলকাতা ফেরবার পালা। ভৈরববাবু আবার একদিন মেয়েকে বোম্বাই মেলে তুলে দিয়ে আসেন। বাবার আর মেয়ের দু'জনেরই চোখ তখন ছলছল করে ওঠে। তারপর আবার যে-কে-সেই। তারপর ভৈরববাবু আবার অফিসের কাজের মধ্যে ঢুকে সব ভুলে যান। আবার জীবন তাঁর বাঁধা গতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

কিন্তু একদিন ভৈরববাবুর রিটায়ার করবার দিন এল। ভৈরববাবু মেয়েকে লিখলেন—মা প্রভা, আমি তোমার ওখানেই যাইতেছি। এখানকার পাট উঠিল। সংসারের অনেক ছোটখাটো এবং তক্তপোশ ইত্যাদি ভারি ভারি জিনিসগুলি এখানকার লোকদের দিয়ে দিলাম। বাকি অপরিহার্য জিনিসগুলি লইয়া আগামী সোমবার রওনা হইতেছি—

ফেয়ারওয়েল দিলে অফিসের স্টাফরা। একটা মানপত্রও দিলে হিন্দিতে। তিনি যে কত উদার ছিলেন, কত মহৎ ছিলেন, কত কর্মঠ পুরুষ ছিলেন, তারই বর্ণনা লেখা ছিল তাতে। আর দিলে একটা রুপো-বাঁধানো লাঠি।

লাঠিটার দিকে চেয়ে দেখলেন ভৈরববাবু। সেটা হাতে নিয়ে নাড়তে-চাড়তে ভাবলেন—সত্যিই তো, এরা সবাই বুঝতে পেরেছে যে তিনি বুড়ো হয়েছেন। বুড়ো হলে তো সকলেরই লাঠির দরকার হয়। তাঁরও তো লাঠির দরকার হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক জিনিসই দিয়েছে তারা।

মালপত্র বাক্স-বিছানা, বলতে গেলে পুরো সংসারটা উঠিয়ে নিয়েই এলেন তিনি। সারা জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো মধ্যপ্রদেশ তাঁকে ছেড়ে আসতে হলো।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এসে পেঁছতেই মেয়ে এসে হাজির।

বললে—রাস্তায় কোনও কষ্ট হয়নি তো বাবা তোমার?

ট্রেন থেকে এক লাফে নামলেন ভৈরববাবু। বললেন—কষ্ট হতে যাবে কেন? তা সে কথা যাক গে, তুই কেন আবার ইস্কুল কামাই করে স্টেশনে আসতে গেলি? তোর ঠিকানা তো আমার জানাই ছিল, আমি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে তোর ঠিকানায় গিয়ে হাজির হতুম—দেখতিস কিচ্ছু গোলমাল হতো না—

প্রভা বললে—ট্যাক্সি তো নেই আজকে বাবা, আজকে যে ট্যাক্সি-ধর্মঘট—তুমি বিপদে পড়বে বলেই তো আমি এলুম—

—কেন? ট্যাক্সি-ধর্মঘট কেন?

প্রভা বললে—তা জানি না, আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনলুম আজ ট্যাক্সি নাকি চলবে না।

ভৈরববাবু বললেন—তা ধর্মঘটের কারণটা কী? বলা নেই কওয়া নেই ধর্মঘট করলেই হলো? এই ট্রেনের এত লোক মালপত্তোর নিয়ে কী করে বাড়ি যাবে?

প্রভা বললে—ও কলকাতায় হয়ই, ও নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি—

—তাহলে মালপত্র নিয়ে তোর বাসায় যাবো কী করে?

প্রভা বললে—তাই তো ভাবছি। শেষ পর্যন্ত যদি কিছু না পাওয়া যায় তখন একটা রিক্শা নিতে হবে—

—রিক্শা? রিক্শাতে এত বাক্স-প্যাঁটরা ধরবে।

প্রভা বললে—একটা রিক্শায় না যায়, দু'টো রিক্শা নিতে হবে!

তা রিক্শা পাওয়াই কি সোজা! চারদিকে তখন হাজার-হাজার লোক ছুটোছুটি আরম্ভ করেছে। হাঁক-ডাক হে চৈ। কিন্তু প্রভা বেশ সেয়ানা হয়েছে। ভৈরববাবু দেখে অবাক হয়ে গেলেন সেই ভিড়ের মধ্যেই প্রভা কুলিদের নিয়ে বেশ এগিয়ে চলেছে। সবাকছু সামলে নিচ্ছে।

তারপর প্লাটফরমের এক জায়গায় এসে বললে—বাবা, তুমি এখানে দাঁড়াও দিকিনি, আমি একটা রিক্শার ব্যবস্থা করে আসি—

ভৈরববাবুকে অবাক করে দিলে প্রভা! প্রায় আধঘণ্টা কাটবার পর কোথা থেকে হুড়মুড় করে আবার এসে হাজির। বললে—চলো বাবা, চলো,—

—গাড়ি পেয়েছিস?

যেন গাড়ি পাওয়া নয়, আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া।

প্রভা সামনের দিকে চলতে চলতে বললে—গাড়ি পাইনি। রিক্‌শা পেয়েছি একটা, তাইতেই যেতে হবে।

তারপর মোট-ঘাট নিয়ে পাঁচঘণ্টা লাগলো নস্কর-বাগানে আসতে। পিঠে-পেটে ব্যথা হয়ে গেল একেবারে। রিক্‌শা থেকে নেমে শিরদাঁড়া সোজা করতেই পাঁচ মিনিট লাগলো। প্রভা গুনে গুনে সতেরোটা টাকা দিলে।

—কত টাকা দিলি ?

—সতেরো টাকা।

ভৈরববাবু লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—বলিস কী রে ? সতেরো টাকা ?

প্রভা বললে—রিক্‌শা পেয়েছি এই যথেষ্ট। কলকাতার যা হাল, তুমি তা জানো না। কুড়ি টাকা-পঁচিশ টাকা চাইছিল সবাই। তারপরে এত মাল-পত্তোর। এ লোকটা রাজী না হলে শেষে সারাদিন স্টেশনেই যে পড়ে থাকতে হতো—

মাল-পত্র তোলা হবার পর ভৈরববাবু যেন একটু চাঙ্গা হলেন।

—হ্যাঁ রে, তুই কত মাইনে পাস ?

প্রভা বললে—দু'শো কুড়ি টাকা। আর তার সঙ্গে ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স আছে—

—তাতে তোর চলে কী করে ? বাড়ি-ভাড়া তো চল্লিশ টাকা বললি। তাহলে থাকলো কত ?

প্রভা বললে—শুধু কি মাইনেতে চলে নাকি ? টিউশনিও করি যে। তা এ-সব কথা এখন থাক, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও। কাল সেই বিকেলবেলা ট্রেনে উঠেছ। তারপর সারারাত তোমার ঝাঁকুনি গেছে। আমি তোমার ভাত চড়িয়ে দিই—

তা প্রথম দিনেই আলাপ হয়ে গিয়েছিল করুণাবাবুর সঙ্গে। করুণা-কান্ত সরকার। নিজে থেকেই এসে আলাপ করলেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট লোক। বড়বাজারে দোকান। দোকান করে বেশ দু'পয়সা করেছেন। কলকাতায় বাড়ি করেছেন দু'-তিনখানা। সব ছেলের নামে আলাদা আলাদা। ছেলেরা সকাল-বেলাই দোকানে চলে যায়। এখন করুণাবাবুর বয়েস হয়েছে, তাই সব দিন আর নিজে দোকানে যান না।

খানিকক্ষণ রোয়াকে বসে গল্প করার পর করুণাবাবু বললেন—যাই, আপনার সঙ্গে আলাপ হলো ভালো হলো, এখন আবার গিয়ে আহ্নিক করতে হবে—

করুণাবাবু চলে যেতেই ভৈরববাবু ভেতরে এলেন। প্রভা তখন রান্নাঘরের ভেতরে উনুনে আগুন দিয়ে রান্নার জোগাড় করছে।

কাছে গিয়ে ভৈরববাবু বললেন—ও রে, তোর বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে

আলাপ হলো। ভদ্রলোক বেশ ভালো লোক তো। বেশ ভালো বাড়িওয়ালা পেয়েছিস—

—কে? করুণাবাবু?

ভৈরববাবু বললেন—হ্যাঁ, নিজে থেকে এসে আলাপ করে গেলেন। আবার জপ-তপ-আহ্নিক করেন। বললেন—পরে আবার আসবেন—

প্রভা বললে—ও-সব কথা পরে শুনবো, তুমি আগে চান করে নাও বাবা! তোমার জন্যে চৌবাচ্চায় জল রেখে দিয়েছি—

সে দিনটা কাটলো। পরের দিন আরো ভালো লাগলো বাসাটা।

ছোট বাড়ি হলে কী হবে, বন্দোবস্ত বেশ ভালো। রাস্তার ওপরেও নয়, আবার একেবারে ভেতরেও নয়। হাওয়া আসে, রোদও আসে কোনও রকমে একটু। তারই মধ্যে আবার একটা ঢাকা বারান্দাও আছে। সেখানে একটা চৌকি পেতে দিব্যি শুতেও পারো। আর তার পাশেই একফালি উঠোন। সেখানে দাঁড়ালে ফাঁকা একচিলতে আকাশও দেখা যায়। তারই একপাশে কল-চৌবাচ্চা পায়খানা। দিব্যি গোছানো বাড়ি। প্রভাও বেশ গোছালো মেয়ে। বেশ গুছিয়ে সংসার করতে শিখেছে।

বেশিক্ষণ বাড়ির ভেতরে থাকা যায় না। বাড়ি থেকে বেরিয়েই একটু ঘোরা-ঘুরি করবার মত জায়গা থাকলে ভালো হতো। কলকাতার মতন শহরে তেমন আশাও করেননি ভৈরববাবু। তিনি চটিটা পায়ে দিয়ে বেরোতে যাচ্ছিলেন।

প্রভা জিজ্ঞেস করলে—কোথাও বেরোচ্ছ নাকি বাবা?

ভৈরববাবু বললেন—কাল থেকে বাড়ির মধ্যে রয়েছি, পায়ে বাত ধরে যাবে দেখছি। আমি যে আবার না হেঁটে থাকতে পারিনে রে—

—তাহলে এক কাজ করো না বাবা, তুমি ওই দিকেই তো যাচ্ছো, আমার জন্যে তিন ছটাক হলুদ আর আধ পোয়া নুন নিয়ে এসো তো। এই নাও পয়সা।

বলে, মেয়ে পয়সা বার করে দিলে। বাবার হাতে পয়সা দিয়ে বললে—এই নস্কর-বাগান লেন যেখানে ঘুরে বাঁদিকে গেছে ওইখানে একটা দোকান আছে, ওই দোকান থেকে নেবে—

ভৈরববাবু চটিটা পায়ে গলিয়ে রাস্তায় বেরোলেন, চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে বেশ ভালো লাগলো। আশেপাশে একতলা দোতলা তিনতলা সব বাড়ি। বাড়ি-গুলোর চেহারা খুব ভালো লাগলো। সকলের অবস্থা ভালো বলেই যেন মনে হলো।

যেতে যেতে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাড়িটার দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা অক্ষরে যেন কী সব লেখা রয়েছে আলকাতরা দিয়ে। দেখে বোঝা যায় নতুন বাড়ি করেছেন ভদ্রলোক। নতুন রং দিয়েছেন দেয়ালে।

চশমাটা ভালো করে বাগিয়ে নিয়ে ভৈরববাবু সামনে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে— 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চীনের পথ আমাদের পথ'—

ব্যাপারটা কী বুঝতে পারলেন না। বাড়ির সদর-দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। ভেতর থেকে কে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন সামনের দিকে। তারপর ভৈরববাবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কাকে চান ?

ভৈরববাবু বললেন—না, আমি কাউকে চাইছি না—এ আপনার বাড়ি বুঝি ?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, কেন ?

ভৈরববাবু বললেন—তা ওই কথাগুলো কী লিখে দিয়েছেন তাই দেখছিলাম—

—কোন্ কথাগুলো ? ওই দেয়ালের ওপর ?

—হ্যাঁ, ওর মানেটা কী তাই ভাবছিলাম। চীনের চেয়ারম্যান মানে কী বলুন তো ? কে চীনের চেয়ারম্যান ?

ভদ্রলোক ভৈরববাবুর দিকে চেয়ে আগাপাছতলা ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কোথায় থাকেন ? কোন্ পাড়ায় ?

ভৈরববাবু যেন কথা বলতে পেয়ে বেঁচে গেলেন।

বললেন—এই তো এই গলিটার ওই দিকে। প্রভাকে চেনেন ?

—প্রভা ? প্রভা কে ? কোন্ বাড়িটায় থাকে ? কত নম্বর ?

ভৈরববাবু বললেন—এই রাস্তারই বারো নম্বরে, করুণাকান্ত সরকারকে চেনেন ? বড়বাজারে স্টেশনারি দোকান আছে তাঁর। ভারী ধর্মভীরু লোক। রোজ আহ্নিক-টাহ্নিক করেন। তাঁরই বাড়িতে আমার মেয়ে ভাড়া থাকে। তীর্থময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের টিচার—

এতগুলো কথা কিন্তু শুনতে চাননি দেবসুন্দরবাবু। কলকাতা শহরে কে আর কার কথা শোনে ! কে আর কার খবর রাখে ! ভৈরববাবু গড়-গড় করে অনেক কথা একসঙ্গে বলে গেলেন। তারপর বললেন—আমি মশাই কাল এসেছি রায়পুর থেকে। রায়পুর চেনেন তো ? মধ্যপ্রদেশের মস্ত বড় সহর। এখনও কাউকেই চিনি না এখানকার—

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, রায়পুরের নাম শুনেছি—

—নাম শুনেছেন তো ? শুনবেন বৈকি ! রায়পুর তো আর ছোট শহর নয়। ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে আমি ছিলাম সুপারিন্টেন্ডেন্ট। ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট শুধু নামেই। আসলে যাকে বলে বড়বাবু। মানে যাকে বলে হেড-ক্লার্ক আর কি। চারশো টাকা মাইনে পেতুম। আর পঁয়তাল্লিশ টাকা ডিয়ারনেস এলাউয়েন্স—তবে কি জানেন, সস্তা-গণ্ডার দেশ তো, ওই মাইনেতেই চালিয়ে নিতুম একরকম করে। আমি আবার এদিকে স্বাবলম্বী মানুষ। সব

কাজ বরাবর নিজের হাতে করা অভ্যেস আমার। ঘরঝাঁট দেওয়া থেকে শুরু করে রান্না করা পর্যন্ত কোনও কাজ মশাই আমার আটকায় না। একদিন চেয়ারম্যান মহাজন সাহেব বাড়িতে এসেছেন। আমার তখন পরনে গামছা, হাতে ঝাঁটা, উঠোন সাফ করছিলুম। তিনি তো দেখে অবাক। আমার অত লজ্জাসরমের বালাই নেই ; লজ্জা করবো কেন বলুন ? Self-help is the best help. কী বলেন ? তা মহাজন সাহেব, আমাকে বললেন ··

ভদ্রলোক একমনে শুনতে লাগলেন ভৈরববাবুর কথাগুলো। আর বার বার ভৈরববাবুর আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। এ ধরনের মানুষ যেন আগে তিনি কখনও দেখেননি। গড়-গড় করে নিজের ঘরের কথা এমন করে অকপটে কেউ যে বলতে পাবে তাঁর জানা ছিল না।

ভদ্রলোক বললেন—বাইরে দাঁড়িয়ে আব কতক্ষণ কথা বলবেন, আসুন, ভেতরে আসুন না—

—ভেতরে যাবো ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে আসুন।

—কিন্তু আপনার কাজকর্মের কোনও ক্ষতি করে ফেলবো না তো ? আমার আবার কথা বলতে পেলে কিছু হুঁশ থাকে না মশাই—

বলে, ভদ্রলোকের পেছন-পেছন ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। চটিটা বাইরে রেখে ঢুকছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন—না না, জুতো বাইরে রাখতে হবে না, চুরি হয়ে যাবে, এ পাড়ার লোকজন ভালো নয়—

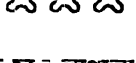

কিন্তু ভৈরববাবুর কেমন সংকোচ হতে লাগলো। এত ভালো মেঝে, এত সাজানো ঘর, তার ভেতরে ময়লা জুতো নিয়ে যাবেন !

—দেখুন, এ আমার সস্তা দামের চটি, রায়পুরে কিনেছিলাম, সাড়ে সাত টাকা দাম নিয়েছিল। রায়পুর সোনার দেশ মশাই, তবে সেখানকার রাস্তাঘাট এরকম নয়। সে একেবারে লাল মাটি চারদিকে। আর যা গরম পড়ে সেখানে গ্রীষ্মকালে, সে কী বলবো ! লাস্ট-ইয়ারে গরম পড়েছিল একশো কুড়ি ডিগ্রী। রাত্তিরবেলা তো আমরা সবাই ছাদেই শুতুম। আমি, প্রভা, প্রভার মা, সব ছাদের ওপর গড়া-গড়া খাটিয়া পেতে শুতুম—

—আপনি কাঠের চেয়ারটায় বসলেন কেন ? এই গদীওয়ালা সোফাতে বসুন না।

ভৈরববাবু তখন কথা বলতে এত ব্যস্ত যে কোথায় বসছেন সেদিকে খেয়াল ছিল না। এতক্ষণে চেয়ে দেখলেন। ঘরে বেশ বাহারে সোফা-কৌচ পাতা রয়েছে।

মাঝখানে চৌকো একটা কার্পেট। চেয়ারম্যান মহাজন সাহেবের বাড়িতে ঠিক এইরকম সোফা-কৌচ ছিল।

কৌচে গিয়ে বসতেই একেবারে সেটার মধ্যে ডুবে গেলেন।

বললেন—খুব আরাম হলো তো এটাতে বসে। ভারি আরাম হলো। সাহেব ব্যাটারা মশাই আরাম করতে জানতো। আমাদের বাঙালীদের তেমন পয়সাও নেই, তেমন আরাম করতেও জানিনে। তা হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—

বলে থেমে গেলেন। তারপর দেবসুন্দরবাবুকেই জিজ্ঞেস করলেন—কী কথা বলছিলুম বলুন তো?

দেবসুন্দরবাবু মনে করিয়ে দিলেন।

বললেন—ওই চীনের কথা বলছিলেন। চীনের চেয়ারম্যান—

হ্যাঁ, এতক্ষণে কথাটা মনে পড়ে গেল ভৈরববাবুর। বললেন—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা আপনি নতুন বাড়ি করে ও-সব কথা লিখে রেখেছেন কেন? চীনের চেয়ারম্যান কে? আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান তো ছিলেন মহাজন সাহেব, তাঁকে দেখেছি আমি। চীনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?

দেবসুন্দরবাবু এবার খুব জোরে হেসে উঠলেন। একেবারে হো-হো শব্দ করে।

বললেন—আপনি দেখছি একেবারে সেকেলে লোক, কলকাতায় নতুন এসেছেন তো, কিছুই খবর-টবর রাখেন না দেখছি—আপনার আর আমার বয়েস তো একই বোধ হয়। আমিও সম্প্রতি চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। কিন্তু আপনি বাইরে থাকতেন বলেই কিছু খবর রাখেন না আর কি! আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করবেন, সে এসব জানে।

বলে আবার হাসতে লাগলেন।

ভৈরববাবু তবু কিছু বুঝতে পারলেন না।

বললেন—তার মানে?

ভদ্রলোক বললেন—আপনার মেয়ে কলকাতায় থাকে কিনা, তাই সে সব জানে। তাকে জিজ্ঞেস করবেন। ও লেখা আমি লিখিনি, বাইরের ছোকরারা লিখে দিয়ে গেছে—

—বাইরের ছোকরারা মানে? আপনার বাড়ির দেয়ালে তারা লিখতে যাবে কেন? তাদের কীসের দায়?

হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ডাকলে—বাবা—

প্রভার গলা। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভৈরববাবু দেখলেন প্রভা তাঁর দিকে চেয়ে তাঁকে ডাকছে।

মেয়েকে দেখেই একেবারে যেন মর্ত্যে নেমে এলেন ভৈরববাবু। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—ওই আমার মেয়ে ডাকতে এসেছে—

রাস্তা থেকেই মেয়ে বলে উঠলো—বা রে, তুমি এখানে বসে বসে গল্প করছো, আর আমি ওদিকে হলুদ আর নুনের জন্যে বসে আছি—

—এই যাই। এই আমার মেয়ে। আমার মেয়েকে চেনেন তো? এই নস্কর-বাগান লেনের বারো-নম্বর বাড়িতে থাকে। করুণাকান্তবাবুর বাড়িতে।

ভদ্রলোকও দেখলেন প্রভাকে। চিনতে পারলেন মুখখানা। কিন্তু কিছু মন্তব্য করলেন না।

ভৈরববাবু বললেন—আমি মশাই আবার আর একদিন বরং আসবো, আলাপ হলো ভালো হলো—

বলে, রাস্তায় এসে নামলেন। প্রভা অনেকক্ষণ ধরে বাড়িতে বাবার জন্য অপেক্ষা করেছে। রাস্তায় খুঁজেছে। মুদির দোকানেও খুঁজেছে, কোথাও পায়নি বাবাকে। শেষকালে যখন হতাশ হয়ে বাড়ির দিকে চলে আসছিল, তখনই হঠাৎ একটা বাড়ির বাইরের ঘরের ভেতরে বাবাকে দেখতে পেলে।

প্রভা বললে—তোমাকে তিন ছটাক হলুদ আর আধ পোয়া নুন কিনতে দিয়েছিলুম, তাই কিনতেই তোমার দিন কাবার হয়ে গেল। তা কিনেছো?

ভৈরববাবু অপরাধীর মত চাইলেন মেয়ের দিকে।

বললেন—ওই যাঃ, গল্প করতে করতে একেবারে ভুলে গেছি মা। আমি তো গল্প করতুম না। কিন্তু দেখলুম ভদ্রলোক নতুন বাড়ি করেছেন অত পয়সা খরচ করে আর দেয়ালে কী-সব লিখে রেখে দিয়েছেন, পড়তে পারছিলুম না, তাই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করছিলুম, ও লেখাগুলোর মানে কী? তা ভদ্রলোক কী বললেন জানিস?

প্রভা জিজ্ঞেস করলে—কী বললেন?

—বললেন আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করবেন। সে জানে। সত্যি বল তো মা ও-কথাগুলোর মানে কী? আমি তো ভেবেই অবাক, লোকে বাড়ির সামনে এরকম নানা কথা কেন লিখে রাখে! তুই তো জানিস আমাদের চেয়ারম্যান মহাজন সাহেব বাড়ি করেছিলেন? বাড়ির সামনের দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখে-ছিলেন—'গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্'। তারপর আমাদের সেক্রেটারি সাহেব মিউনিসিপ্যালিটির জমি নিয়ে নতুন বাড়ি করলেন, বাড়ির সামনের দেয়ালে শ্বেতপাথরের ওপর লিখে দিলেন—'সর্বতো ভদ্রঃ'। ওসব তো বুঝি। অনেকে আবার ইংরিজীতেও কত কী লিখে দেয়। কিন্তু এরকম আলকাতরা দিয়ে ওসব লিখতে গেলেন কেন বল্ তো? ওর মানে কী? তুই লেখাটা দেখেছিস? ওই দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ। লেখাটা পড় তুই—

প্রভা লেখাটার দিকে চেয়েও দেখলে না। বললে—ওসব দেখার সময় নেই আমার, তুমি শিগ্‌গির শিগ্‌গির চলো—ওদিকে আমার রান্না আটকে আছে—

ভৈরববাবু বুঝলেন অপরাধটা তাঁরই। অপরাধীর মত গলিটা পেরিয়ে মেয়ের

সংগে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে হঠাৎ কী যেন মনে পড়লো। বললেন—ওই যাঃ—

প্রভা বুঝতে পারলে না কিছু। বাবার যেন কোনও কাজ করবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেটা করতে ভুলে গেছে।

জিজ্ঞেস করলে—কী হলো ?

ভৈরববাবু বললেন—এমন আমার ভুলো মন দ্যাখ, এতক্ষণ ভদ্রলোকের সংগে বসে বসে কথা বলে এলুম, অথচ ভদ্রলোকের নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হলো না—যাই, এক্ষুনি জিজ্ঞেস করে আসি—

বলে, মেয়েকে ফেলে একলাই আবার উল্টো দিকে হন্ হন্ করে চলেন। একেবারে দরজার সামনে গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোক ভেতরে চলে গেছেন।

ভৈরববাবু দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলেন—ও মশাই শুনছেন ? শুনুন—

কেউ উত্তর দিলে না।

ভৈরববাবু সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন।

—ও মশাই, শুনছেন ? শুনুন—

কিন্তু দেবসুন্দরবাবু ততক্ষণে একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে গৃহিণীর কাছে চলে গিয়েছেন।

—বুঝলে ? ওগো ? কোথায় গেলে তুমি ? ওগো ?

ডাকতে ডাকতে একেবারে আরো ভেতরে চলে গেলেন। জীবনে অনেক পয়সা জমিয়েছিলেন ভদ্রলোক। এককালে অনেক কষ্ট করেছেন। তাঁর সংগে সংগে গৃহিণীও কষ্ট করেছেন অনেক। প্রথম জীবনে টিনের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তখন গৃহিণীকে নিজের হাতে রান্না-বান্না করতে হয়েছে, বাসন মাজতে হয়েছে। তার ওপর বছর বছর সন্তান প্রসব করেছেন। তারপর এমন একটা চাকরিতে গেলেন যেখানে একেবারে ঘুষের রাজ্য। তারপরে বড় যুদ্ধটা বাধলো। সেই যুদ্ধের সময় ঘুষের আর গোনা-গুন্তি ছিল না। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে আসতেন কোঁচড়ে ভর্তি করে। যেদিন বেশি রোজগার হতো সেদিন আর বাসে-ট্রামে আসতে পারতেন না। ভয় করতো। একেবারে মোটা লোকসান দিয়ে ট্যাক্সি চড়েই বাড়ি আসতেন।

তখন থেকেই গৃহিণীর সুখ সুরু হলো। গতরে মোটা হলেন। ঝি-চাকরে ঘর ভরে গেল। পরনে ভালো শাড়ি দামী গয়না উঠলো। লক্ষ্মী উপচে পড়তে লাগলো সংসারে।

সেই গৃহিণী তখন রাঁধুনীকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন রাত্রে কী কী রান্না হবে।

বাবুর জন্যে লুচি আর তার সঙ্গে আলুভাজা। বাবু গরম আলুভাজা না হলে রাগ করেন, তা মনে আছে তো ঠাকুর? আর বড়দাদাবাবুর জন্যে মাংসতে ঝাল কম দেবে। তোমার ঝালের হাত একটু কমাও বাপু। অত ঝাল খেলে মানুষের অসুখ করবে যে!

দেবসুন্দরবাবু একেবারে হাঁক পাড়তে পাড়তে স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন।

—ওগো শুনছো?

গৃহিণী বললে—কী?

—আরে ওই বারো-নম্বরের বাড়িতে যে-মেয়েটা থাকে জানো তো?

গৃহিণী বুঝতে পারলে না। বললে—কে বারো-নম্বরে থাকে? আমি বারো-নম্বর বললে চিনবো কী করে? আমি কি রাস্তায় বেরোই যে সব বাড়ির নম্বর দেখে চিনে রাখবো?

রাঁধুনীও আর তখন দাঁড়ায়নি। সে কাজের হিসেব নিয়ে আবার রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন—আরে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যে-মেয়েটা ইস্কুলে যায়। বোধহয় মেয়ে-ইস্কুলে টিচার-ফিচার হবে।

—হ্যাঁ, তা সে কী করেছে?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—না, তার কথা বলছি না, তার বাবা এখন রিটায়ার করে কলকাতায় মেয়ের কাছে এসেছে। রায়পুরে থাকতো ওরা।

—কী বলছিল?

ভদ্রলোক বললেন—না, তাই তোমার কাছে বলতে এলুম। অমন বাপের এমন মেয়ে হলো কেন তাই ভাবছি। বাপকে দেখে তো বেশ ভদ্রলোক বলে মনে হলো। বেশ রগুড়ে লোক। কিন্তু মেয়েটা অমন হলো কেন?

—মেয়েটা কেমন?

—আরে সেই কথাই তো বলছি তোমাকে। দেখনি মেয়েটা যার-তার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে। যুতসব বড় বড় জুলফি-ওয়ালা বখাটে ছেলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়? আমি তাই করুণাবাবুকেও তো বলছিলুম—আপনি মশাই আর ভাড়াটে পেলেন না? তা করুণাবাবু বললেন—তখন কি আমি জানি মশাই যে, মেয়েটা ওই রকম। বললে তীর্থময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে মাস্টারি করে, তাই আমি ভাবলুম একটা মেয়ে থাকবে, রান্না-বান্না করে খাবে থাকবে, এ তো ভালোই। ছেলে-ছোকরা ভাড়াটে হলে বরং ভয় ছিল—

কথা শেষ হবার আগেই কানে এল সদর দরজায় কে যেন ঘা দিচ্ছে।

তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এসে দরজা খুলতেই দেখলেন—সেই বারো নম্বরের মেয়েটার বাবা।

বললেন—কী হলো ? আবার ফিরলেন যে ?

ভৈরববাবু বললেন—একটা ভুল হয়ে গেছে মশাই, দেখুন কী ভুলো মন আমার ! আপনার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করলুম, আপনার নামটাই জিজ্ঞেস করা হলো না—আপনি আমার নাম জানেন না, আমিও আপনার নাম জানলুম না। অথচ দু'জনে এতক্ষণ কথা বললুম। আমার নাম হলো গিয়ে শ্রীভৈরব চক্রবর্তী—

দেবসুন্দরবাবু হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন—আমার নাম হলো দেবসুন্দর পাল। আপনি সময় পেলেই আসবেন, গল্পটল্প করা যাবে।

ভৈরববাবু বললেন—আমাকে আর তা বলতে হবে না পালমশাই—। দেখবেন কালই এসে হয়ত হাজির হবো—

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আর কলকাতার যা হালচাল চলেছে তাতে তো এখন আর বাড়ির বাইরে বেরোবার উপায় নেই—

ভৈরববাবু ফিরতে গিয়েও তবু ফিরতে পারলেন না।

বললেন—কেন বলুন তো ?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—মুদির দোকানে গিয়েছিলেন আপনি ?

ভৈরববাবু বললেন—না, মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছিলুম, তা হঠাৎ আপনার নামটা জিজ্ঞেস করতে এলুম। মেয়েকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি—

দেবসুন্দরবাবু বললেন—তাহলে আর দাঁড়াবেন না, পরে কথা হবে, আসবেন কিন্তু ঠিক—

বলে ভৈরববাবু চলে যেতেই আবার সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

রাত্রে ভৈরববাবুর ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। মনে হলো যেন কোথাও একটা বিকট শব্দ হলো। এই ক'দিনেই বেশ পাড়ার কয়েকজনের সঙ্গে ভৈরববাবুর পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। ক'দিন থেকেই ভাবছিলেন এসব কী হচ্ছে কলকাতা শহরে !

দেবসুন্দরবাবুই প্রথম দিনে বলেছিলেন—কলকাতায় হালচাল বড় খারাপ চলেছে মশাই, অথচ সারা জীবন তো এই কলকাতাতেই কাটিয়েছি, আমরা দরকার হলে রাত বারোটা-একটা-দুটোর সময় বাড়ি ফিরেছি, কিছু হয়নি। এখন সন্ধ্যেবেলাই বেরোতে ভয় করে—

বারান্দাটায় একটা তক্তপোশের ওপর বিছানাটা পেতে ভৈরববাবু শুয়ে থাকেন। বুড়ো বয়েসের পাতলা ঘুম। প্রথম রাতটায় বেশ গাঢ় হয়েছিল ঘুমটা। আগের রাতটা ট্রেনে কেটেছে। তারপর হাওড়া স্টেশন থেকে সারা রাস্তা রিক্শা

করে আসতেই গায়ের গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। তারপরে কোথা দিয়ে রাত কেটে গিয়েছিল তা মালুম হয়নি।

কিন্তু পরের রাত্রে আর তেমন ঘুম হলো না।

সকালবেলা উঠে মেয়েকে বললেন—এখানে খুব মশা মা, রায়পুরে তো এরকম মশা ছিল না রে—

প্রভা বললে—তোমাকে তো মশারি টাঙিয়ে দিয়েছিলুম বাবা। তবু মশা কামড়েছে ?

ভৈরববাবু বললেন—কখন কোন্ ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে দেখতে পাইনি, সারা রাত কামড়েছে—

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, এখানকার কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটি নেই ?

প্রভা বললে—মিউনিসিপ্যালিটি থাকবে না কেন ?

—তা তারা মশা মারবার জন্যে তেল ছড়ায় না কেন ? আমরা তো রায়পুরে কত তেল ছড়িয়ে দিয়েছি নর্দমায় নর্দমায়—

প্রভা বললে—রায়পুরের সঙ্গে কলকাতার তুলনা ?

—তা এদের চেয়ারম্যান নেই ? চেয়ারম্যান কিছু দেখে না বুঝি ? আমাদের মহাজন সাহেব তো নিজে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সব দেখতেন।

প্রভা বললে—অত ঘোরবার সময় এখানকার চেয়ারম্যানের নেই—অত ঘুরলে তো কোনও লাভ হবে না তার, তার চেয়ে মীটিং করলে বরং খবরের কাগজে তার নাম ছাপা হবে—

—তা খবরের কাগজে নাম ছাপিয়ে লাভ কী হবে ?

প্রভা বললে—সে সব তুমি বুঝবে না বাবা, অত বোঝাবারও সময় নেই আমার, আমি চলি—

বলে প্রভা ইস্কুলে চলে গেল।

বেশ বড় বড় দাগ হয়ে গিয়েছিল ভৈরববাবুর সারা শরীরে। তা হোক, কলকাতা শহরে থাকতে হলে এসব সহ্য করতেই হবে। উপায় তো নেই।

রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হলেই ভৈরববাবু জিজ্ঞেস করেন—আপনি এই নস্কর-বাগান লেনেই থাকেন বুঝি ?

কেউ বলে—না, আমি থাকি বাদুড়-বাগানে—

ভৈরববাবু চিনতে পারেন না। বলেন—বাদুড়-বাগান কোথায় ? আমি মশাই কলকাতায় নতুন লোক, সব জায়গা চিনিনে—বরাবর রায়পুরে থেকে এসেছি কিনা ? রায়পুর চেনেন তো ?

—রায়পুর ? কোন্ রায়পুর ?

ভৈরববাবুর চিরকালের অভ্যেস মানুষকে ডেকে ডেকে তার সঙ্গে আলাপ

করা। তেমন গল্পবাজ লোক হলে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটু কথা বলতে পেলে ভৈরববাবুও যেন বেঁচে যান। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক দূর এগিয়ে যান। তারপরে বলেন—চলুন না, পার্কের ভেতরে গিয়ে একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে বসি।

চেনা নেই শোনা নেই, বসে বসে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গেই অনেক গল্প করেন। কিন্তু বেশিক্ষণ গল্প করার সময় কারো নেই কলকাতায়। একটু সন্ধ্যে হলেই সবাই উঠে পড়ে। বলে—সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বাড়ি যাই মশাই, দিনকাল বড় খারাপ—

ভৈরববাবু সকলকেই জিজ্ঞেস করেন—আগে কি মশাই এখানকার দিনকাল ভালো ছিল বুঝি?

ভদ্রলোকেরা বলে—খুব ভালো ছিল মশাই। খুব ভালো ছিল। তখন এই ধর্মতলার মোড়ে একটা দোকান ছিল, সেখানে একটা শার্ট কিনেছি পাঁচ সিকে দিয়ে—

ভৈরববাবু বলেন—সে আর কী এমন নতুন কথা বলছেন, লঙ্কাতেও তো শুনতে পাই এক টাকা ভরি সোনা ছিল—আমরা রায়পুরে এক পয়সায় পাঁচ সের বেগুন কিনে দু'পয়সা কুলি ভাড়া দিয়ে বাড়িতে বয়ে আনতে হয়েছে। আমার মেয়ে দুশো কুড়ি টাকা মাইনে পায়, আর ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স কুড়ি টাকা, তাইতে চল্লিশ টাকা বাড়ি ভাড়া দেয়, বাকি দুশো টাকাতেও দুটো পেট চলে না। দিনকাল খারাপ সে তো দেখতেই পাচ্ছি—

ভদ্রলোকরা বলে—না, সে কথা বলছি না—বলছি রাস্তায় ঘাটে তখন তো এরকম ছোরা-ছুরি বোমা-পটকা মারামারি চলতো না—। তাই বলছি, সন্ধ্যে-বেলা রাস্তায় না-থাকাই ভালো।

বলে ভদ্রলোকরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন।

যে ভদ্রলোকের বাড়ি বাদুড়-বাগানে তিনিও বললেন—আসি তাহলে—

ভৈরববাবু কাউকেই ছাড়তে চান না সহজে। বললেন—আপনাদের পাড়ায় কেমন চলছে? ছোরা-ছুরি বোমা-পটকা মারামারি?

ভদ্রলোক বললেন—না, আমাদের পাড়াটা মশাই ওদিক থেকে ঠাণ্ডা। গলি-রাস্তার ভেতরে গেলে ও-সব আছে। আপনাদের এই নস্কর-বাগান লেন কেমন?

ভৈরববাবু বললেন—না মশাই, আমাদের এ-পাড়ায় তেমন কিছু নেই।

ভদ্রলোক বললেন—নেই নেই বলছেন বটে, কিন্তু কোন্ দিন দেখবেন আপনাদের পাড়াতেও হবে, আমাদের পাড়াতেও হবে। কিছু বলা যায় না আজকাল।

বলে তিনি উঠে পড়লেন। তারপর নমস্কার করে চলে গেলেন।

ভৈরববাবুও উঠলেন। কিন্তু অত বেলাবেলি উঠতে ইচ্ছে করলো না। বাড়িতে এখন প্রভা হয়ত উনুনে আগুন দিয়েছে। এই সময়টা সমস্ত বাড়িটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যায়। করুণাবাবুর রান্নাঘরেও তখন উনুনে আগুন পড়ে। পাড়ার সব বাড়ি থেকেই তখন ধোঁয়া উঠে সমস্ত গলিটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যায়। সন্ধ্যেটা পার্কের ভেতরেই যা একটু ফাঁকা। দেখলেন গল্প করবার মত কোনও লোক নেই ভেতরে। দূরে লাল-সাদা আলো জ্বলছে দোকানের সাইনবোর্ড-গুলোতে। পার্কের বাইরেই ট্রাম আর বাসের রাস্তা। ট্রামের চাকার শব্দ কানে আসছে।

নিজেকে যেন কেমন নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো ভৈরববাবুর। রিটায়ার করবার পর থেকেই এই রকম লাগছে। বিশেষ করে কলকাতায় আসার পর থেকেই। তিনি আস্তে আস্তে পার্কের ভেতরের ঘোরানো পিচের রাস্তা ধরে পাক দিতে লাগলেন। দিন রাত এমনি চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগে নাকি কারো? প্রভা যে কী বলে তার ঠিক নেই। তাই তো ভোরবেলা যখন প্রভা ইস্কুলে চলে যায় তখন আর কোনও কাজ থাকে না ভৈরববাবুর হাতে। তিনি তখন ঝাঁটাটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে সুরু করেন। শুধু ঘর ঝাঁট দেন না, দেয়ালেব ঝুলও ঝাড়েন। তারপর গামছাটা পরে নিয়ে উঠোন পরিষ্কার করতে লেগে যান।

করুণাকান্তবাবু বাইরে থেকে ডাকেন—কই, ভৈরববাবু কোথায়?

সদর দরজা খুলে ভৈরববাবু ঝাঁটা হাতে নিয়ে হাজির হন।

বলেন—এসেছেন, আসুন, আপনারা সব কাজের মানুষ, তাই আর বিরক্ত করি নে। অথচ কাজ না হলে আমি বাঁচতে পারি নে মশাই, তাই ঝাঁটা নিয়ে উঠোনটা পরিষ্কার করছিলুম—

করুণাবাবু বলেন—ভালোই করেছেন, আমিও আহ্নিক করছিলুম এতক্ষণ।

—খুব ভালো অভ্যেস করেছেন আপনি! আহ্নিক-টাহ্নিক করা ভালো—বুঝলেন, ওতে মন পবিত্র হয়—

করুণাকান্তবাবু বলেন—না করে কী করি বলুন! চারদিকে যা সুরু হয়েছে তাতে মনটাকে ঠিক রাখাই তো দায়। আগের কালে যখন ছেলেরা ছোট ছিল তখন দোকান ছাড়া তো আর কিছু ভাবিনি। কিন্তু এখন একটু পরকালের কথা ভাবতে হয়—

—পরকাল?

ভৈরববাবু পরকালের কথা এতদিন একবারও ভাবেননি।

বললেন—তা পরকাল তো আমারও ঘনিয়ে আসছে—

—আপনারা ভাবেন কিনা জানি না মশাই, কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে তাতে পরকালের কথা না ভেবেই বা কি করি বলুন। কোনদিন হয়তো বোমার ঘায়ে

বেঘোরে প্রাণটা খোয়াতে হবে।

তারপরে বলেন—যাক, আপনাকে আর গামছা পরে আটকে রাখবো না। আপনি যান, কাজ করুন গে—

ভৈরববাবু বলেন—আমার কথা ছেড়ে দিন, আমার কাজ নেই তাই খই ভাজি! চিরকাল নিজের হাতে কাজ করে এসেছি তো, তাই কাজ ছাড়া দু'দণ্ড থাকতে পারি নে। এই দেখুন না, মেয়ে কেবল আমাকে রাস্তায় বেরোতে বারণ করে। আমি বলি ভালো রে ভালো, গায়ে ক্ষমতা রয়েছে এখনও, আমি কখনও চুপ করে হাত কোলে করে বসে থাকতে পারি? তাই সন্ধোবেলায় পার্কে গিয়ে ডেকে ডেকে লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি। সেদিন বাদুড়-বাগানের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো রাস্তায়। কিন্তু কেউ আর রাস্তায় বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। কেন বলুন তো?

করুণাকান্তবাবু বলেন—চারদিকে বোমা-টোমা তো ফাটছে খুব, সেই-জন্যেই—

—তা বোমাগুলো মারছে কারা? কোথায় মারছে? আমি তো দেখতে পাইনে। খবরের কাগজে দেখি একটু একটু, কিন্তু কারণটা মশাই বুঝতে পারি না—

করুণাকান্তবাবু বলেন—কেউই বুঝতে পারে না। ও বোঝবার জিনিস নয়—

ভৈরববাবু বলেন—আমিও তো তাই বলি। আর তা ছাড়া আমাদের বোমা মারবেই বা কেন মশাই? আমরা কার কী ক্ষতি করেছি, বলুন? কেউ তো পাগল নয়—

করুণাকান্তবাবু বলেন—হ্যাঁ, আসলে ও-সব নিজেদের পার্টির মধ্যে ঝগড়া। দলে দলে তো সব ভাগ হয়ে গেছে। হাজারটা পার্টি যে আমাদের দেশে। আপনি আমি কী করবো?

ভৈরববাবু বলেন—তা থাক না, পার্টি থাক না। হাজারটা কেন, লক্ষ লক্ষ পার্টি থাকুক, আমাদের কী? আমরা তো মশাই আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমাদের দরকার কী?

করুণাকান্তবাবু বলেন—দরকার নেই বললে তো শুনবো না। আমরাও তো মশাই ট্যাক্সো দিই, আমাদের ভালো-মন্দ আমরা বুঝে নেব না, আমরা কি দেশের বাইরে?

করুণাকান্তবাবুর কথাটা ভৈরববাবুর ভালো লাগলো। কলেজে পড়বার সময় প্লেটোর কথাগুলো পড়েছিলেন। Plato বলে গেছেন—The punishment that the wise and good men of a country, who decline to take interest in the affairs of their country must suffer—is to

be gladly ruled by the rest, viz. fools and knaves.

পার্কের ভেতরে চলতে চলতে করুণাকান্তবাবুর কথাগুলো তাঁর মনে পড়ছিল। বাড়িওয়ালা হলে কি হবে, লোকটা ভালো। আজকালকার বাজারে কে আর কার খবর নেয়? তবু তো করুণাকান্তবাবু খবর-টবর নেন তাঁর। ওদিকে আবার সকাল-সন্ধ্যায় আহ্নিক করেন।

পাশ দিয়ে একটা ছেলেমানুষ যাচ্ছিল। বাচ্চা ছেলে। নাতির বয়সী। দেখে মনে হলো ভদ্র-বংশের সন্তান। প্যান্ট-শার্ট পরা। গালের ওপর লম্বা জুলফি।

জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কাছে ঘড়ি আছে বাবা? ক'টা বেজেছে একবার বলো তো?

ছেলেটার বোধহয় খুব তাড়া ছিল। কোথায় যাচ্ছিল হন্ হন্ করে। কথাটা শুনেই ভৈরববাবুর দিকে চাইলে ভালো করে।

বললে—ছ'টা দশ—

বলে আবার ভৈরববাবুর মুখের দিকে তাকালো। বলল—দাদু আপনি আর পার্কে থাকবেন না, এবার বাড়ি যান—

ভৈরববাবু অবাক হলেন। বললেন—কেন বাবা?

—আমি ভালো কথাই বলছি, আমার কথা শুনুন।

বলে আর দাঁড়ালো না। হন্ হন্ করে যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকেই চলে গেল। ভৈরববাবুও নিজের পথে চলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আবার ফিরে দাঁড়িয়ে ছোকরাটির দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখতে পেলেন না। কিন্তু তবু দেখতে চেষ্টা করলেন। ছেলেটা ভদ্র-বংশের সন্তান বলেই মনে হলো। রায়পুরের ছেলেরাও প্যান্ট-শার্ট পরা সুরু করে দিয়েছে। একবার ভাবলেন ছেলেটাকে আবার ডাকেন। জিজ্ঞেস করেন কোথায় থাকে, কোন্ পাড়ায়? বাবার নাম কী? দেশ কোথায়? ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর ভাবলেন—না থাক্, দরকার নেই। ডেকে-ডেকে তাঁর আলাপ করবার অভ্যেসটাই খারাপ। প্রভাও বারণ করে দিয়েছে। বলেছে—এ তোমার রায়পুর নয় বাবা, এখানে যেচে যেচে সকলের বাড়িতে তুমি যাও কেন? এখানে কেউ কারো নয়। কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না—

ভৈরববাবু বলেছিলেন—কেন, আমি আবার কার সঙ্গে যেচে-যেচে আলাপ করলুম?

—কেন, ওই যে দেবসুন্দরবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলে? ওঁদের সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক?

ভৈরববাবু বলেছিলেন—বা রে, দেবসুন্দরবাবুর সঙ্গে কি আমি যেচে আলাপ করতে গিয়েছিলুম? উনিই তো আমাকে ডেকে নিজের বৈঠকখানায় বসালেন। আমি তো দেয়ালের লেখাটা পড়ছিলুম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

—তা দেয়ালের লেখা পড়বার তোমার দরকারটা কী ? কার দেয়ালে কী লেখা আছে তা নিয়ে তোমার কীসের মাথাব্যথা ? তোমার বাড়ির দেয়ালে লিখলে আলাদা কথা। তুমি রিটায়ার্ড লোক. সারাজীবন অফিসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাকরি করেছ, এখন বাড়ির মধ্যে বসে থাকলেই পারো।

ভৈরববাবু বলেছিলেন—তাই কি কেউ বসে থাকতে পারে ? আমি কাজের মানুষ, হাত-পা সুস্থ-সবল আছে এখনও, সারা দিন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে পারি ? তাই তো তুই যখন ইস্কুলে যাস, আমি তোর রান্নাঘর উঠোন সব কিছু পরিষ্কার করি, কয়লা ভাঙি। কত কাজ করি। তুই ওই ঝি-টাকে তাড়িয়ে দে মা, আমি তোর এঁটো বাসন নিজেই মেজে দেব। ভারি তো দু'টো থালা আর দু'টো বাটি। ওর জন্যে মাসে-মাসে চোদ্দটা টাকা কেন জলে ফেলে দেওয়া ?

এর পরে আর কথা বলা উচিত মনে করেনি প্রভা, সে তার নিজের কাজে চলে গিয়েছিল।

ভৈরববাবু চলতে চলতে ভাবতে লাগলেন—এই-ই হলো জীবন। এর নামই জীবন-যুদ্ধ। নিজের মেয়ে। সেই এতটুকু বাচ্চা বয়েস থেকে কোলে-পিঠে করে যে-মেয়েকে তিনি মানুষ করেছেন, তারই আবার এখন এত বুদ্ধি হয়েছে। এখন সে ই আবার বাবাকে উপদেশ দিতে আসে। যেন বাবা কিছু বোঝে না। যেন বাবার কিছু বুদ্ধি নেই।

প্রভা বলে—জিনিসপত্রের দাম কী-রকম বাড়ছে তা তুমি দেখতে পাও না ? তুমি সেই কেবল কবে এক পয়সায় পাঁচ সের বেগুন ছিল, তাই-ই ধরে বসে আছো—লংকায় যদি সোনা সস্তা হয় তো আমাদের কী ?

—মানুষ যে বেড়েছে রে—

ভৈরববাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি আবার বলেন—মানুষ যে বেড়েছে রে, তা দাম বাড়বে না ? মানুষও বেড়েছে, তাই দামও বেড়েছে—তারপর মানুষের মতি-গতিও যে বদলে গেছে। সেই যুগের মানুষ কি আর আছে ?

পার্কের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে ভৈরববাবুর সেই কথাগুলো বার বার মনে পড়তে লাগলো। ছোট্ট মেয়ে তো, এখনও ভালো-মন্দ বুঝতে শেখেনি। মনে করে দেশের বুঝি হাজারটা সমস্যা। আরে বোকা মেয়ে, আগে হিস্ট্রী পড়। জার্মানি যখন হল্যান্ড অ্যাটাক করে বসলো তখন···

হঠাৎ বিকট একটা শব্দ হলো পার্কের মধ্যে।

শব্দটা শুনে ভৈরববাবু চমকে উঠেছেন। কী ফাটলো ? কোথায় কী হলো ? বোমা নাকি ? বাদুড়-বাগানের সেই ভদ্রলোক বলছিলেন বটে, ছোরা-ছুরি বোমা-পটকার কথা। সেই সব কাণ্ড নাকি ? হঠাৎ কানে এল যেন অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ। কারা যেন দৌড়চ্ছে। দৌড়ে পালাচ্ছে পার্কের গেট দিয়ে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেছে চারদিক।

হঠাৎ দেখলেন প্রায় দশ-বারোজন লোকের ছায়া-মূর্তি তাঁর দিকেই দৌড়ে আসছে। তাঁর পাশ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে যেতে গিয়ে একজন থমকে তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে গেল।

বললে—দাদু, এখানে দাঁড়াবেন না, চলে যান, পুলিশ আসছে—

ভৈরববাবু বললেন—কেন, কী হয়েছে?

—ওদিকে বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি চলেছে। শিগ্‌গির চলে যান—পুলিশে ধরবে—

ভৈরববাবু বললেন—আমি কী করেছি বাবা যে আমাকে পুলিশে ধরবে? তোমরা যে-যেখানে যাচ্ছ যাও যাও, আমি বুড়ো মানুষ, আমি কি দৌড়তে পারি?

ছোকরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। হঠাৎ ভৈরববাবুর হাতটা ধরে ফেললো। বললে—না, আসুন, আপনাকে আমি বাড়ি পৌঁছিয়ে দিই—

বলে ভৈরববাবুর হাত ধরে টেনে পার্কের গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়লো।

—বাড়ি যেতে পারবেন তো দাদু?

ভৈরববাবু ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখলেন। একবার মনে হলো বুঝি সেই ছেলেটা। যার কাছে তিনি ঘড়িতে ক'টা বেজেছে জানতে চেয়েছিলেন। ঠিক সেই প্যান্ট-শার্ট পরা চেহারা। লম্বা জুলফি। মাথায় রুক্ষ চুল। কিন্তু আবার মনে হলো আজকালকার সব ছেলেকেই তো এইরকম দেখতে।

তারপর একটু পরে ভৈরববাবু বললেন—নম্বর-বাগান লেনে বারো-নম্বর বাড়িতে আমি থাকি। সেটা কোন্ দিকে তুমি জানো?

আবার ওদিক থেকে আর একটা আওয়াজ হলো। তারপর পর পর কয়েকটা। ধোঁয়ার গন্ধ নাকে আসতে লাগলো তাঁর। ধোঁয়ার ঝাঁজে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

—চলুন চলুন, শিগ্‌গির চলুন—

ছেলেটা যত তাড়া দেয় তত যেন ভৈরববাবু থতমত খেয়ে যান। চারদিকে নজর পড়তেই দেখেন আশেপাশের সব বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ হয়ে গেছে! কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। রাস্তার ইলেকট্রিক আলোগুলোও দপ করে এক সময়ে একসঙ্গে নিভে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার।

—প্রভাদি, ও প্রভাদি—

ছেলেটা বারো-নম্বর বাড়িটার সামনে এসে ডাকতেই ভেতর থেকে প্রভা দরজা খুলে দিলে। বাবাকে দেখেই প্রভা বলে উঠলো—বাবাকে নিয়ে এলি?

ভৈরববাবু নিজের মেয়েকে দেখতে পেয়ে যেন বাঁচলেন।

বললেন—ওরে প্রভা, সব অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিকে, আমি কিছু দেখতে

পাচ্ছিলুম না, রাস্তাও চিনতে পারছিলুম না—ভাগ্যিস এই ছেলেটা আমাকে পেঁছিয়ে দিয়ে গেল।

তারপর পাশে চেয়ে দেখলেন ছেলেটা নেই। কখন হঠাৎ চলে গেছে তিনি টের পাননি। ভেতরে ঢুকতেই প্রভা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

ভৈরববাবু বললে—কী মজা দ্যাখ মা, তোর নাম করতেই ছেলেটা চিনলে আমাকে, জানিস। আমি তো বাড়ি চিনতে পারছিলুম না, কিন্তু ও আমাকে চেনে মনে হলো। আমাকে হাত ধরে ধরে ঠিক বাড়িতেই তো নিয়ে এসে পেঁছিয়ে দিয়ে গেল।

প্রভা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আমি বললুম তোমাকে, তুমি কোথাও বেরিও না, তা তুমি তো শুনবে না। তুমি বুড়ো মানুষ, কোথাও বেরোবার দরকার কী তোমার ?

ভৈরববাবু কোনও কথা বললেন না। প্রভা সকাল-সকাল ভাত দিলে। তাই খেয়ে নিয়ে তিনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। যখন মাঝ-রাত তখন দুম-দাম শব্দে আবার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসলেন। ঠিক সেই সন্ধ্যেবেলাকার মত আওয়াজ।

ডাকলেন—প্রভা, ও মা প্রভা—

পাশের ঘরেই প্রভা শুয়ে ছিল। বলে উঠলো—কী বাবা ?

—হ্যাঁ রে, আবার সেইরকম আওয়াজ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছিস ?

প্রভা বললে—ও বোমার আওয়াজ, ও কিছু না, তুমি ঘুমোও—

ভৈরববাবুর আর কিছু বলার সাহস হলো না। আবার হয়ত সেই পার্কের মধ্যে ছুরি-ছোরা বোমা-পটকা চলছে। তিনি বিছানায় শুয়ে সেই আওয়াজ শুনতে লাগলেন। সবাই মিলে যেন সমস্ত কিছু গোলমাল করে দিতে চায়। যা ভালো বুঝছে করুক গে। কেউ তো হিস্ট্রী পড়ে না আজকাল। নইলে জার্মানি যেদিন হল্যান্ড অ্যাটাক করেছিল, সেদিন···

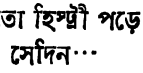

শেষ পর্যন্ত ভৈরববাবু ঘুমিয়েই পড়লেন। বুড়ো মানুষদের রাত্রে এরকম ঘুম একবার ভাঙে, আবার এক সময়ে ঘুম আসেও। ও নিয়ে প্রভার দুশ্চিন্তা ছিল না।

হঠাৎ এক সময়ে প্রভার শোবার ঘরের জানালায় আস্তে একটা টোকা পড়লো। এবার প্রভা বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। দরজাটা গিয়ে খুলে দিতেই দেখলে সমর দাঁড়িয়ে।

বললে—কী রে সমর, এত রাত্তিরে তুই ?

সমর তখনও হাঁফাচ্ছে। বললে—প্রভাদি, সব্বোনাশ হয়েছে। গণেশদা মারা গেছে।

—সে কী রে?

প্রভার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো। গণেশ মারা যাওয়া মানে যে কী তা যেন প্রভার চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানে না।

যেটুকু জানা ছিল না, সেটুকুও জানিয়ে দিলে সমর। পুলিশের ওপর চার্জ করতে গিয়েছিল গণেশ, আর তারপরেই সুরু হয় লড়াই। ওদের দলের সঙ্গে এদের দলের লড়াইতে পুলিশ বাধা দিতে আসার পরই জিনিসটা জটিল হয়ে ওঠে। আসলে নস্কর-বাগান লেনে সমররাই দলে ভারী। এ দলাদলি এই এক বছর হলো বেশি করে বেড়েছে। প্রভা যখন প্রথম এ-পাড়াতে আসে তখন এসব কিছুই ছিল না। একবার ইলেকশানের সময় ভোট দিতে গিয়েই পরিচয়টা হলো এদের। সেদিন দেয়ালে দেয়ালে লেখা বেরোল—"কেউ ভোট দেবেন না। ভোট সাম্রাজ্যবাদীদের ধাপ্পাবাজি। ভোটে সাম্রাজ্যবাদীদের হারানো যাবে না।"

কথাটার ওপর কলকাতার কেউই তখন বেশি গুরুত্ব আরোপ করেনি। সকাল-বেলা ওই গণেশ এসেছিল বাড়িতে। বলেছিল—দিদি, দয়া করে আপনি ভোট দেবেন না—

—কেন ভাই? প্রভা জিজ্ঞেস করেছিল।

গণেশের সঙ্গে আরো কয়েকজন ছেলে ছিল। সবারই বয়েস কম। কারোরই দাড়িগোঁফ ভালো করে গজায়নি তখনও।

প্রভার কথার উত্তরে পাশের একটা ছেলে বলেছিল—ভোট মানেই ধাপ্পাবাজি, প্রভাদি—

প্রভা বলেছিল—কিন্তু ভোট তো সব দেশের লোকই দেয় ভাই—

এই সমর সেদিন বলেছিল—যাদের দেশে খুব টাকা আছে, তাদের দেশেই ভোট আছে প্রভাদি। আমাদের গরীব দেশে, আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভোট নেওয়া হয়, তাতে আমাদের কোনও লাভ হয় না।

—কিন্তু তাই যদি মনে করো তো ভোট না দিলেই হয়।

গণেশ বললে—সেইজন্যেই তো আপনাকে ভোট দিতে বারণ করছি—আমরা পাড়ায় পাড়ায় সকলের কাছে গিয়েই এই কথা বলছি, দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিচ্ছি—

প্রভা বললে—কিন্তু তোমরা কারা? কোন্ পার্টির?

গণেশ বললে—আমরা আমাদের ক্লাবের মেম্বার। এই পাড়াতেই আমাদের ক্লাব আছে! নস্কর-বাগান ক্লাব।

—কিন্তু তোমরা যে এসব করছো, এর পেছনে কে আছে?

—কেউ নেই। পেছনে আবার কে থাকবে? আমরা লেখাপড়া শিখেছি, আমরা সব বই পড়েছি, নানান রকম বই আছে আমাদের কাছে, সেই সব পড়েই আমরা সমস্ত শিখেছি।

প্রভা বললে—আচ্ছা তোমরা এখন এসো ভাই, আমাকে এখন ইস্কুলে যেতে হবে, আমার দেরি হয়ে যাবে, পরে এসো—

তা সত্যিই তারা পরে একদিন এল। সেই একদিনই নয়, আরো অনেক দিন এল। শেষকালে দেখলে তারা ঘন ঘন আসছে।

একদিন প্রভা বললে—ভাই তোমরা আমার এখানে আসো, এটা পাড়ার লোকেরা পছন্দ করছে না। আমার বাড়িওয়ালা আমার ওপর খুব চটে গেছে—

সবাই হৈ-হৈ করে উঠলো। —বাড়িওয়ালা বুড়োকে দেখে নেবো।

সে-সব অনেকদিন আগেকার কথা। তখন সবে কলকাতায় নতুন এসেছে প্রভা। একদিন বাড়িওয়ালা করুণাকান্তবাবুর ওপরেই তারা হামলা করতে যায় আর কি!

প্রভা গিয়ে থামিয়ে দিলে। বললে—করছো কী তোমরা? তোমরা ভদ্রলোকের গায়ে হাত দেবে নাকি?

গণেশ এগিয়ে এসে বললে—প্রভাদি, আপনার ওপর অত্যাচার যে করবে তার প্রতিশোধ আমরা নেবই। আমাদের তুমি বাধা দিতে এসো না।

প্রভা বললে—ছিঃ, তোমরা না ভদ্রলোকের ছেলে সব!

সমর বললে—না প্রভাদি, ওই কথাটা বোলো না তুমি। ভদ্রলোকের মানে বদলে গেছে এখন। ভদ্রলোক মানেই বুর্জোয়া, আমরা বই পড়ে সমস্ত জেনে গেছি। ভদ্রলোক বলে বলে আমরা এতদিন অনেক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছি, এবার আর সহ্য করবো না—

কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রভার কথাতেই ছেলেগুলো গণ্ডগোল মিটিয়ে নিলে সেবার। যাবার সময় শাসিয়ে গেল করুণাকান্তবাবুকে—আর যদি আপনি কখনও প্রভাদিকে কোনও কষ্ট দেন তো আমরা ছেড়ে কথা বলবো না, তা বলে রাখছি—

ছেলেরা চলে গেল বটে, কিন্তু সেইদিন থেকেই পাড়াতে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হলো।

করুণাকান্তবাবু সকলের বাড়িতে বাড়িতে গেলেন—দেখুন, আপনারা তো সবাই শুনেছেন মশাই, নিজের কানেই তো শুনেছেন, ছেলেরা আমাকে কেমন করে শাসিয়ে গেল।

সত্যিই যখন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছেলেরা করুণাকান্তবাবুকে শাসাচ্ছিল তখন নস্কর-বাগান লেনের সমস্ত লোকই শুনেছিল। কেউ-বা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আবার কেউ-বা জানালার আড়াল থেকে। কিন্তু সবাই-ই যে শুনেছিল

সে সম্বন্ধে কারোর সন্দেহ নেই।

কিন্তু কারোর সাহস হলো না ছেলেদের বিরুদ্ধে কিছু বলে।

হেরম্ববাবু বললেন—এটা বড় অন্যায় তো! কিন্তু ওরা কারা?

দেবসুন্দরবাবুও দাঁড়িয়ে ছিলেন একপাশে। করুণাকান্তবাবু তাঁর দিকেও একবার চাইলেন। বললেন—আপনি তো এ পাড়ায় নতুন লোক, আপনারা সবাই মিলে যদি এর প্রতিবাদ না করেন তো একদিন ওরা আপনাদেরও শাসাবে, তা আমি এই বলে রাখলুম—

দেবসুন্দরবাবু বললেন—কিন্তু আপনি ও-রকম ভাড়াটে রাখলেন কেন বলুন তো? যাকে-তাকে কি আজকাল বাড়ি-ভাড়া দিতে হয়? আজকাল দিনকাল যে খারাপ মশাই—

করুণাকান্তবাবু বললেন—তখন আমি কী করে চিনবো মশাই, কে কী-রকম লোক? দেখলুম একলা মেয়ে, ইস্কুলের টীচার, স্বভাবচরিত্র ভাবলাম ভালো হবেই, কিন্তু এমন যে হবে আমি কী করে কল্পনা করবো?

হেরম্ববাবু বললেন—কিন্তু ছেলেগুলো কে? কারা ওরা?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আপনি থানায় খবর দিন—

হেরম্ববাবু বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবসুন্দরবাবু ঠিকই বলছেন, আপনি পুলিশে খবর দিন, অন্তত ডাইরিটা করে দিয়ে আসুন, যান, আর দেরি করবেন না—আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না ওদের—যান—

দেবসুন্দরবাবু বললেন—হ্যাঁ, আমিও বলি তাই, যান—

করুণাকান্তবাবু বললেন—তাহলে চলুন না আমার সঙ্গে, আপনারাও বলবেন আপনারা সবাই দেখেছেন, সবাই কানে শুনেছেন। চলুন না যাই—

দু'জনের মুখই যেন কেমন শুকিয়ে এল।

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আমি তো যেতে পারতুম, কিন্তু আমাকে যে আবার এক্ষুনি একবার কোর্টে যেতে হবে—সাক্ষী দেবার সমন আছে আমার একটা।

—তাহলে হেরম্ববাবু, আপনি অন্তত চলুন আমার সঙ্গে। কেস্‌টা তাহলে একটু জোরদার হবে।

—আমি?

বলে হেরম্ববাবু যেন একটু ভাবলেন। তারপরে বললেন—তাহলে দাঁড়ান, এই জামাটা গায়ে দিয়ে আসি—

বলে নিজের বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

কিন্তু ভেতরে যেতেই দেখলেন অন্দরমহলে বেশ জটলা সুরু হয়েছে। বড় ছেলে, মেজ ছেলে, গৃহিণী সবাই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। বুঝলেন তাঁকে নিয়েই তাদের যত আলোচনা।

গৃহিণীই আগে কথা বললেন।

—কোথায় চলেছ ?

হেরম্ববাবু বললেন—করুণাকান্তবাবুর বাড়ির ভাড়াটের ব্যাপারে। উনি থানায় গিয়ে ডায়েরি করবেন তাই আমাকে সঙ্গে যেতে বললেন—

—তাই বুঝি জামা পরতে এসেছ ?

তারপর বড় ছেলের দিকে চেয়ে গৃহিণী বললেন—দ্যাখ্ দ্যাখ্ ভবেশ, এই মানুষটার বুদ্ধি দ্যাখ্, নিজের বাড়ির ব্যাপার সামলাতে আমরা হিমশিম খেয়ে মরছি, আর উনি যাচ্ছেন পরের বাড়ির ঝামেলা মেটাতে।

বড় ছেলে ভবেশ। ভবেশের তখন অফিস যাবার টাইম হয়ে গেছে।

সে বললে—তুমি ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকছো কেন বল তো বাবা ? করুণাবাবুর ভাড়াটে, করুণাবাবু বুঝবেন। ওর মধ্যে আমাদের নাক গলাবার দরকারটা কী ? এর পরে যখন কোর্ট-ঘর করতে হবে, তখন সে-ঝামেলা কে পোয়াবে ?

গৃহিণী বললেন—সাধে কি বলি এ মানুষের ঘটে একটুকু বুদ্ধি নেই। ওই তো দেবসুন্দরবাবু, উনি তো বেশ পাশ কাটিয়ে গেলেন। হবে না কেন, এ মানুষের মত বোকা তো নন—

ছোট ছেলে নরেশ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এবার বললে—আর ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে কি আপনি পেরে উঠবেন ভেবেছেন ? ওরা নস্কর-বাগান ক্লাবের ছেলে, ওরা সবাই নাম-করা গুণ্ডা—

এতক্ষণে যেন অবস্থার গুরুত্বটা বুঝলেন হেরম্ববাবু।

বললেন—তাহলে যাবো না বলছো ?

গৃহিণী বললেন—তা সেটাও তোমাকে আবার বলে দিতে হবে ? তোমার নিজের ঘটে একটা বুদ্ধি নেই ?

—কিন্তু আমি যে করুণাবাবুকে বলে এলুম, আমি জামা পরে আসছি—

গৃহিণী বললেন—তা জামা পরে যাবে বলেছো, যাও না। কে তোমায় যেতে বারণ করছে ?

হেরম্ববাবু বললেন—ওই তো তোমাদের রাগের কথা ! আমি যাবো কিনা বলে দাও না—

গৃহিণী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। বললেন—তুমি পুরুষমানুষ, তুমি তোমার ভালো বুঝবে না, আর আমি মেয়েমানুষ হয়ে বোঝালে তবে বুঝবে ? তাহলে তুমি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালেই পারতে !

এর পরে আর কথা বলা চলে না। এ-কথায় নিতান্ত শান্ত মানুষও গরম হয়ে উঠতে পারে। হেরম্ববাবুও এতক্ষণে রেগে গেলেন।

বললেন—তাহলে তোমরা গিয়ে যা বলবার বলে দাও—

গৃহিণী বললেন—তা তোমার হয়ে কে বলতে যাবে ? দোষ করবে তুমি আর তার দায় ভোগ করবো আমরা ?

হেরম্ববাবু বলা নেই কওয়া নেই, সেইখানে সেই সিঁড়ির একটা ধাপে অসহায়ের মত ধপাস করে বসে পড়লেন ! তারপর দুটো হাতের পাতায় মাথাটা ধরে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন।

বললেন—তোমাদের জ্বালায় আমি জেরবার হয়ে যাবো এবার। আমি আর উঠতে পারছিনে। যা করবার তোমরা করো।

গৃহিণীর এবার বোধহয় একটু দয়া হলো। ভবেশের দিকে চেয়ে বললেন—ওরে, তুই আপিস যাচ্ছিস তো, যাবার সময় ওদের কর্তাকে বলে যা তো যে, ওর শরীর খারাপ, ব্লাড-প্রেসার বেড়েছে। উনি শুয়ে পড়েছেন।

ভবেশ আর দাঁড়ালো না। কোট-প্যান্ট তার পরাই হয়ে গিয়েছিল। সে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে গেল সদর-দরজা দিয়ে।

বাইরে করুণাকান্তবাবু তখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে হেরম্ববাবুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

ভবেশকে দেখে জিজ্ঞেস করেলেন—কী ভবেশ, তোমার বাবা কোথায় ? জামা পরতে এত দেরি হচ্ছে কেন তাঁর ? আমার সঙ্গে যে থানায় যাবেন বললেন—

ভবেশ করুণাকান্তবাবুর কাছে গিয়ে সবিনয়ে বললে—না কাকাবাবু, বাবা যেতে পারবেন না। তাঁর ব্লাড-প্রেসারটা হঠাৎ বেড়ে গেছে।

—তাই নাকি ? ঠিক এই সময়েই কিনা ব্লাড-প্রেসারটা বেড়ে গেল ?

ভবেশ বললে—বাবা তো একটু উত্তেজনাও সহ্য করতে পারেন না কিনা—

করুণাকান্তবাবু বললেন—তা তুমিই একবার আমার সঙ্গে থানায় চলো না ! দেখছো তো বাড়িতে মেয়েছেলে ভাড়াটে রেখে কী ঝঞ্ঝাট হয়েছে আমার। কোত্থেকে একপাল ছোঁড়া এসে আমাকে কেমন শাসিয়ে গেল বলো তো। আমি তাদের খাই, না পরি ?

—তা তো বটেই, কিন্তু আমার যে ওদিকে অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে আবার। আমি তো আর এক মিনিটও দেরি করতে পারবো না—

বলে, নিজের হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে বাস-রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

করুণাকান্তবাবু থানায় যাবেন বলেই তৈরি হয়ে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু এর পর আর বেরোনো হলো না ! একলা-একলা থানায় যেতে তাঁর ভরসা হলো না। তিনি আবার সেই বাড়ির ভেতরেই ঢুকলেন।

এই-ই হলো প্রথম অঙ্ক।

কিন্তু নাটকের প্রথম অঙ্কেই যার হট্টগোল তার শেষ পরিণতি যে এমন করে হবে তা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। আদিযুগ থেকে এক ধারায় জীবন বয়ে আসছিল। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে চাকরি পেয়েছে, আর মেয়েরা বিয়ে করে

ঘরের বউ হয়েছে, ছেলে-মেয়ে বিইয়েছে। তারপর যার সাধ্যে কুলিয়েছে সে কলকাতায় কিংবা কলকাতার আশেপাশে একটুকরো জমি কিনে তার ওপর কোঠা বানিয়েছে। বিয়ে-শ্রাদ্ধে অন্নপ্রাশনে লোক খাইয়ে সামাজিকতা করেছে। এই-ই ছিল বাংলাদেশের বাঙালীদের দু'শো বছরের রুটিন-বাঁধা ইতিকথা। এই ইতিকথাই বাঙালী-জীবনের আসল ইতিহাস।

সেই ইতিহাসের গতিপথ যে এতদিন পরে এমন করে মোড় ঘুরবে তা কেউ আগে ভাবেনি।

দেবসুন্দরবাবু একদিন ভোরবেলা উঠে পার্কে প্রাতঃভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। স্বাস্থ্য রাখতে ওটা অত্যাবশ্যক। বাড়ির সামনে এসে দেয়ালের লেখাটা দেখে চমকে উঠলেন। ভালো করে বানান করে পড়ে অবাক। কিছু মানে করতে পারলেন না কথাটার।

আরো দু'চারজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তারাও সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে লেখাটা পড়তে লাগলো।

একজন মন্তব্য করলে—ইস্, দেয়ালটা একদম নষ্ট করে দিয়েছে হে—নতুন রং করা হয়েছিল বাড়িটায়।

একজন বললে—সব পাড়াতেই মশাই অমন লিখেছে দেখলুম—

দেবসুন্দরবাবু নির্বোধের মত বললেন—বাড়িটা সবে করেছি। এর মধ্যেই এইরকম দাগী করে দিলে! আলকাতরা দিয়ে লেখা, এ তো আর উঠবে না—

প্রথম ভদ্রলোক বললে—পাড়ার ছেলেরাই বোধহয় করছে এ-সব—

দ্বিতীয়জন বললে—পাড়া-টাড়া নয় মশাই, সব পাড়ার সব ছেলেই এ-সব আরম্ভ করেছে। সেদিন একটা পাড়ায় দেখলুম লিখে দিয়েছে—'আমাদের দেশ পরাধীন, এই দেশকে স্বাধীন করতে হবে আপনাকে আমাকে সকলকে'—

—তার মানে?

এর মানে কেউ জানে না। মানে খুঁজে বেড়ায় সবাই। টালা থেকে টালিগঞ্জ যাদবপুর গড়িয়া পর্যন্ত সব পাড়ার সব বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে একই কথা লেখা।

হেরম্ববাবুও এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন লেখাটা। এককালে তিনি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তাঁর হাত দিয়ে হাজার-হাজার ছেলে মানুষ হয়ে বেরিয়ে গেছে। এখনও তাদের কারোর কারোর সঙ্গে দেখা হলে তারা মাস্টারমশাইয়ের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

হেরম্ববাবু জিজ্ঞেস করেন—কী বাবা কেমন আছ?

তাদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারেন, কাউকে আবার চিনতে পারেন না।

বলেন—কই বাবা, তোমাকে তো চিনতে পারছিনে ঠিক—,

কিন্তু আজকাল আর কেউ তাঁকে গ্রাহ্যই করে না। রেশনের দোকানে তিনি

যখন গিয়ে লাইনে দাঁড়ান, তাঁর প্রাক্তন ছাত্ররাও লাইনের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ ফিরেও তাকায় না একবার তাঁর দিকে।

দেবসুন্দরবাবু তখনও ঠিক সামলে নিতে পারেননি নিজেকে।

হেরম্ববাবু জিজ্ঞেস করলেন—আহা, আপনার নতুন বাড়িতেও লিখে দিয়ে গেছে মশাই ?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—কখন লিখলো বলুন তো মশাই ?

—রাত্তিরের দিকে মই নিয়ে যে ওরা ঘুরে বেড়ায়। আমি দেখেছি যে। আমি তো ব্লাড-প্রেসারের রুগী, রাত্তিরে আমার যে ঘুমই হয় না।

দেবসুন্দরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—আপনার বাড়ির দেয়ালেও লিখেছে নাকি.?

হেরম্ববাবু বললেন—লিখেছে বইকি। হেডমাস্টার বলে আমাকে কি আর ছেড়ে দিয়েছে ভাবছেন ?

—তা আপনি যখন নিজের চোখে দেখেছেন তখন বাধা দেননি কেন ?

—ওরে বাবাঃ !—হেরম্ববাবু যেন আঁতকে উঠলেন।

বললেন—ওদের তো আপনি চেনেন না। একবার ভেবেছিলুম পুলিশে খবর দিই, কিন্তু জলে বাস করে কি কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায় ? আমি তো পাগল নই। আর আমার চেয়ে বড় বড় লোকের সব বাড়িতে এইরকম লিখে দিয়েছে। সেদিন দেখলুম ভবানীপুরে ডাক্তার হীরালাল বোসের নতুন তিনতলা বাড়ির আগাপাছতলায় বড় বড় অক্ষরে অ আ ক খ লিখে দিয়েছে—

দেবসুন্দরবাবু কী আর বলবেন। সবাই যদি নির্বিবাদে সব কিছু সহ্য করে যায় তো কোনও অন্যায়েরই কোনও প্রতিকার হবে না কখনও।

যে-ঘটনা নস্কর-বাগানে ঘটতে লাগলো সেই ঘটনা তারপরে ছড়িয়ে গেল সারা কলকাতাতেই। শুধু কলকাতা নয়, সারা বাংলাদেশেই। অনেকদিন মানুষ মুখ বুঁজে সব সহ্য করে গেছে। তেইশ-চব্বিশ বছর ধরে শুধু আশার বাণী আর আশ্বাস। আশ্বাসে মন ভরেছে কিন্তু পেট ভরেনি।

যখন নস্কর-বাগান ক্লাবের ছেলেদের টাকার অভাব হয়েছে তখনই গণেশ আর সমরের দল ছুটে এসেছে।

—প্রভাদি, পাঁচটা টাকা দাও—

প্রভা পাঁচটা টাকা দিয়ে বলেছে—খুব সাবধানে থাকবি ভাই তোরা। সবাই তোদের বিরুদ্ধে, সবাই রেগে গেছে তোদের ওপর।

সমর বলেছে—রাগুক গে, আমরা কাকে পরোয়া করি ? নিজের বাপ-মা'ই রেগে গেছে আমাদের ওপর, তা পর যারা তারা তো রাগবেই। গণেশদা তো ইনজিনীয়ারিং পাশ করে তিন বছর বসে আছে। আমিও তো বি.এস-সি ফার্স্ট-ক্লাশ পেয়ে বেকার। এম্.এস্-সিতে ভরতি হতেই পারলুম না। বাপের

হোটেলে ভাত খাচ্ছি, আর সংগে সংগে লাথি ঝাঁটা খাচ্ছি, আমাদের সকলের অবস্থাই যে তাই প্রভাদি, অথচ···

গণেশ বাকিটা বললে। বললে—অথচ পার্টিগুলো দেখ, তারা কী করে মিনিস্ট্রি পাবে তাই নিয়ে রিসার্চ চালাচ্ছে, আমাদের বেকারদের চাকরি দেবার কোনও আন্দোলন করছে না। শুধু যারা চাকরি পেয়েছে তাদের মাইনে কিসে বাড়ানো যায়, সেই নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে—

টাকাটা নিয়ে তারা চলে যাচ্ছিল। যাবার আগে গণেশ আবার দাঁড়ালো।

বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা, বাড়িওয়ালা তোমার ওপর আর কোনও জুলুম করছে না তো প্রভাদি ?

সমর বললে—আর করবে না। আর জুলুম করবার সাহস হবে না বুড়ো-ব্যাটার—

প্রভা জিজ্ঞেস করলে—কেন, কীসে বুঝলি তুই ?

—ওরা যে থানায় গিয়েছিল ডায়েরি করতে, পুলিশ কিছু স্টেপ্ নেয়নি। পুলিশ বলেছে—আমাদের অত সময় নেই। আর পুলিশও জানে, যদি কিছু স্টেপ্ নেয় তো আমাদের হাতেও বোমা আছে পাইপগান আছে—

—কিন্তু তোরা খুব সাবধানে থাকিস ভাই !'

গণেশ বুক ফুলিয়ে বলেছে—সাবধানে থেকে আর লাভ হবে না প্রভাদি, যেমন ভাবে আছি এর চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো। আমি চাকরি পাচ্ছি না বলে, পৃথিবীসুদ্ধ লোক লাথি-ঝাঁটা মারছে, এ আর কদ্দিন সহ্য করবো। তবে যাবার আগে সকলকে জানিয়ে দিয়ে তবে যাবো, এইটে তোমাকে বলে রাখলুম—

এই ঘটনার পরেই লালবাজার থেকে একদল পুলিশ এল নস্কর-বাগানে আর দুম্-দাম্ গুলি ছোড়ার আওয়াজ সুরু হলো। বাড়ির ভেতরে বসে দেবসুন্দর-বাবু শুনলেন। হেরম্ববাবু শুনলেন। করুণাকান্তবাবুও শুনলেন। সবাই-ই শুনলো। সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল মাঝ রাত্রে। মনে হলো কাছাকাছি কোথাও যেন একটা লড়াই হচ্ছে।

ব্লাড-প্রেসারের রুগী হেরম্ববাবু। এক-একটা শব্দ হচ্ছে আর হিসেব রাখছেন। এক-এক করে গুণছেন—এক-দুই-তিন·····

দেবসুন্দরবাবুর স্ত্রী দেবসুন্দরবাবুর পাশেই শুয়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন—এ কী রকম পাড়ায় বাড়ি করলে গো তুমি !' আগে আমাদের ভাড়াটে বাড়িই তো ভালো ছিল এর চাইতে !

ওদিকে করুণাকান্তবাবুও আওয়াজ শুনতে শুনতে বেশ খুশী হয়ে উঠলেন। গৃহিণীর দিকে চেয়ে বললেন—শুনছো তো ? ওই শোন, তেইশ রাউন্ড হলো।

গৃহিণী বললেন—শেষকালে কোনও গণ্ডগোল হবে না তো গা ?

—গণ্ডগোল ? গণ্ডগোল কিসের ?'

—পাড়ার ছেলেরা যদি শেষকালে ক্ষেপে যায়? ক্ষেপে গিয়ে যদি আমাদের বাড়িতে বোমা ফেলে?

করুণাকান্তবাবু বললেন—তুমি ক্ষেপেছ? পুলিশ সবাইকে অ্যারেস্ট করবে না? গভর্নমেন্ট নেই দেশে? গভর্নমেন্টকে ট্যাক্সো দিচ্ছি নে? তারপরে কেল্লা রয়েছে, সেখানে কেল্লা-ভর্তি সোলজার রয়েছে কী করতে? বখাটে ছোঁড়ারা যা ইচ্ছে তাই করবে ভেবেছ?

গৃহিণী বললেন—তা তোমারই তো দোষ! তুমিই তো ওই ছুঁড়িটাকে এনে বাড়িতে ঢোকালে। ও আসবার আগে তো কোনও কিছু হ্যাঙ্গাম ছিল না—

কিন্তু একতলার ঘরের মধ্যে প্রভাও শব্দগুলো শুনছিল। তারও ভয় করছিল। গণেশদের ওপরেই হামলা হচ্ছে নাকি? ওদেরই ধরে নিয়ে যাবে নাকি শেষকালে? আরো মনে পড়লো বাবার কথা। বাবার চিঠি এসেছে রায়পুর থেকে। বাবা আসছে কলকাতায় তার কাছে! ঠিক এই সময়েই কিনা বাবার আসতে হয় এখানে!

তখনও দুম-দাম আওয়াজ চলেছে একটানা।

প্রভার আবার মনে হলো—ভাঙুক। সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাক।

আর ঠিক সেই সময়ে জানালায় আস্তে আস্তে একটা টোকা পড়লো। প্রভা উঠে নিঃশব্দে দরজা খুলে দিলে। খুলতেই গণেশ, সমর, ভোলা, ফটিক সবাই এসে ভেতরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো।

গণেশ বললে—দরজা বন্ধ করে দাও প্রভাদি, আমাদের বোমা ফুরিয়ে গিয়েছে—ওরা তাড়া করেছে আমাদের!

প্রভা তাড়াতাড়ি দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়েছে নিঃশব্দে।

ঠিক এর পরই কলকাতায় মেয়ের বাড়িতে এসে হাজির হলেন ভৈরববাবু। কলকাতাময় তখন পুরো সন্ত্রাসের রাজত্ব। এই বাংলাদেশই একদিন চৈতন্যদেব, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম দিয়েছে, জন্ম দিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের। সেই বাংলাদেশেরই হাল দেখে ভৈরববাবু চমকে গেলেন।

বললেন—এ কী হাল হলো মা বাংলাদেশের? এ-রকম তো ছিল না আগে?

প্রভা জিজ্ঞেস করলে—কীরকম ছিল না?

—এই এখানকার ছেলে-মেয়েদের কথা বলছি। ছোট-ছোট ছেলেমানুষ সব, বাপের বয়সী লোকেদের সামনে সিগারেট-বিড়ি খায়। এটা তো ভালো লক্ষণ নয় মা, এতে যে সব গোল্লায় যাবে।

প্রভা বললে—তুমি আজকালকার ব্যাপার কিছু জানো না, তুমি চুপ করে থাকো—

ভৈরববাবু বুঝতে পারেন না তবু। বললেন—আমি বুঝতে পারি না? আর

তোরাই সব বুঝিস? আমি কি লেখাপড়া শিখিনি? আমি সেকালের লোক বলে কি সূর্যও পশ্চিমদিকে উঠবে? সূর্যও তো সেকেলে, তা'বলে কি সে আলো দিচ্ছে না? রোদ উঠছে না?

প্রভা বললে—সূর্য আর মানুষ তো এক নয় বাবা। সূর্য বদলায় না, কিন্তু মানুষের সমাজ বদলায়, যুগের সংগে সংগে মানুষকেও 'অ্যাডজাস্ট' করে নিতে হয়, নইলে সে টেঁকে না।

ভৈরববাবু বললেন—কিন্তু তা'বলে ভদ্রতা সভ্যতা সামাজিকতা সততা সব-কিছু পালটে যাবে মা? পাপ-পুণ্য-অধর্ম-ধর্ম বলে কিছু থাকবে না?

প্রভা বললে—তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বোল না বাবা! তুমি যেসব কথা বলছো ওসব আজকে আর চলে না। তুমি বরাবর রায়পুরে থেকে এসেছ তাই ওসব কথা বলছো। কলকাতায় থাকলে তোমার মত বদলে যেত। এখানে পাপ-পুণ্য-ধর্ম-অধর্ম বলে কিছু নেই। আছে কেবল বেঁচে থাকার লড়াই—

ভৈরববাবু মেয়ের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর কাছে মানুষ হয়ে এ মেয়ে এমন কথা বলতে শিখলো কার কাছে? কে তাঁর মেয়েকে এ-সব কথা শেখালে? এই কলকাতায় এমন কী ঘটলো যে তাঁর মেয়ে এই ক'বছরে এমন করে বদলে গেল?

বললেন—তোর সংগে তর্ক করে পারবো না বাপু, জন্তু-জানোয়াররাও তো বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই করে, তাহলে তাদের সংগে মানুষের তফাতটা আর রইলো কোথায়?

বাড়ির ভেতরে প্রভার কাছে যা শুনলেন, বাড়ির বাইরে গিয়েও ভৈরববাবু তাই দেখতে পেলেন। ট্রামে উঠে কেউ ভাড়া দেবে না। টিকিট চাইলেই গোল-মাল পাকাবে। ভদ্রলোকের ছেলেরা মুখ-খিস্তি করবে অশিক্ষিত লোকদের মতন। ফরসা চকচকে জুতো দেখলে মাড়িয়ে দেবে। কেউ ভালো গাড়িতে চড়লে রাস্তা ছেড়ে দেবে না। অথচ তার জন্যে যদি কেউ চাপা পড়ে তো ড্রাইভারকে মেরে গাড়ি পুড়িয়ে দেবে।

কিন্তু সবচেয়ে যেটা খারাপ লাগলো সেটা ঘটলো পার্কের মধ্যে। ছেলেটা তাঁকে বাড়িতে এসে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল, তাই। নইলে কী হতো!

রাত্রে সেই কথাগুলোই শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন। তাঁর ওপর এত দয়া হলো ছেলেটার! দয়া-মায়া যে একেবারে নেই তা তো নয়! বুড়োমানুষ দেখেই তো দয়া দেখিয়েছে ছেলেটা!

হঠাৎ মনে হলো প্রভা যেন কার সংগে কথা বলছে। যেন অচেনা লোকের গলা।

তিনি ডাকলেন—প্রভা, ও প্রভা—

সমর তখন গলা নামিয়ে নিয়েছে। বললে—ওই তোমার বাবা জেগে উঠেছে

প্রভাদি—আমি যাই—

প্রভাও গলা নামিয়ে নিলে।

বললে—কিন্তু গণেশ এরকম ভুল করলে কেন বল্ তো? পটাশিয়াম ক্লোরেট কি বেশি দিয়ে ফেলেছিল?

সমর বললে—না প্রভাদি, তোমাকে পরে সব বলবো, আমি যাই, এতক্ষণে পুলিশ বোধহয় গণেশদার ডেড্‌বডি নিয়ে চলে গেছে—তুমি দরজা বন্ধ করে দাও।

তারপর যাবার সময় বলে গেল—কিন্তু এও বলে রাখছি, এর বদ্‌লা আমরা নেবই, তখন কিন্তু তুমি আমাদের কিছু বলতে পারবে না—

—কিন্তু যা করিস, খুব সাবধানে করিস ভাই, তোদের জন্যে আমার খুব ভয় করে রে—

কিন্তু ততক্ষণে সমর সেই মাঝ-রাত্রের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ভৈরববাবু তখনও ডাকছেন—ও প্রভা, প্রভা, কার সঙ্গে কথা বলছিস্ রে? ও কে? কে এসেছে?

প্রভা এতক্ষণে গলা চড়িয়ে বললে—এই তো আমি! কী বলছো তুমি?

ভৈরববাবু বললেন—তোর ঘরে যেন কার গলা শুনতে পেলুম মনে হলো—

প্রভা বললে—তুমি স্বপ্ন দেখছো নাকি? আমার ঘরে আবার কে আসবে? তুমি ঘুমোও। তুমি নিজেও ঘুমোবে না, আমাকেও ঘুমোতে দেবে না—

ভৈরববাবু আর কিছু বললেন না। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মন থেকে দুশ্চিন্তা গেল না। বার বার ভাবতে লাগলেন এসব কী হচ্ছে! তাঁর ছোটবেলায় তো এমন ছিল না! সে যুগেও এমন হয়েছে। উল্লাসকর ক্ষুদিরামরা বোমাবাজি করেছে। কিন্তু সে তো অন্যরকম। এরা কার বিরুদ্ধে লড়ছে? কে এদের শত্রু!

পরের দিন ভোরবেলা খবরের কাগজ পড়েই সব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অত যে শব্দ হয়েছে কাল রাত্তিরে, তার বিশদ বিবরণ বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। গণ্ডগোলটা যে একেবারে তাঁদের নস্কর-বাগানের মধ্যেই হয়েছে এটা তখন তিনি বুঝতেই পারেননি। নস্কর-বাগান পার্কের মধ্যে নাকি কয়েকজন তরুণ পুলিশের ভ্যান লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। তারপর পুলিশ তাদের তাড়া করে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে। সেখানে একটা ক্লাবঘরের মধ্যে অনেক পটাশিয়াম ক্লোরেট, আর্সেনিক ডি-সালফাইড আর পিক্‌রিক অ্যাসিড পায়। একটা বোমা ফেটে গিয়ে তরুণদের একজন (নাম গণেশ সরকার) সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। পুলিশ সমস্ত অঞ্চলটা পাহারা দিচ্ছে।

ভোরবেলাই প্রভা রান্না চড়ায়। রান্না চড়িয়ে রেখে চা খেয়ে তীর্থময়ী বালিকা

বিদ্যালয়ে পড়াতে যায়।

ভৈরববাবু তাড়াতাড়ি প্রভার কাছে খবরের কাগজটা নিয়ে গিয়ে বললেন—ওমা, এই দ্যাখ্ মা, আমাদের পাড়ায় কী সমস্ত কাণ্ড হয়েছে কাল রাত্তিরে! আমি কাল রাত্তিরেই তোকে বললুম, তুই বললি, ও কিছু না—দেখেছিস, গণেশ সরকার বলে একটা ছেলে বোমা ফেটে মারা গেছে—

প্রভা সে কথায় কানও দিলে না, যেমন রান্না করছিল তেমনিই রান্না করতে লাগলো। শুধু বললে—ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না বাবা, তুমি চা খেয়ে নাও—

✿ ✿ ✿

সেদিন দিন-দুপুরেই ঘটনাটা ঘটলো। সে এক বীভৎস কাণ্ড। ভৈরববাবু তখন সবে খেয়ে উঠেছেন। ভরদুপুর, হঠাৎ বাইরের গলিতে একটা হৈ-চৈ উঠলো। চারদিক থেকে চিৎকার উঠলো—ধরো ধরো, পাকড়ো—

ভৈরববাবুর আর বিশ্রাম করা হলো না। তাড়াতাড়ি জানালার সামনে এসে রাস্তার দিকে চাইলেন। মেয়েকে ডাকলেন—ওমা প্রভা, রাস্তায় কী হলো দ্যাখ্ এসে—

তারপর যা দেখলেন তাতে তাঁর দম বন্ধ হবার জোগাড়।

—ও মা দেখবি আয় রে, দেখবি আয়, আহা হা—

প্রভা তাড়াতাড়ি এসে জানালাটা বন্ধ করে দিলে। বললে—তোমাকে তো বলেছি ওসব তোমাকে দেখতে হবে না, তুমি খেয়ে উঠেছ, একটু গড়িয়ে নাও না—

ভৈরববাবু বললেন—কিন্তু ওরা যে লোকটাকে ছুরি মারলে রে—আমি দেখলুম একজন ছেলে রক্ত-মাখা ছোরা হাতে ওই গলির দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল—

—কিন্তু তোমার ওসব ব্যাপারে থাকবার দরকার কী? তুমি বুড়ো মানুষ, শেষকালে পুলিশ এসে যদি আবার আমাদের হ্যারাস করে, তখন?

—তা বলে একজন লোককে বিনা-কারণে খুন করে গেল, আর আমি চুপ করে থাকবো? আমার দেখলেও দোষ?

—না, কারণে মারলে কি বিনা-কারণে মারলে তা তুমি জানলে কি করে? তোমাকে ওসব দেখতে হবে না। তুমি খাও-দাও আরাম করো!

ভৈরববাবু কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। কিন্তু মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। আহা, লোকটাকে জলজ্যান্ত মেরে ফেললে ওরা। তিনি বিছানায় গিয়ে হেলান দিয়ে শোবার চেষ্টা করলেন একবার। কিন্তু পারলেন না। আবার

উঠলেন। আবার শুলেন। আবার উঠে বসলেন।

তারপর আস্তে আস্তে মেয়ের ঘরের দিকে গেলেন।

—হ্যাঁ রে প্রভা, তুই যে কিছু বলছিস নে!

প্রভা মুখ তুলে বললে—কী বলবো?

—লোকটাকে যে পাড়ার মধ্যে খুন করে গেল। এখনও জায়গাটা একেবারে রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেখলুম। একটা জলজ্যান্ত লোককে মারলে কোনও মানুষ চুপ করে থাকতে পারে? তুই কিছু বলবি নে?

প্রভা বললে—আমি কী বলবো?

—একটা কিছু কথা বল! এই ধর একদিন যদি আমাকেই ওরা মারে। আমিও তো রাস্তায় হাঁটি। কথা নেই বার্তা নেই, আমাকেই যদি ওরা খুন করে ফেলে, তখনও তুই কিছু বলবি নে?

প্রভা বললে—তোমার কোনও ভাবনা নেই, তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। তোমাকে নিয়ে কারোর অত মাথাব্যথা নেই। ওরা তো আর পাগল নয়—

—কিন্তু তুই? তুইও তো ইস্কুলে যাতায়াত করিস। তোকেও তো রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে হয়। তোরই যদি কিছু হয়, তখন? তখন কি হবে?

প্রভা বললে—যখন হবে তখন হবে!

ভৈরববাবু বললেন—তাই বললে কি হয়, শহরে তো থানা-পুলিশ আছে। আমিই না হয় থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি। আহা হা, আমরা থাকতে লোকটা ওইখানে ওইরকম ভাবে পড়ে থাকবে? একটা ডাক্তারকেও না-হয় ডেকে আনতুম—

প্রভা যেন পাথর। ভৈরববাবু অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরই মেয়ে হয়ে প্রভা এরকম পাথর হতে পারলো কী করে? এ মেয়ে তো এমন ছিল না। তিনি যেন কলকাতায় এসে পর্যন্ত তাঁর নিজের মেয়েকেই চিনতে পারছেন না। রায়পুরে যখন ছিল তখন তো প্রভা অন্যরকম ছিল। বাবা যা বলেছে তাই-ই শুনেছে। এই ক'বছরেই একেবারে বদলে গেল কেন? কী হলো এখানে?

ভৈরববাবুর সমস্ত শরীরটার ভেতরে রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগলো। কিন্তু রাস্তায় তখন সত্যিই বীভৎস দৃশ্য দেখতে পেলে অনেকেই।

দেবসুন্দরবাবুও তখন তামাক খেতে খেতে জানালার ধারে বসে খবরের কাগজটায় চোখ বুলোচ্ছিলেন। একবার পড়া খবরগুলো আর একবার পড়ছিলেন। হঠাৎ রাস্তার ওপর চিৎকার শুনেই চোখ ফিরিয়ে যা দেখলেন তাতে মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। দেখলেন একজন মাঝবয়সী লোককে কয়েক-জন ছুরি মারতেই ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগলো।

কোথা থেকে চিৎকার উঠলো—ধরো-ধরো—পাকড়ো-পাকড়ো—

রাস্তায় আরো কিছু লোক যাচ্ছিল আগে-পেছনে। চিৎকারটা শুনে ধরবার বদলে যে-যেদিকে পারলে দৌড়তে লাগলো। খানিকক্ষণের মধ্যেই রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। যে-ছেলেটা ছোরা মেরেছিল তার লম্বা জুলফি, হলদে সার্ট, আর টাইট ট্রাউজার পরনে। দলে আরো কয়েকজন ছিল। তারাও আর দাঁড়ালো না, যে যেদিকে পারলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকটা তখন চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। মাঝে-মাঝে সামান্য একটু নড়া-চড়া করছে। তারপর এক-সময়ে একেবারে স্থির হয়ে গেল। আর রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে নর্দমার দিকে চলতে লাগলো।

গৃহিণী তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরের ঘরের দিকে আসছিলেন। এসেই ওই কাণ্ড দেখে হাউমাউ করে উঠলেন।

বললেন—ওমা, ও কী গো? কে মারলে গা লোকটাকে?

এতক্ষণে যেন দেবসুন্দরবাবুর হুঁশ হলো।

বললেন—আরে, তুমি আবার কেন এখানে এলে?

বলেই দড়াম্ করে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলেন। বললেন—ও-সব ব্যাপারে আমাদের থাকতে নেই—

তারপর যেন হঠাৎ খেয়াল হলো। বললেন—রঘুবীর কোথায়, রঘুবীর?

—বাসন মাজতে বসেছে—

—আর কমলা?

—কমলা রান্নাঘর ধুচ্ছে, এইবার আমার জন্যে পান আনতে যাবে দোকান থেকে।

দেবসুন্দরবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন—না না, আজ আর পান খেও না তুমি, পান আনতে হবে না। একদিন পান না-খেলে কী হয়?

তারপর এক নিমেষে সামনের জানালার পাল্লা দুটোও সশব্দে বন্ধ করে দিলেন টপাটপ্।

বললেন—চলো চলো, ভেতরে চলো। তুমি আবার এ-সময়ে বাইরের ঘরে আসতে গেলে কেন বলো দিকিনি? মহা জ্বালাতন হয়েছে দেখছি—

গৃহিণী বললেন—কে খুন করলে তুমি দেখেছ নাকি?

দেবসুন্দরবাবু ঠেলতে ঠেলতে গৃহিণীকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বললেন—কে আবার খুন করবে? ওই যারা তোমার বাড়ির দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে হরিনাম লিখে রেখে গেছে, তারাই।

—তা, কেন খুন করলে? কী করেছিল লোকটা?

—তোমার ও-সব কথা জেনে দরকার কী শুনি? তুমি খেয়ে উঠে শুতে গেলে না কেন? যেমন রোজ যাও?

গৃহিণী বললেন—আমার যে পান আসেনি। পান মুখে না দিলে কি ঘুম

আসে ?

দেবসুন্দরবাবু বললেন—পান খেয়ে দরকার নেই আজ। একদিন না-হয় না-ই খেলে পান ? আর এমন নেশার কথাও তো কখনও শুনিনি যে নেশা না করলে ঘুম আসবে না—

—তা তুমি তামাক খাও না ? খেয়ে উঠে তোমার তামাক না হলে চলে ?

এ-কথার উত্তর না দিয়ে দেবসুন্দরবাবু ডাকলেন—রঘুবীর—রঘুবীর—

রঘুবীর বাসন মাজতে মাজতে উঠে এল।

বললে—বাবু—

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আজ তুই বাইরে যেতে পারবি না। আর কমলা ? কমলা কোথায় ?

কমলা ঝাটা হাতে নিয়ে সামনে এল। সামনে এসে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাড়াল।

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আজ আর বাইরে যেতে পারবে না বাছা তুমি। রাস্তায় গণ্ডগোল হচ্ছে, পান আনতেও যেতে হবে না। আজকে তোমার মা পান খাবে না—বুঝলে ?

বলে, ওপরে দোতলায় উঠে একটা তালা নিয়ে এলেন। তারপর সদর-দরজায় ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে বললেন—এই তালা লাগিয়ে দিলুম, খুলে দেব সেই সন্ধ্যাবেলা। তার আগে সব বাড়িতে চুপচাপ শুয়ে থাকো—

বলে, আবার ওপরে উঠে গেলেন। গিয়ে ওপরের সব জানালা আর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু হেরম্ববাবু ব্লাড-প্রেসারের রুগী। ভবেশ নবেশ তখন অফিসে-কলেজে চলে গেছে। তিনি আর গৃহিণী দু'জনে একসঙ্গে আহারে বসেছেন। হঠাৎ রাস্তায় 'ধরো-ধরো পাকড়ো'র শব্দ শুনে আর থাকতে পারলেন না। এঁটো হাতে জানালার ধারে আসতেই দেখলেন একদল ছেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। আর একজন ভদ্রলোক রাস্তায় চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। তার সারা বুকের কাছটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে—

—ওগো, সর্বনাশ হয়েছে—

গৃহিণী খেতে খেতেই বললেন—কী হলো ?

—আমার বুক কেমন করছে, মাথা গেল।

গৃহিণী বললেন—তুমি ব্লাড-প্রেসারের রুগী, ওই-সব ঝামেলার মধ্যে যাও কেন বলো তো ? কী, হলো কী ?

—ওগো, সেই ছোঁড়ার দল, যারা করুণাবাবুর বাড়িতে হামলা করেছিল, তারা একটা লোককে খুন করে পালিয়ে গেল—সেই জুলফিওয়ালা ছেলেটা ·

—তা তুমি ও-সব দেখতে গেলে কেন? কে দেখতে বললে তোমাকে? আমি তোমাকে পই-পই করে বারণ করিচি না যে, ঝামেলার মধ্যে যেও না, এখন কী হবে? তুমি তো সেবারে করুণাবাবুর হয়ে থানাতে সাক্ষী দিতে যাচ্ছিলে—

হেরম্ববাবু তখনও থর-থর করে কাঁপছেন। বললেন—আমি আর খাবো না—

বলে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখনও তাঁর চোখের সামনে ভাসছে লোকটার রক্তমাখা শরীরটা। আর সেই ছেলেটার চেহারাটাও ভেসে উঠলো চোখের ওপর। সেই লম্বা জুলফি, হলদে সার্ট, আর টাইট্ প্যান্ট—

বিছানায় গিয়ে তিনি ধপাস করে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। হাঁপাতে হাঁপাতেই চেঁচিয়ে বললেন—ওগো, আমার ওষুধের বড়িটা দিয়ে যাও শিগ্‌গির—

পাড়ার সব বাড়িতে যারা যারা বাইরে অফিসে, কাজে-কর্মে ব্যস্ত ছিল, তারা সন্ধ্যের মুখে ফিরে এল। কিন্তু নস্কর-বাগান লেনের মুখেই পুলিশের ভিড় দেখে চমকে গেল।

—কী হয়েছে মশাই এখানে?

যারা সাবধানী লোক তারা কোনও দিকে না চেয়ে সোজা মাথা নিচু করে বাড়ি ঢুকলো। বাড়ির সামনে সমস্ত গলিটাই ফাঁকা। সব বাড়ি অন্ধকার, জানালা দরজা পর্যন্ত বন্ধ। এ-পাড়ায় যে মানুষ বাস করে তা যেন দেখে বোঝা যায় না। থমথমে ভাব চারদিকে। নিশ্চয় এ-পাড়াতে আজ কিছু হয়েছে।

—ও মশাই ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? দেখছেন না একদল পুলিশ ঘাঁটি করে রয়েছে!

—আরে মশাই, আমার বাড়ি যে নস্কর-বাগান লেনে। পুলিশ কি বাড়িতেও যেতে দেবে না নাকি আমাদের? কী হয়েছে ওখানে?

—পুলিশ খুন হয়েছে।

—পুলিশ?

—হ্যাঁ মশাই, পুলিশ। নস্কর-বাগান থানার ও-সি। থানার ও-সি প্লেন ড্রেসে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, পেছন থেকে কে এসে তাকে ছোরা মেরেছে।

—তারপর কী হলো?

—তারপর আর কী হবে। যা হবার তাই হয়েছে। ও-সি'কে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ, তার আগেই ও-সি ডেড্—

শুনে সকলেরই চক্ষুস্থির! এই ক'দিন আগে বেলগাছিয়ায় মারা গেছে একজন পুলিশ। তার আগে আর একজন মারা গেছে সিঁথিতে। জিপ্ চড়ে

যাচ্ছিল, পাশের বাড়ির ছাদ থেকে কে একজন বোমা ফেলেছিল সেই জিপ্ লক্ষ্য করে। দু'-একজন রাস্তায় চলতে চলতে গল্প শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে। যেন আরো কিছু শুনতে চায়। আরো কিছু শুনে রোমাঞ্চ পেতে চায়। সেই একঘেয়ে জীবন চলে আসছিল এতদিন। সেই বাঁধা-ধরা হরতাল, নয়তো সেই অফিসের ইউনিয়নের ডাকে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করা। আর 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলে চেঁচানো। আর ঠিক তারিখে ঠিক সময়ে মাইনে নেওয়া। আর তারপর মাসের দশ তারিখের মধ্যেই মাইনের সমস্ত টাকা ফুরিয়ে যাওয়া।

এ-সব তো আমাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল মশাই। আমরা তো জানতুম অফিস মানেই ইউনিয়ন। আর ইউনিয়ন মানেই মিছিল। আর মিছিল মানেই ইনক্লাব জিন্দাবাদ। আর কামাই? যতদিন ইচ্ছে কামাই করো না, কারোর বাপের সাধ্যি নেই তোমার মাইনে কাটে। এতেও আমাদের ভালো লাগছিল না। হঠাৎ এবার যেন লড়াইটা আরো জমলো।

বাসে করে যাচ্ছিল একটা ছেলে। ভিড় দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়েছে।

—ও দাদা, টিকিট?

টিকিট! বলে কী! টিকিট কখনও জীবনে কেটেছি যে টিকিট চাইছো?—ছেলেটা নেমেই কন্ডাকটারের দিকে জিভ দেখালো। অর্থাৎ ভেঙচি কাটলো। বাসটা তখন ঊর্ধ্বগতিতে ছুটে চলেছে। টিকিটের পয়সা নেবারও উপায় নেই, আর ইচ্ছে থাকলে পয়সা দেবারও উপায় নেই।

একজন প্যাসেঞ্জার বললে—আরে, আজকালকার ছেলেরা কী রকম ঠগ্‌বাজ দেখলেন মশাই?

পাশ থেকে কে একজন ফোঁড়ন কাটলো—পয়সা দেয়নি বেশ করেছে। কেন দেবে মশাই পয়সা?

—কেন দেবে না? বিনা পয়সায় বাসে চড়বে তা'বলে? এতে কার লস্? গভর্নমেন্টের। আর গভর্নমেন্টের লস্ মানেই তো আমাদের লস্, এটা বোঝে না কেউ?

আর এক ভদ্রলোক ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠলো—এ-কি গভর্নমেন্ট মশাই? এর নাম গভর্নমেন্ট? এ-তো চোর, এ-তো ডাকাত।

—ডাকাত মানে?

—ডাকাত নয় তো কী? দিল্লীতে গিয়ে দেখে আসুন সাড়ে চার লক্ষ টাকা করে এক-একজন মিনিস্টার বছরে মাইনে পাচ্ছে, তা জানেন? দিনকে-দিন কেবল মিনিস্টারই বেড়ে চলেছে। বাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট, চাকর, দারোয়ান, ফার্নিচার, সব মিলিয়ে হিসেব করুন না কত হয়।

বাসের মধ্যে তখন ফাটাফাটি ভিড়। গরমে ঘামে, তর্কে ভিড় তখন বেশ

সরগরম। নিতান্ত সুস্থ লোকও সে-গরমে অসুস্থ হয়ে ওঠে।

একজন অবাক হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলে—সাড়ে চার লক্ষ?

—হ্যাঁ মশাই, চার লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা। এ আমার গাল-গল্প নয় মশাই। মিস্টার ডান্ডেকার, এম-পি, এই হিসেব দিয়েছেন। বাজে লোক নন ডান্ডেকার, একজন রিটায়ার্ড আই-সি-এস, এককালে নিজে ইনকাম ট্যাক্স-কমিশনার ছিলেন—

তখন বাসের মধ্যেই তত্ত্বকথা সুরু হয়ে যায়। কিন্তু বাস ড্রাইভার সেই মানুষের পাহাড় নিয়েই হু-হু করে নিজের গন্তব্য স্থানের দিকে এগিয়ে চলে।

কিন্তু যে-ছেলেটা চলতি বাস থেকে নস্কর-বাগানের মোড়ে নেমে পড়েছে তার তখন মহা উৎসাহ। এ-পাড়ায় সে থাকে না, এ-পাড়ায় আসবার তার দরকারও হয় না। কিন্তু কেন এত ভিড় হয়েছে এখানে, সে-কারণটা জানতে না পারলে যেন রাত্রে তার ঘুম হবে না। কিছু উত্তেজনা, কিছু রোমাঞ্চ, কিছু হৈ-চৈ না হলে কি ভালো লাগে কারোর?

—হ্যাঁ মশাই, এখানে এত পুলিশ কেন? কী হয়েছে?

ভিড় ঠেলে একেবারে ভিড়ের কেন্দ্রে গিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলে ছেলেটা।

কে একজন দয়া করে উত্তর দিলে—একটা পুলিশ-অফিসার খুন হয়েছে—

—বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। বড় জ্বালাচ্ছিল ব্যাটারা। সবাই মিলে বলছি শহর থেকে পুলিশ তুলে নিক, সি-আর-পি তুলে নিক। এত মাইনে দিয়ে পুলিশ পুষে লাভ কী?

কয়েকজন ছেলেটার দিকে চেয়ে দেখলে। এ-সব ছেলেদের সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। কিন্তু তাতে ছেলেটার কোনও বিকার নেই। সে নিজের মনেই বলে চললো—সব পুড়ে-ঝুড়ে যাক, সব মরে যাক, আবার নতুন করে সব গড়ে উঠবে।

একজন বলে উঠলো—সবাই মরলে কি আপনিই বাঁচবেন?

ছেলেটা বললে—আমার বেঁচে লাভ কী মশাই? আমাকেও কেউ মেরে ফেলুক না। আমি তো মরতেই চাই—

—তা মরেন না কেন?

ছেলেটা বললে—আমি কেন আগে মরবো? আগে আপনাদের সকলকে মেরে তবে মরবো। সব পুলিশ ব্যাটাকে আগে মারবো, সব বড়লোককে আগে মার্ডার করবো, সব বাড়িওয়ালাকেও আগে খুন করবো, তবে মরবো। আমাদের মারা যাবার পর তখন যদি নতুন করে আবার অন্য সোসাইটি গড়ে ওঠে—

কিন্তু কথা আর বেশিদূর গড়ালো না। ভ্যানে করে একদল পুলিশ এসে হাজির হলো হুড়মুড় করে। আর ভ্যান থেকে একজন পুলিশ লাঠি নিয়ে তাড়া করে এল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছত্রভঙ্গ।

কাছাকাছি কোথা থেকে একটা বোমা এসে পড়লো। দুম করে একটা বিকট শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মারমুখী হয়ে উঠেছে। আর তখন যে যেদিকে পারলে ছুটে পালালো। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম-বাস, রিক্‌শা, টেমপো, প্রাইভেট কার সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তা অন্ধকারে ডুবে গেল এক মুহূর্তে।

ভৈরববাবুই এতে সবচেয়ে বেশি মুশকিলে পড়লেন। অথচ যাদের সত্যিই মুশকিলে পড়বার কথা তারা যেন জিনিসটা তেমন গায়ে মাখছে না। তারা দিব্যি অফিস যাচ্ছে, সিনেমা দেখছে, যাত্রা শুনছে। কলকাতা শহরে বিয়েও হচ্ছে। বিয়েবাড়িতে ম্যারাপও বাঁধা হচ্ছে। লুচি-মাংস-পোলাউ-দই-মিষ্টি সবই খাচ্ছে। চারদিকে এত হৈ-চৈ, এত হরতাল, এত বোমা, এত হল্লা, কিন্তু তারই পাশাপাশি সিনেমা-থিয়েটার-যাত্রা-গান-বাজনা-রেডিও সবই চলছে। ভৈরববাবু রাস্তায় চলতে চলতে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন। কই, কেউ তো কিছু ভাবছে না। কেউ তো কিছু বলছে না। পাড়ায় যে এতবড় একটা খুন-খারাবি হয়ে গেল, কই, তার জন্যে তো মানুষের জীবন-যাত্রায় কোনও রকম ব্যতিক্রম হয়নি। অথচ এমন ঘটনা রায়পুরে ঘটলে শহরে এতদিনে তোলপাড় সুরু হয়ে যেত!

মিস্টার মহাজন কতবার বলেছেন—চক্রবর্তী, আপনাদের বাংলাদেশই আমাদের সমস্ত ইন্ডিয়াকে পথ দেখিয়েছে। আপনাদের স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, আপনাদের শ্রীঅরবিন্দ আর নেতাজী, এঁরা সমস্ত ইন্ডিয়ার গর্ব—

মিস্টার মহাজন মানুষটি ভালো। নইলে অমন করে মন খুলে কেউ বাঙালীদের প্রশংসা করে! বরাবর ভৈরববাবুর গর্ব ছিল তিনি বাঙালী বলে। যখন সুভাষ বোসের মৃত্যু-সংবাদ বেরোল, তার এক বছর পরে বহু লোক তাঁর বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করেছে—চক্রবর্তীবাবু, এ্যাসা শুনা হ্যায় নেতাজী সুভাষ বোস শায়েদ্ জিন্দা হ্যায়?

ভৈরববাবু নিজে একজন বাঙালী বলে কত অবাঙালী তাঁকে ঈর্ষা করেছে। কিন্তু আজ? আজ যদি মিস্টার মহাজনের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে তিনি কী বলবেন?

ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথাটা গরম হয়ে যায়। একবার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হন দেবসুন্দরবাবুর বাড়িতে।

—কেমন আছেন দেবসুন্দরবাবু?

দেবসুন্দরবাবু প্রথম দিন যেমন ভাবে খাতির-আপ্যায়ন করেছিলেন, তেমন করে পরে আর খাতির-আপ্যায়ন করেন না। তিনি যেন কেমন হয়ে গেছেন। ভালো করে কথাও বলেন না প্রথম দিনের মত।

ভৈরববাবু আবার জিজ্ঞেস করেন—শরীর কেমন আছে আপনার?

—আর শরীর!

বলে ডান হাতের পাতাটা উল্টে দেন। ওইটুকুতেই যা বোঝবার বুঝে নিতে হবে। যেন ভৈরববাবু চলে গেলেই তিনি খুশী হন। সমবয়সী প্রতিবেশীর সঙ্গে যেটুকু আলাপ-আলোচনা করতে ভালো লাগে তাও করেন না।

ভৈরববাবু আবার জিজ্ঞেস করেন—দিনকাল কেমন দেখছেন?

—আর দিনকাল! আমাদের আবার দিনকাল!

ভৈরববাবুর মনে হয় দেবসুন্দরবাবু যেন আসল উত্তরটা এড়িয়ে যেতে চান।

এর পর আর থাকেন না তিনি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

বলেন—উঠি—

উঠি তো উঠি। আর একটু বসতেও অনুরোধ করেন না দেবসুন্দরবাবু। ভৈরববাবু নমস্কার করে উঠে বাইরে চলে আসেন। দেবসুন্দরবাবুর ওখানেও যা, হেরম্ববাবুর বাড়িতেও তাই। হেরম্ববাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকেন।

—হেরম্ববাবু আছেন নাকি?

ছেলে এসে বলে—বাবার শরীরটা খারাপ—

—খারাপ? কী হলো? ব্লাড-প্রেসার বাড়লো নাকি?

—হ্যাঁ।

ছোট সংক্ষিপ্ত উত্তর। ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ। নিষ্প্রাণ।

—তাহলে বলে দিও ভৈরববাবু এসেছিলেন—

বলে আবার চলে আসেন রাস্তায়। কী-ই বা করবেন তিনি। কোথায়ই বা যাবেন। যতদিন চাকরি ছিল ততদিন নিজের একটা কাজ ছিল। এখানে কাজ নেই বটে, কিন্তু কথা বলবার লোকও যে নেই! বাড়ির উঠোন পরিষ্কার, রান্না-বান্না করেও যে অনেকখানি সময় হাতে থাকে। সে সময়টা কী করে কাটে!

প্রভা সকালবেলাই ইস্কুলে চলে যায়। আসে সেই সাড়ে দশটা, এগারোটা, বারোটা। এক-একদিন আরো দেরি হয়ে যায়। সেই সময়টা কী করে কাটে?

মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে বলেন—ওরে প্রভা, জানিস, এ-পাড়ার কোন লোকই আজকাল তেমন ভাল করে কথা বলে না রে আমার সঙ্গে—

প্রভা বলে—তা কেউ কথা না-ই বা বললে, তোমার তাতে কী এসে যায়?

ভৈরববাবু বলেন—তা এসে যায় না? এক পাড়ায় বাস করি, কথা না বলে থাকতে পারি? আর তা ছাড়া পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, পরস্পরের বিপদে-আপদে যদি না-ই দেখলুম তো কিসের প্রতিবেশী? রায়পুরে দেখিসনি তুই, কত লোক আমার বাড়িতে আসতো, আর আমি কত লোকের বাড়িতে যেতুম! তুই তো দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই পরের বাড়িতে থাকতিস—

প্রভা বলে—সে সব কথা ছেড়ে দাও বাবা, সে রায়পুরে, আর এ কলকাতা—

ভৈরববাবু বলেন—তা কলকাতা বলে কি আলাদা হতে হবে নাকি? কলকাতায় তো আরো বেশি মেলামেশা হবে, এখানে সবাই তো বাঙালী।

প্রভা বলে—সে সব যুগ চলে গেছে বাবা—

—যুগ চলে গেছে মানে? যুগ চলে গেছে বলে মানুষও বদলে যাবে? তাই কখনও হয়? স্বামী বিবেকানন্দ চলে গেছেন বলে তাঁর কথাগুলোও কি মিথ্যে হয়ে গেছে—

প্রভা বলে—হ্যাঁ, তা গেছে—

—সে কী রে? তুই বলছিস কী? তুই তো আগে এ-রকম ছিলি না? কলকাতায় এসে তোরও বুঝি এই দশা হলো?

প্রভা বলে—না বাবা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি বলতে চাই ওই বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, নেতাজী, গান্ধী ভাঙিয়ে আর এখন চলবে না। এখন এ-কলকাতার অবস্থাও অন্য রকম, এর চিকিৎসাও তাই অন্য রকম করে করতে হবে—

ভৈরববাবু মেয়ের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান। মেয়ের এ কী-রকম মতি-গতি হয়েছে!

বলেন—তুই তো এ-রকম ছিলি না মা আগে। আমি এতদিন কি তোকে এই শিক্ষা দিয়ে এসেছি?

প্রভা এবার হাসে। বলে—তুমি তোমার পক্ষে যা ভালো বুঝেছ সেই শিক্ষাই আমাকে দিয়েছ, কিন্তু আমার পক্ষে যা ভালো বুঝেছি আমি সেই শিক্ষাই নিয়েছি।

—তা আমার শিক্ষা আর তোর শিক্ষা কি আলাদা? ইস্কুলের মেয়েদের তুই এই শিক্ষাই দিস নাকি?

—তা তো দিই!

—তা হলে মহাপুরুষরা এতদিন যা বলে এসেছেন সে সব মিথ্যে? তুই তো মিস্টার মহাজন, আমাদের চেয়ারম্যানকে চিনতিস। তাঁর মুখে শুনিসনি উনিশ শো চল্লিশ সালের দশ'ই মে রাত তিনটের সময়

—ও গল্প তোমার কাছে অনেকবার শুনেছি বাবা, ও গল্প থাক, তুমি বরং খবরের কাগজ মুখে নিয়ে পড়ো, আমি চলি, আমার কাজ আছে—

বলে প্রভা সেখান থেকে চলে গেল। ভৈরববাবুও আর সেখানে দাঁড়ালেন না। তাঁর মনে হলো তিনি যেন সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। কারোর মতের সঙ্গে তাঁর আর মিলছে না। তিনি নিঃসঙ্গ, তিনি একক।

সেই সন্ধ্যেবেলাই তিনি সেদিন আবার একলা-একলা রাস্তায় বেরোলেন। নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন জীবন। কোথাও কিছু ভালো লাগে না। কেউ তাঁর সঙ্গ পছন্দ করে না। রাস্তাটা বড় নির্জন মনে হলো। কালকেই এখানে এই জায়গা-টাতেই একজন পুলিশের কর্তাব্যক্তি খুন হয়েছে। রক্তের দাগ তখনও স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। গলির মোড়ের কাছে আসতেই চমকে উঠলেন। একগাদা পুলিশ লাঠি

নয়ে মোড়টা পাহারা দিচ্ছে। তিনি সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি বুড়ো মানুষ আমাকে কে আর কী বলবে!

কিন্তু ও-ফুটপাথে অনেক বাজে লোকের ভিড়। তারা সেখানে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। বাস থেকে ভাড়া না দিয়ে একজন ছোকরা তড়াক করে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লো।

বাস থেকেই বাইরে ঝুঁকে পড়ে কন্ডাকটার চেঁচিয়ে উঠলো—ও দাদা, টিকিট—

ছেলেটা তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চলন্ত বাসটার দিকে জিভ দেখালো।

—হ্যাঁ মশাই? এত পুলিশ কেন? কী হয়েছে?

কে একজন বলল—খুন হয়েছে—একজন পুলিশ-অফিসার খুন হয়েছে—

—বাঁচা গেছে, বড় জ্বালাচ্ছিল ব্যাটারা—

ভৈরববাবু ছেলেটার দিকে চেয়ে দেখলেন। এ-সব ছোকরাদের সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। কিন্তু ছেলেটার যেন বিকার নেই। সে নিজের মনেই বলে চললো—সব পুড়ে-ঝুড়ে যাক, সব মরে যাক, আবার নতুন করে সব গড়ে উঠবে—

একজন বললে—সবাই মরলে আপনিই কি বাঁচবেন?

ছেলেটা বললে—আমার বেঁচে লাভ কী মশাই? আমাকেও কেউ মেরে ফেলুক না। আমি তো মরতেই চাই—

—তা মরেন না কেন?

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—আমি কেন আগে মরবো? আগে আপনাদের সকলকে মেরে তবে মরবো। সব পুলিশ ব্যাটাকে আগে মার্ডার করবো, সব বড়লোককে আগে মারবো, সঙ্গে সঙ্গে সব বাড়িওয়ালাকেও আগে খুন করবো, তবে মরবো, আমাদের মারা যাবার পরে তবে যদি নতুন করে আবার অন্য সোসাইটি গড়ে ওঠে—

ভৈরববাবু ছেলেটার মুখ থেকে কথাগুলো শুনে অবাক। এই আজকালকার ছেলেদের মতিগতি নাকি? তিনি সকলকে পাশ কাটিয়ে পার্কের ভেতরে ঢুকছিলেন। কিন্তু ওদিক থেকে হঠাৎ একটা বোমা এসে পুলিশদের ওপরে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা ভ্যানে করে একদল পুলিশ এসে হাজির হলো। ভ্যান থেকে নেমেই পুলিশগুলো মারমুখী হয়ে উঠেছে। আর তখন যে যেদিকে পারলে ছুটে পালালো। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম-বাস রিক্শা টেম্পো প্রাইভেট-কার সব কিছু বানচাল হয়ে গেল।

ভৈরববাবু কী করবেন বুঝতে পারলেন না।

—দাদু!

পেছন ফিরে দেখলেন সেই লম্বা জুলফিওয়ালা ছেলেটা। গায়ে হলদে সার্ট।

পরনে টাইট্ প্যান্ট।

বললে—আপনি দাদু, এই সময়ে বেরিয়েছেন কেন? চলে আসুন, চলে আসুন—

বলে তাঁর হাত ধরে পার্কের বাইরে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে। বললে—আপনি আর এখানে দাঁড়াবেন না, বাড়ি চলে যান—

বলে ভৈরববাবুকে রেখে সোজা দৌড়তে লাগলো।

ভৈরববাবু চিনতে পারলেন ছেলেটাকে। এই ছেলেটাই তো! এই ছেলেটাই তো সেদিন পুলিশের লোকটাকে তাঁর বাড়ির সামনে খুন করেছিল! ঠিক এই রকমই চেহারাটা যেন।

ভৈরববাবু ডাকলেন—খোকা, খোকা, শোন ভাই শোন, ও খোকা—

কিন্তু ছেলেটা তখন আঁকাবাঁকা গলির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে—

২১ ২১ ২১

পরের দিনই পুলিশের একটা বড় ভ্যান, আর লাল সাদা রঙের জিপ এসে পাড়ায় থামলো। জিপ থেকে নেমে এলেন একজন পুলিশ-অফিসার। মিস্টার ব্যানার্জি। অধীর ব্যানার্জি। নস্কর-বাগান থানার নতুন ও-সি। ডিউটির ভার নিয়েই তাঁকে খুনের ইনভেস্টিগেশন করতে নিজেকে আসতে হয়েছে। লালবাজার হেড-কোয়ার্টার্সের অর্ডার।

পেছনে কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবলও ভ্যান থেকে নামলো। বড় সিরিয়াস চার্জ পাড়ার লোক্যাল বয়েজদের বিরুদ্ধে। দিল্লি থেকেও সরাসরি ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে কথা হচ্ছে হোম-ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারির সঙ্গে। গুন্ডাবাজি যেমন করে হোক বন্ধ করতেই হবে। দরকার হলে গুলি চালাও। আর্মি ডাকো, সি-আর-পি ডাকো।

মিস্টার অধীর ব্যানার্জি মধ্যবিত্ত-ঘরের ছেলে। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। পরের গলগ্রহ হয়ে দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তারপর ছোট-বেলায় প্রাইভেট টিউশানি করে চালিয়েছে। তারপর একদিন জন্মভূমি পাকিস্থান হয়ে গেল হঠাৎ। কলকাতায় এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে কাজ করে মানুষ হয়েছে। বিধবা মা সে-বাড়ির রাঁধুনি-বৃত্তি করেছে আর ছেলে হন্যে হয়ে পরের দরজায় ঘুরে ঘুরে চাকরির চেষ্টা করেছে।

শেষকালে এই পুলিশের চাকরিটা কোনও রকমে জোগাড় করতে পেরেছিল অধীর ব্যানার্জি।

মা'র চাকরিটা ভালো লাগেনি।

মা বলেছিল—হ্যাঁ রে, শেষকালে পুলিশের চাকরি পেলি? আর কোন অন্য

চাকরি জোগাড় করতে পারলি না—

অধীর বললে—চাকরির যা বাজার, এই-ই নিতে হলো মা—

মা ভেবেছেন বুঝি ছেলে তার ইংরেজ আমলের পুলিশের চাকরি পেয়েছে। ংরেজ-আমলে পুলিশকে লোকে যত ঘেন্না করতো, আবার তেমনি খাতিরও করতো। কিন্তু স্বদেশী আমলে খাতির চলে গেছে, আছে শুধু ঘেন্না। এখন রামেও পুলিশকে মারে, আবার রাবণেও। আজ যে খুনের আসামী, কালই হয় সে আবার হোম-মিনিস্টার। সুতরাং বুঝে-শুনে পুলিশকে কাজ করতে হয়। ডিউটি না করলেও আজকাল প্রমোশন হয়। শুধু হিসেব রাখতে হবে কোন পার্টি মিনিস্ট্রি পাবে। সেই হিসেব রেখে সেই পার্টিকে তোয়াজ করে যাও। যখন তারা গদিতে বসবে তখন তোমার প্রমোশন কে আটকায়?

যা'হোক, এবার নস্কর-বাগান থানায় বদলি হলো অধীর, তখন তার একটু ভাবনা হলো। আগের ও-সি খুন হয়ে গেছে। তারই ভেকেন্সিতে গিয়ে ডিউটি করতে হবে। আগেকার মত তেজ আর নেই অধীরের। তেজ ছিল খানিকটা আগেকার আমলে। তখন জানতো একটা পার্টিই মনিব। সেই একটা পার্টিকে তোয়াজ করে গেলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। বড় কর্তা থেকে শুরু করে চুনো-পুঁটি পর্যন্ত সকলকে তখন তোয়াজ করে গেছে সে। তার ফলে প্রমোশন হয়েছে, মাইনে বেড়েছে। তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু কথা বলতে সাহস পায়নি।

কিন্তু এইবার হয়েছে মুশকিল। এখন হাজারটা পার্টি, হাজারটা কর্তা, হাজারটা মনিব। একটা ছোট্ট পুঁচকে পার্টির মেম্বারও চোখ রাঙায়। বলে—আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার ইলেকশানে আমাদের পার্টি মিনিস্ট্রি পেলে আপনাকে দেখে নেব।

অনেকে আবার শাসায়। বলে—জানেন আমি কোন্ পার্টির মেম্বার?

এর চেয়ে ইংরেজ-আমল ঢের ভালো ছিল। যারা পুরনো স্টাফ তারা তাই বলে।

তারা বলে—সে-যুগে জাস্টিস ছিল হে। ন্যায়-বিচার ছিল। এখন স্বদেশী হয়ে আমাদের কচু হয়েছে, কাঁচকলা হয়েছে—

কিন্তু সে যা-ই হোক, পাকে-প্রকারে ভয়ে-ভক্তিতে খোসামোদে-তোয়াজে যেমন করেই পারে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। মিনিস্টার বছরে-বছরে কিংবা মাসে-মাসে হপ্তায় হপ্তায় বদলাক। তা বলে পুলিশ অত ঘন ঘন তো বদলাতে পারে না। তারা বহাল-তবিয়তে থাকে। তফাতের মধ্যে শুধু এই যে, মিনিস্টারের পেয়ারের লোক হলে ভালো-ভালো থানায় বদলি হবে। নইলে পাঠিয়ে দেবে বেলেঘাটার, নয় তো মানিকতলায়, নয় তো কসবা কিংবা বরানগরে।

এবার অধীর ব্যানার্জির ট্রানসফার অর্ডার হয়েছে নস্কর-বাগানে। প্রথম দিনে ডিউটিতে এসেই লালবাজারের হুকুমে পাড়ায় আসতে হয়েছে। পাড়ার

লোকদের সরেজমিনে তদন্ত করে বলতে হবে কে আসল খুনী!

প্রথমেই বারো-নম্বর বাড়ি। যে-বাড়ির সামনে খুনটা হয়েছিল।

কড়া নাড়তেই দরজাটা খুলে গেল। বাড়ির একজন ঝি দরজা খুলে পুলিশ দেখেই মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে।

—বাড়িতে কে আছেন? বলো নস্কর-বাগান থানার ও সি এসেছে।

পুলিশ এসেছে! শুনেই যেন একটা ভয় সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে শিউরে উঠলো।

করুণাকান্তবাবু পুলিশের নাম শুনেই যেন থর-থর করে কাঁপতে লাগলেন। কেন পুলিশ এল? তিনি কী করেছেন? কথাটা করুণাকান্তবাবুর স্ত্রীও শুনেছিলেন ঝি-এর মুখ থেকে। শুনেই কর্তার কাছে এলেন। বললেন—হ্যাঁ গো, পুলিশ এল কেন?

করুণাকান্তবাবু বললেন—আমিও তো তাই ভাবছি—

গৃহিণী বললেন—তুমি যেন বাপু আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলো না পুলিশের কাছে।

করুণাকান্তবাবু বললেন—তা হলে আমাদের ঝি-কেই পাঠাও না, জিজ্ঞেস করে আসুক কী দরকার!

—ওমা, তুমি বলছো কী? পুরুষমানুষ বাড়িতে থাকতে ঝি যাবে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে?

—তাহলে কী বলবো বলো তো?

—তুমি কী বলবে তা মেয়েমানুষ হয়ে আমি কী করে বলবো?

—যদি জিজ্ঞেস করে কে খুন করেছে, আমি দেখেছি কি না?

গৃহিণী বললেন—তুমি বলবে তুমি দেখনি, এ তো সোজা কথা—আর দেরি কোর না, তুমি যাও, অনেকক্ষণ ধরে পুলিশ বসে আছে, কী ভাববে বলো দিকিনি?

করুণাকান্তবাবু আর দেরি করলেন না। নিচেয় নেমে এসে বললেন—কী দরকার আমাকে?

অধীর ব্যানার্জি বললে—আমরা থানা থেকে এসেছি এনকোয়ারী করতে। এ-পাড়ায় এখানকার থানার ও-সি খুন হয়ে গেছে, আপনি শুনেছেন তো?

করুণাকান্তবাবু কী উত্তর দেবেন প্রথমে বুঝতে পারলেন না। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, লোকের মুখে আমি শুনেছি—

—আপনি নিজে দেখেননি?

করুণাকান্তবাবু বললেন—না—

—কেন? আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

—আমার কি একটা কাজ? তখন কোথায় ছিলুম আমার কি মনে আছে। আমার তো স্টেশনারি দোকান আছে বড়বাজারে। সেখানেও মাঝে-মাঝে যাই,

তারপর তাগাদাতেও যাই ব্যাপারিদের কাছে—

—আপনার ছেলে আছে ?

—হ্যাঁ—আছে বৈকি। তারা কেউ এ-বাড়িতে থাকে না। তাদের দু'জনের দুটো বাড়ি করে দিয়েছি। তারা সাবালক হয়েছে। তারাই বেশির ভাগ সময়ে দোকান দেখে। আমি বুড়ো হয়েছি, সব সময়ে আমি দোকানে যেতে পারি না।

দারোগাবাবু কথাগুলো সব লিখে নিতে লাগলেন।

—আপনার এ-বাড়িতে পুরুষমানুষ আর কেউ আছে ?

—আজ্ঞে না, আমি, আমার স্ত্রী, আর একজন ঝি বাড়ির কাজকর্ম করে।

—আপনার বাড়িতে শুনেছি একজন ভাড়াটে থাকে।

—হ্যাঁ, এই সামনে গলি দিয়ে ভেতরে চলে যান। গিয়ে দরজার কড়া নাড়ুন। একজন মেয়ে থাকে, সে ইস্কুলের মাস্টারনী।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তিনি কি ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলেন ?

—তা বলতে পারবো না মশাই। আমি ছা-পোষা মানুষ, হাজারটা ঝামেলা আমার। সব দিকে কি নজর দেবার সময় আছে আমার ?

দারোগাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গের কনস্টেবলরা পেছন-পেছন চলতে লাগলো।

পাশের গলি দিয়ে ঢুকে সোজা এগোলেই একটা দরজা। দরজার সামনে তালা ঝুলছিল একটা। বোঝা গেল বাড়িতে কেউ নেই।

এবার অন্য বাড়িতে যেতে হবে। যে-জায়গাটায় খুনটা হয়েছিল তার আশে-পাশের বাড়িগুলোর এভিডেন্স নিলেই চলবে।

করুণাকান্তবাবু দোতলায় গিয়ে জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখলেন পুলিশ ভাড়াটেদের বাড়ির গলির মধ্যে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল। তাহলে বোধহয় মেয়েটা বাড়ি নেই। কিন্তু তার বুড়ো বাপ ? বাপটা আবার কোথায় গেল ? সেও কি বেরিয়েছে নাকি ?

তারপর দেখলেন পুলিশের দল হেরম্ববাবুর বাড়ির সদর-দরজার কড়া নাড়ছে।

তাড়াতাড়ি করুণাকান্তবাবু স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

—ওগো, শুনছো, এইবার বুড়ো মুশকিলে পড়বে।

—কে ? কোন্ বুড়ো ? কার কথা বলছো ?

—ওই ব্লাড-প্রেসারের রুগী, হেরম্ববাবুর বাড়িতে গেছে পুলিশ। এবার বুঝুক ঠ্যালা। আমাকে বড় বলছিল আমি অমন ভাড়াটে রেখেছি কেন ? সবাই দেখেছে, কিন্তু কেউ বলতে সাহস করবে না। আমাকে বলে কিনা আপনি থানায় গিয়ে ডায়েরি করে আসুন। এখন বুঝুন ঠ্যালা কাকে বলে। পরকে অমন উপদেশ সবাই দিতে পারে—

গৃহিণী তখন কাজ করতে ব্যস্ত। বেশি কথার উত্তর দেবার তখন সময় নেই তাঁর। তিনি রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন—আমার রান্না পুড়ে গেল, যাই—

কিন্তু গৃহিণীর আগ্রহ থাক আর না-থাক, করুণাকান্তবাবু কিন্তু স্থির থাকতে পারলেন না। আবার জানালার ধারে ছুটে গেলেন। গিয়ে খড়খড়িটার ফাঁকে চোখ রেখে হেরম্ববাবুর বাড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। পুলিশের দলকে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। তারা হেরম্ববাবুর বৈঠকখানার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। করুণাকান্তবাবু পাশের জানালার ফাঁক দিয়েও দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তবু কিছুতেই ভেতরে নজর গেল না।

ঌঌঌ

নস্কর-বাগান ছেলেদের ক্লাবে তখন পুলিশের তালা-চাবি পড়ে গিয়েছিল। তার আগেই সমর ক্লাবের খাতাপত্র সব নষ্ট করে ফেলে দিয়েছে। শুধু ফেলে দিয়েছে নয়, তারা কোথায় আত্মগোপন করে আছে কেউ জানে না। কিন্তু বোমা ফাটার বিরাম নেই কলকাতায়। লোকে রাত্রে ঘুমিয়ে থাকবার সময় হঠাৎ হয়ত একটা বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করবার চেষ্টা করে শব্দটাকে। শব্দই যেন সত্যি, আর সব মিথ্যে। কলকাতার জীবন আপন নিয়মে চলতে গিয়ে হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্যে থেমে যায়। অন্ধকার ঘিরে ফেলে সমস্ত অঞ্চলটাকে। আশেপাশের সবাই প্রাণ-ভয়ে ছুটে পালায়। খানিকটা ধোঁয়া ওঠে। তারপর পুলিশ যখন এসে পেঁছায় তখন সব স্বাভাবিক। আবার ট্রাম চলতে শুরু করেছে। বাসও চলেছে মানুষের পাহাড় কাঁধে নিয়ে।

সেদিন ইনভেস্টিগেশনটা শেষ হলো না। বারো-নম্বর বাড়ির পর পুলিশ হেরম্ববাবুর বাড়িতে গেল। কিন্তু সেখানেও ওই একই উত্তর।

হেরম্ববাবু বললেন—ব্লাড-প্রেসারের রুগী মশাই আমি, আমি কি অতসব ঝামেলার মধ্যে যাই? লোকে আমার গালে একটা চড় মেরে গেলেও আমার কিছু বলবার ক্ষমতা নেই। ডাক্তার আমাকে পই-পই করে বারণ করে গিয়েছে আমি যেন কোনও রকম উত্তেজনার মধ্যে না যাই—

—তা বলে আপনার বাড়ির সামনে একজন মানুষ খুন হলো আর আপনি কিছুই জানতে পারলেন না?

হেরম্ববাবু বললেন—ওই যে বললুম, আমার মাথার কাছে বোমা ফাটলেও আমার কিছু করবার নেই। আমি কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারবো না যে, কে বোমাটা ফাটালে। এ বড় নচ্ছার রোগ মশাই। এ-রোগ যার হয়েছে সে-ই কেবল বুঝতে পারবে আমার কষ্টটা—

—আপনার ছেলেরা ? ছেলে আছে তো আপনার ?

হেরম্ববাবু বললেন—তাদের কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। তারা কারো সাতে-পাঁচে নেই। তাদের একজন অফিসে যায় আর বাড়ি আসে, আর একজন কলেজে পড়ে। তা কলেজে তো আজকাল পড়াশোনা ঘুচে গেছে। দেখে আসুন এখন হয়ত ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে সে পড়াশুনোয় ডুবে আছে—

—আর মেয়ে ? মেয়ে নেই আপনার ?

হেরম্ববাবুর মুখ এবার প্রসন্ন হয়ে উঠলো। বললেন—ও-ব্যাপারে আমার ভাগ্য ভালো বলতে পারেন মশাই। দুটো মেয়ে, দুটো মেয়েরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে, আমি বেঁচেছি। সেদিক থেকে ভগবানের আশীর্বাদে আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

অধীর ব্যানার্জি সব কথা নোটবইতে টুকে নিচ্ছিল। কিন্তু আর কী কথা জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারলে না। নোট খাতাটা বন্ধ করে পকেটে রেখে উঠলো।

বললে—আপনাকে একটু ট্রাবল দিলুম বলে কিছু মনে করবেন না। এটা তো আমাদের ডিউটি।

হেরম্ববাবু বললেন—হাজার বার ডিউটি। ডিউটি বলে ডিউটি। আপনারা ডিউটি করছেন বলে তবু আমরা শান্তিতে একটু ঘুমোতে পারছি মশাই—আপনারাই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন এ-যাত্রায়। নইলে আমি ব্লাড-প্রেসারের রুগী কবে খতম হয়ে যেতুম—

অধীর ব্যানার্জি এবার অন্য পথ ধরলো।

বললে—কিন্তু ছেলেরা আমাদের ডিউটি করতে দিচ্ছে কই, বলুন ? আমাদের ডিপার্টমেন্টের কত লোক ডিউটি করতে গিয়ে খুন হয়েছে, তা জানেন ?

—তা আর জানি না ? খবরের কাগজেই তো রোজ পড়ছি।

—খবরের কাগজে পড়তে হবে কেন ? আপনার বাড়ির সামনেই তো সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। অথচ দেখুন, তিনিও তো ডিউটি করছিলেন। তাঁরও তো ফ্যামিলি আছে, ছেলেমেয়ে আছে। তাঁর প্রাণেরও তো দাম আছে। তিনি তো কোনও অপরাধই করেননি। প্লেন ড্রেসে ডিউটি দিচ্ছিলেন, যাতে আপনাদের মত শান্তিপ্রিয় লোকরা নির্বিঘ্নে দিন কাটাতে পারেন—

হেরম্ববাবু বললেন—হাজার বার, হাজার বার—

—তাহলে একটা অন্তত উপকার করুন আমাদের।

—বলুন, আপনাদের আমি কী উপকার করতে পারি ? আমি সামান্য লোক···

—সামান্য লোক হলেও আপনি তো এ-পাড়ার পুরনো বাসিন্দা, এ-পাড়ার কোন্ কোন্ ছেলে বদমাইস, সেটাও যদি আমাদের বলে দেন তো আমাদের মহা

উপকার করা হয়। শুধু আমাদের উপকার কেন, দেশেরও উপকার করা হয়। আমাদের নিজেদের চেয়ে তো দেশ বড়। সেই দেশের উপকারের জন্যেও তো আমাদের সাহায্য করা উচিত আপনাদের। আপনার মত বিবেচক লোকদেরই তো এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত। হয় আমাকে বলুন, আর যদি প্রাণের ভয় থাকে তো লালবাজারে ডাইরেক্ট টেলিফোন করে তাদের সকলের নাম জানিয়ে দিন। জানিয়ে দিন, কাদের আপনি সন্দেহ করেন। দেখবেন আপনারা পাড়ার বিবেচক লোকরা যদি একটু কষ্ট করেন তো আজই আমরা কলকাতার শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারি—

বলে অধীর ব্যানার্জি একটু থামলো। থেমে হেরম্ববাবুর মুখের দিকে চেয়ে উত্তরের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

হেরম্ববাবু বললেন—আমি তো খবর দিতে পারতুম স্যার। তাতে তো আমাদেরই ভালো হতো। কিন্তু আমি যে ব্লাড-প্রেসারের রুগী, পাড়ার কোনও ব্যাপারে খবর রাখাও যে আমার নিষেধ—

—কিন্তু আপনার ছেলেদের তো আর ব্লাড-প্রেসার নেই, তাদের কাছেও তো খবর নিয়ে আমাদের জানাতে পারেন—

—তাহলেই হয়েছে। তারা আবার আমার চেয়েও আনাড়ী স্যার। এ-যুগের পক্ষে একেবারে অচল। আমি তো ছেলেদের তাই বলি—তোরা কোনও কম্মের নয়, একেবারে অকম্মা।

এর পর আর দাঁড়ালো না অধীর ব্যানার্জি—নস্কর-বাগান থানার ও-সি। আস্তে আস্তে সদল-বলে বেরিয়ে এল।

রাত্রে ছেলেরা বাড়ি এলে হেরম্ববাবু সব ঘটনা তাদের বললেন।

তারপর বললেন—ঠিক বলিনি ?

হেরম্ববাবুর স্ত্রী বললেন—তুমি আর বাহাদুরি কোর না, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলুম তাই বেঁচে গেলে, নইলে কী হতো ভগমান জানে—

ভবেশ বললে—তা তুমি ওদের বারো-নম্বরের ভাড়াটেদের বাড়িতে যেতে বললে না কেন ?

হেরম্ববাবুর স্ত্রী বললেন—না না, ওসব বলতে যাওয়াই খারাপ। শেষকালে কী বলতে গিয়ে কী হয়ে যাবে, পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা, ওর মধ্যে যেতে আছে ?

হেরম্ববাবুর স্ত্রীর যা মত, এই নস্কর-বাগান লেনের সমস্ত বাসিন্দারই ওই একমত। দেখা গেল, যেন কেউই খুন করার ঘটনাটা দেখেনি। কেউ শোনেওনি। দিন-দুপুরে খোলা আকাশের তলায়, সকলের বাড়ির এক-পা পেরোলেই যে-ঘটনা ঘটে গেল তা আশ্চর্যজনকভাবে সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

অধীর ব্যানার্জি অবাক হয়ে সেদিন সদল-বলে থানায় ফিরে গেল। কিন্তু

ফিরতে গিয়েই একটা কনস্টেবল বললে—হুঁজুর, ওই যে সেই দিদিমণি আসছে—

অধীর ব্যানার্জি বললে—কোন্ দিদিমণি ?

—হুঁজুর, সেই বারো-নম্বর বাড়ির ভাড়াটে।

এবার অধীর ব্যানার্জি ভালো করে তীক্ষ্ন নজর দিয়ে দেখলে। মাথায় ছাতা, পরনে একটা ছাপা শাড়ি। মোটামুটি গোলগাল চেহারা। কিন্তু জৌলুস আছে চেহারায়। দেখলেই বোঝা যায় মনের তেজ অফুরন্ত। সামনে আসতেই অধীর ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলে—আপনার নামই কি মিস্ প্রভা চক্রবর্তী ?

প্রভা দাঁড়িয়ে গেল। বললে—হ্যাঁ—

—আমি এই নস্কর বাগান থানার ও-সি। এ-পাড়ায় আপনার বাড়ির সামনে একটা খুন হয়ে গিয়েছিল, তা জানেন ?

—হ্যাঁ, আমি শুনলুম।

—আপনি নিজের চোখে দেখেননি ?

—না, আমি তখন সংসারের কাজকর্ম করছিলুম।

—কিন্তু যখন পাড়ার সব লোক হৈ-চৈ করে উঠলো, আপনি তাদের চিৎকারের শব্দও শুনতে পাননি ?

প্রভা বললে—চিৎকারের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। কিন্তু ও-রকম চিৎকার তো আজকাল পাড়াতে সব সময়েই হচ্ছে, তাই ও-নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি।

—তাহলে এ সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না ?

—না।

—কে মারা গেছে তা শুনেছেন তো ?

—হ্যাঁ, ইস্কুলে সবাই বলছিল।

অধীর ব্যানার্জি এবার বললে—কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি বলতে পারেন কাকে আপনার সন্দেহ হয় ?

প্রভা বললে—কাকে আমার সন্দেহ হবে বলুন ? আমি তো পাড়ার কাউকেই চিনি না। আমি এখানে কয়েক বছর আছি বটে, কিন্তু কারোর সঙ্গেই আমার মেলামেশার সুযোগ হয়নি। আমি ইস্কুলে যাই আর আসি। তারপরে যেটুকু সময় পাই তখন রান্না-বান্না সেলাই-ফোঁড়াই আর ছাত্রীদের খাতা দেখতেই দিন কেটে যায়—

—তাহলে আপনি কোনও সাহায্যই আমাদের করতে পারলেন না ?

—না।

—আচ্ছা নমস্কার।

১১১

কোথায় যেন আকাশের কোন্ কোণে একটুকরো কালো মেঘ ছিল, কেউ দেখতে পায়নি আগে। বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত হয়েই সবাই ঘরকন্না করছিল। সকালবেলা সবাই অফিস-কাছারি গেছে। দুপুরে অফিসের কাজের নামে ক্যানটিনে গিয়ে পলিটিকস আলোচনা করেছে। কাজের কাজ যদি কিছু করে থাকে তো সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন। ইউনিয়নের জন্যে দল ভাঙাভাঙি, মিছিল, শ্লোগান। আর মাসে দুটো তিনটে করে শহীদ-মিনারে মিটিং। লীডার-দের গরম-গরম লেকচার শুনে সবাই গা-গরম করেছে। এ-ছাড়া যাদের অফিস-কাছারি-স্কুল কিছু নেই, তারা সিনেমা দেখেছে, থিয়েটার দেখেছে বা কালচারাল কাজের নামে দল বেঁধে মেয়েমানুষ নিয়ে থিয়েটার করেছে।

এই তো ছিল বাঙালী জীবনের ধরা-বাঁধা রুটিন।

এর কদাচিৎ-কদাচিৎ ব্যতিক্রম যখন হয়েছে তখন দু-চারখানা স্টেট-বাস বা ট্রাম পুড়েছে। তাতে ভেবেছি লোকসান যা-কিছু হয়েছে তা সবই গভর্মেন্টের। আমাদের ষোল আনাই লাভ!

কিন্তু এবার অন্য রকম।

এবার বলা-নেই কওয়া-নেই, হঠাৎ কারা এসে কোথায় হামলা করে। আর পুলিশ আসবার আগেই পালিয়ে যায়।

স্কুলে লেখাপড়া চলছে, হেডমাস্টার অফিস-ঘরে বসে কাজকর্ম করছেন। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, বোমার শব্দ। তারপর কাগজ-ফাইল-ম্যাপ সব কিছু তছনছ। টেলিফোন-রিসিভার চেয়ার-টেবিল সব কিছু ভেঙেচুরে একশা। শুধু তাই নয়, অফিস-আদালত-কাছারি-ফ্যাক্টরি সব কিছু অচল খানিকক্ষণের জন্যে!

এ কারা? এদের দলের নাম কী? এরা কী চায়? এত বোমাই বা এরা পায় কোত্থেকে?

সহজবুদ্ধি মানুষ, বুদ্ধিজীবী, কেরানী, মুটে, মজুর, শিক্ষক, সবাই সবাইকে প্রশ্ন করে—এ কারা মশাই? এদের দলের নাম কী? এরা কী চায়? এত বোমাই বা এরা পায় কোত্থেকে?

ভৈরববাবুও সবাইকে জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁ মশাই, এরা কারা?

প্রভাকেও জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁ মা, এরা কারা তুই কিছু জানিস?

প্রভা বলে—তুমি চুপ করে থাকো না বাবা! তোমার গায়ে তো বোমা লাগছে না, তোমার ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী?

আজকাল প্রভা ইস্কুলে বেরিয়ে গেলেই ভৈরববাবু দু-চারটে কাজকর্ম সেরে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়েন। দেবসুন্দরবাবু বাড়িতে থাকলে তাঁর

সঙ্গেই খানিক কথা বলেন। কিন্তু তিনি ভৈরববাবুকে আর সেই আগেকার মতন আমল দেন না।

ভৈরববাবু জিজ্ঞেস করেন—আচ্ছা মশাই, এরা কারা ?

দেবসুন্দরবাবু কথাটা এড়িয়ে যান। বলেন—আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞেস করবেন, তারা আজকালকার ছেলেমেয়ে, তারাই ভালো জানে—

ভৈরববাবু বলেন—তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম মশাই, সে বলে—তুমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না। আচ্ছা আপনিই বলুন, আমিও তো সমাজের একজন, আমি মাথা না ঘামিয়ে থাকতে পারি ? জানেন, সেদিন ট্রামে চড়েছি, টিকিট-চেকার টিকিট চাইতে এল, একজন ছেলে টিকিট কাটলে না। বললে—পার্টির লোক—

—তারপর ?

তারপর আর কী, কথা-কাটাকাটি, গালাগালি, হাতাহাতি, মারামারি।

—শেষ পর্যন্ত কী হলো ?

—পাড়ার ছেলেরা কোত্থেকে এসে জুটলো আর ট্রামটা পুড়িয়ে দিলে। আমরা সব বারণ করতে গেলাম, আমাকে মারতে এল লোহার রড নিয়ে মশাই।

দেবসুন্দরবাবু হাসতে লাগলেন মিটিমিটি, যেন কথাটা শুনে বেশ মজা পেয়েছেন।

ভৈরববাবু জিজ্ঞেস করলেন—আপনি হাসছেন যে ?

—হাসছি আপনার কাণ্ড দেখে। আপনি এ সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ? আপনার কীসের দায় ? আপনার মেয়ে চাকরি করছে, উপায় করছে, রান্নাবান্না করছে, আপনি খান আর আরাম করুন। যেমন সবাই করছে। আপনি কাউকে দেখেছেন এ নিয়ে ভাবতে ? তারাই ভালো আছে। আপনিই বলুন না, ভেবে কিছু লাভ আছে ? ভাবলেই মন-খারাপ আর মন-খারাপ হলেই স্বাস্থ্য-খারাপ !

ভৈরববাবুর মনেও যেন একটু দ্বিধা হয়।

বলেন—তাহলে আপনিও বলছেন ভাববো না ?

—না, কিছু ভাববেন না। এই যে আমার নতুন রং-করা বাড়ির দেয়ালে মোটামোটা অক্ষরে আলকাতরা দিয়ে কারা কী-সব ছাই-পাঁশ লিখে গেল, আমি কি তা নিয়ে ভাবছি ?

তা বটে ! ট্রাম পুড়ছে, স্কুল পুড়ছে, বোমা ফাটছে, লোক মরছে, বাড়ির সামনেই একজন লোক খুন হলো। কই, তা নিয়ে তো কেউ কিছু মাথা ঘামাচ্ছে না—

দেবসুন্দরবাবু উদাহরণ দিলেন একটা।

বললেন—এই তো সেদিন আমি জানালার ধারে বসে বসে খবরের কাগজ মুখে দিয়ে তামাক খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কিনা একজন ছোকরা একজন লোককে

খুন করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। একেবারে আমার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটে গেল মশাই। তারপর শুনলুম লোকটা নাকি আমাদের এখানকার থানার ও-সি। তা ও-সি তো ও-সি। আমারই বা কী আর কারই বা কী? তা পরশুদিন এখানকার থানার নতুন ও-সি এসেছিল আমার বাড়িতে। আমায় জিজ্ঞেস করছিল—কে খুন করেছে আমি দেখেছি কি না—

—তা আপনি কী বললেন?

—আমি আর কী বলবো? আমি বললুম—আমি কিছুই দেখিনি। আমি তখন ঘুমোচ্ছিলুম।

—তারপর?

—তারপর আর কী? তারপর তারা চলে গেল। আমি কি অত বোকা মশাই? আমি বলি—হ্যাঁ আমি দেখেছি, আর তারপর আমার হয়রানি হোক! সে হয়রানির হাত থেকে পুলিশ আমায় বাঁচাবে? আর তারপর যদি ছেলে ছোকরারা রেগে গিয়ে আমার বাড়িতে বোমা চার্জ করে? বাড়ির ভেতরে ঢুকে আমায় খুন করে? তখন আর আঠারো ঘাতে কুলোবে না, একেবারে বাহাত্তর ঘা দিয়েও রেহাই দেবে না—

কথাটা ভৈরববাবুর ভালো লাগেনি।

বললেন—আপনার নিজের স্বার্থটাই বড় হলো দেবসুন্দরবাবু? আর এক-জন মানুষের জীবন কিছুছু নয়? কত প্রাণ বলি দিতে হয়েছে বলুন তো এই স্বাধীনতার জন্যে! এই যে আমরা স্বাধীনতা ভোগ করছি এ কাদের জন্যে বলুন তো? গান্ধী, নেহেরু আর প্যাটেলের জন্যে তো আর নয়, এ সেই তাদেরই জন্যে যারা পুলিশের গুলিতে জীবন দিয়েছে। তারা জীবন না দিলে কি ইংরেজ-ব্যাটারা এ-দেশ ছেড়ে চলে যেত ভেবেছেন?

এ-সব কথা সকলের সঙ্গেই বলেন ভৈরববাবু।

—আর হল্যান্ডের কথা জানেন? উনিশ শো চল্লিশ সালের দশ'ই মে রাত তিনটের···

তা সেদিন হেরম্ববাবুর সঙ্গে বাড়ির সামনেই দেখা হয়ে গেল দেবসুন্দর-বাবুর।

হেরম্ববাবু বললেন—ভৈরববাবুর সঙ্গে দেখা হলো। বুঝলেন—! একটা আস্ত পাগল মশাই। একেবারে আস্ত পাগল।

—কেন?

হেরম্ববাবু বললেন—কেবল বলেন আপনারা কিছু ভাবছেন না, দেশ যে রসাতলে গেল। এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি ভৈরববাবুকে নিয়ে। আপনার কাছেও আসবেন, দেখবেন—

—এসেছিলেন।

—এসেছিলেন ? তাহলে তো সবই শুনেছেন আপনি। ওই যেখানে যাকে পাচ্ছেন তাকেই ধরে লেকচার দিচ্ছেন। বলছেন দেশ রসাতলে গেল, আপনারা কিছু করছেন না। আরে মশাই, আমরা কী করবো ? দেশে গভর্মেন্ট রয়েছে, মিনিস্টার রয়েছে, লাটসাহেব রয়েছে, সৈন্য-সামন্ত রয়েছে, আমরা কী করবো শুনি ? আমরা তো গেরস্থ মানুষ ! তা আপনার কাছে হল্যান্ডের গল্প করেননি ? উনিশ শো চল্লিশ সালে দশ'ই মে হিটলার যেদিন রাত তিনটের সময়···

দেবসুন্দরবাবু হাসতে লাগলেন—করেননি আবার ! হল্যান্ডের সেই গল্প শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে মশাই একেবারে। মানুষটার নিশ্চয় মাথায় গোলমাল আছে—

কথাগুলো মিথ্যে নয়। হয়ত পার্কের মধ্যেই অচেনা সব ভদ্রলোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেকচার শুরু করে দেন।

বলেন—আমি মশাই মরতে বসেছি। আমার আর বেশি দিন নয়। আমি থাকলেও যা, না-থাকলেও তাই। কিন্তু আপনারা ভাই আমার চেয়ে বয়েসে ছোট। আপনারা অনেকদিন বাঁচবেন এখনও। আপনারা গভর্মেন্টের ভরসায় বসে থাকবেন না। আমাদের দেশে হাজারটা পার্টি আর তিন হাজারটা লীডার। তারা কেউ দেশের ভালো চায় না, তারা নিজের কোলে ঝোল টানতেই ব্যস্ত সবাই—

কে একজন এক কোণ থেকে ফুট্ কাটলো—বুড়োটা পাগল রে, আস্ত পাগল—

মন্তব্যটা কানে গেল ভৈরববাবুর।

সেই দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে লাগলেন—হ্যাঁ বাবা, আমি পাগলই বটে, একটা আস্ত পাগল। নইলে আরাম করে বাড়িতে না ঘুমিয়ে এখানে এসে বকর-বকর করি ? আমি পাগলই। তোমরা ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমার মত যদি আরো কিছু পাগল থাকতো তো এ-দেশের চেহারা আজ অন্যরকম হয়ে যেত।—

একপাশ থেকে একটা চিৎকার উঠলো—থামুন আপনি—

ভৈরববাবু গলা চড়ালেন—থামবো কেন ? দেখছেন মশাই, আমাকে থামতে বলছে। কেন থামবো ? আমার কথা আমি না বললে কে বলবে ? আমাদের মত গরীব লোকের কথা বলবার জন্যে কেআছে ? পার্টি-লীডাররা ? তারা তো সবাই স্বার্থপর। তারা কথায় কথায় হরতাল ডাকে। কেন হরতাল ডাকবে ? কার স্বার্থে ? আমাদের, না তাদের নিজেদের স্বার্থে ? তাতে কার ক্ষতি হয়েছে ? আমাদের না তাদের ? আপনারা জেনে রাখবেন আমাদের জনসাধারণের যত ক্ষতি হবে, লীডারদের ততই লাভ ! তাই কথায় কথায় আমাদের দেশে হরতাল হয়, কথায় কথায় ধর্মঘট—

এবার হঠাৎ একটা ঢিল এসে পড়লো সামনে।

কিন্তু তাতে ভয় নেই ভৈরববাবুর। তিনি আরো গলা চড়িয়ে লেক্‌চার দিতে লাগলেন।

কিন্তু ঢিল পড়া দেখে দু'চারজন যারা প্রবীণ লোক ছিল, তারা সরে পড়তে লাগল। তবে অনেকেই রইল তখন। তাদের বেশ মজা লাগছিল। বুড়ো লোক-টাকে নিয়ে তাদের বড় মজা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

তারা বললে—আপনি বলুন মশাই, বলুন। আমাদের ভালো লাগছে শুনতে—

ভৈরববাবু তখন আরো উৎসাহ পেয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন—আপনারা আমার কথায় মজা পাচ্ছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু এ মজার কথা নয়। আমি মধ্যপ্রদেশে ছিলুম। সেখানে আরামেই ছিলুম। কিন্তু রিটায়ার করে নিজের জন্মভূমিতে এসে শেষ ক'টা দিন কাটাতে চেয়েছিলুম। ভাববেন না আমার কোনও যাবার জায়গা নেই। আমি ইচ্ছে করলেই আবার সেখানে গিয়ে আরামে থাকতে পারি। থাকবার মত আমার সামর্থ্যও আছে, আমি এখনও মাসে দেড়শো টাকার মতন পেনশন পাই। কিন্তু তা আমি চাই না। আমি বাঙ্গালী, বাঁচলে বাঙ্গালীদের সঙ্গেই আমি বাঁচতে চাই, মরলে বাঙ্গালীদের সঙ্গেই আমি মরতে চাই—তাই আপনাদের বলছি, আপনারা এখন সচেতন হোন। যেখানে দেখবেন বাস-ট্রাম পুড়ছে সেখানেই বাধা দিন, যেখানে বোমা ফাটছে সেখানেই এগিয়ে গিয়ে তাদের ধরুন, পুলিশের কাছে জানাশোনা গুণ্ডাদের নাম বলে দিন—সমস্যা আমাদের হাজারটা নয়, সমস্যা আমাদের একটাই, সেটা হলো···

এবার একটা আধলা ইঁট এসে তাঁর মাথায় পড়লো। পড়তেই ভৈরববাবু টলে পড়ে গেলেন সিমেন্টের বাঁধানো পেঁঠের ওপর। আর তাঁর মাথা দিয়ে দর-দর করে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো।

তখন আর তাঁর জ্ঞান নেই।

✿ ✿ ✿

নস্কর-বাগান থানার ও-সি'র ওপর সেদিন লালবাজার হেডকোয়ার্টার্স থেকে নতুন অর্ডার এল। হুকুম হলো কনফেশন আদায় করতেই হবে। দিন-দুপুরে কলকাতা শহরের রাস্তার ওপর পুলিশ অফিসার মার্ডার হয়ে গেল আর আশে-পাশের বাড়ি থেকে কেউ দেখতে পেলে না, তা কখনও হয় না। নিশ্চয় কেউ কনফেশন করছে না। কনফেশন আদায় করো।

অধীর ব্যানার্জি টেলিফোনে বললে—আমি স্যার নিজে তদারক করতে গিয়েছিলুম, সবাই বলছে কেউ দেখেনি।

—একজন-না-একজন এমন কেউ নিশ্চয় আছে যে দেখেছে। তাকে খুঁজে বার

করুন।

অধীর ব্যানার্জি বললে—খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছি স্যার, কিন্তু পেলুম না—

ওপাশ থেকে হুকুম এল—আর একবার চেষ্টা করুন। এবার আরো কড়া ইন্‌ভেস্টিগেশন চালান। আর এক কাজ করুন, মৃত ও-সি'র বিধবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যান। তাকে দেখেও কারো-না-কারো দয়া হতে পারে। আপনি মিসেস সরকারকে নিয়েই যান এবার, দেখুন না কী হয়!

অধীর ব্যানার্জি তাই-ই করলে। মৃত ও-সি পশুপতি সরকারের বিধবা স্ত্রীর তখন শোচনীয় অবস্থা। চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি তখন বিপর্যস্ত। মহিলা অনেক কষ্ট করেছেন সংসারটাকে দাঁড় করাবার জন্যে। শেষকালে এই পরিণতিতে এসে ঠেকেছে। অনেক বলা-কওয়ার পর লাটসাহেব নিজের ফান্ড থেকে পাঁচ হাজার টাকা তাঁকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়েছেন।

সব শুনে মিসেস সরকার বললে—যখন বলছেন—তখন যাবো, আর তাছাড়া আমার উপায়ই বা কী?

শেষ পর্যন্ত অধীর ব্যানার্জি একদিন ছুটির দিনে মিসেস সরকারকে নিয়ে নস্কর-বাগান লেনে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে পুলিশ কনস্টেবলের দল। পাড়ার সবাইকে জড়ো করলে ভ্যানটার সামনে। মিসেস সরকার গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো।

—আপনারা সবাই দেখুন, যিনি এখানে ক'দিন আগে খুন হয়েছিলেন তাঁরই বিধবা স্ত্রী আপনাদের সামনে! তিনি আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছেন। বলতে এসেছেন যদি আপনারা কেউ তাঁর স্বামীকে কে বা কারা খুন করেছে দেখে থাকেন তো তাদের নাম বলে দিন। যারা এঁর সর্বনাশ করেছে তাদের শাস্তি হোক, এটা যদি আপনারা চান তো আশা করি, নাম বলতে আপনাদের বাধা হবে না—

বারো-নম্বর নস্কর-বাগান লেনের ভাড়াটে বাড়ির ভেতরের উঠোনের কোণে তখন প্রভা রান্না করছিল। ভৈরববাবু ডাকলেন—ও মা, প্রভা—

প্রভা রান্না করতে করতেই উত্তর দিলে—কী বলছো?

—বলি হ্যাঁ রে, বাইরে কিসের গোলমাল হচ্ছে রে? কী হয়েছে বাইরে?

প্রভা বললে—ও কিছু না, তুমি শুয়ে থাকো—

ভৈরববাবু বিরক্ত হলেন। বললেন—আর কত শুয়ে থাকবো বল্ দিকিনি?

প্রভা বললে—ডাক্তার তোমাকে বেরোতে বারণ করেছে যে, আর শোওয়া ছাড়া তোমার কাজই বা কী?

ভৈরববাবু বললেন—কিন্তু মনটা যে বাইরে যাবার জন্যে ছটফট করছে রে। রোজ একটু পার্কে যেতুম, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল—

প্রভা বললে—ওই পার্কে গিয়েই তোমার এই হাল হলো! পার্কে কেন গেলে? আর পার্কেই যদি যেতে তো লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কেন?

—তা এও তো বড় আবদার! আমার মুখ রয়েছে, কথা বলবো না? কথা বললেও দোষ হয়ে গেল? আমার চোখের সামনে দারোগা খুন হয়ে যাবে, আমার চোখের সামনে বাস-ট্রাম পুড়ে ছাই হবে আর আমি চুপ করে থাকবো? এ-পাড়ার দেবসুন্দরবাবু, হেরম্ববাবু, করুণাকান্তবাবু, সবাই আমাকে চুপ করে থাকতে বলেন, তুইও আমাকে চুপ করতে বলিস? তাহলে বলতে চাস্ এ পোড়া দেশ গোল্লায় যাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবো? তাহলে কলকাতায় এলুম কেন? সেই রায়পুরেই তো থাকতে পারতাম। সেখানে তো আমার কোনও কষ্টই ছিল না। সেখানকার লোকও তো আমায় থাকতে বলেছিল—

হঠাৎ বাইরে আবার একটা সোরগোল উঠলো।

—ও কীসের গোলমাল রে? ওখানে বাইরে কী হচ্ছে মা?

বাইরে তখন সত্যিই রীতিমত সভা জমে উঠেছে। করুণাবাবুকে বাইরে ডেকে নিয়ে এসেছে কনস্টেবলরা। দেবসুন্দরবাবুও এসেছেন। হেরম্ববাবুকেও ডেকে আনা হয়েছে। তাঁর ছেলে ভবেশ, নরেশ তারাও আছে। আরো আছে পাশাপাশি বাড়ির লোকজন।

—বলুন, বলুন আপনারা! একজন অনাথা বিধবার মুখের দিকে চেয়েও আপনাদের মনে দয়া হবে না? আপনাদেরই মা-বোন কিংবা মেয়ের যদি এই অবস্থা হতো? এঁর এই অবস্থায় আপনাদের নিজেদের বসিয়ে ভাবুন, তাহলেই অবস্থার গুরুত্বটা বুঝতে পারবেন। আজ এর স্বামীকে একজন খুন করেছে, এর পর একদিন আপনাদের পরমাত্মীয় কাউকেও হয়ত আবার কেউ খুন করে যাবে। সেদিনও এমনি করে আমাকেই ইন্‌ভেস্টিগেশনে আসতে হবে। তখন? তখনও আমি এমনি করেই আপনাদের দ্বারস্থ হবো। আমার ইন্‌ভেস্টিগেশনে সহযোগিতা করতে বলবো, সাহায্য করতে বলবো। আজকে পুলিশ অফিসার মারা গেছে বলে যেমন করে আপনাদের সাহায্য চাইছি, সেদিনও তেমনি করে আপনাদের কাছেই সাহায্য চাইবো। আমার ডিউটিই এই। কিন্তু ডিউটিই তো সব নয়। ডিউটির ওপরেও আর একটা জিনিস আছে তার নাম মানবতাবোধ, তার নাম মনুষ্যত্ব। আপনাদের সেই মানবতাবোধ, সেই মনুষ্যত্বের কাছে আমি আবেদন করছি, এই অনাথা বিধবার মুখ চেয়ে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। আমি তার প্রতিবিধান করবো। আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে আপনাদের পাড়াতে শান্তি বিরাজ করে, আপনারা নির্বিঘ্নে নিজেদের কাজকর্ম জীবন-যাত্রা চালিয়ে যেতে পারেন……

অধীর ব্যানার্জি যখন স্কুলে পড়তো তখন বিদ্যাসাগরের ওপর প্রবন্ধ রচনা

করে বাংলায় ফার্স্ট হয়েছিল।

বাংলার মাস্টার কাশীশ্বর বোস স্যার বলেছিলেন—তুমি একদিন ভালো সাহিত্যিক হবে অধীর—

মাস্টার-মশাই-এর সেদিনকার সেই আশা পূরণ হয়নি। ভাল-ভাল কথা গুছিয়ে বলতে পারলেই যদি সাহিত্যিক হওয়া যেত তো অধীর ব্যানার্জি আজ নস্কর-বাগান থানার ও-সি না হয়ে অন্য কিছু হতো।

কাশীশ্বর বোস মারা গিয়ে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁকে আজকের এই অশান্তির জ্বালা সইতে হয়নি। কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিলেন অসংখ্য ছাত্রের আশীর্বাদ তিনি পেয়ে গেছেন। ছাত্রদের তিনি নিজের বাড়িতে পড়াতেন। তাদের মুড়ি খেতে দিতেন। তার জন্যে একটা পয়সা কখনও চাননি। বিশেষ করে অধীর নিজে ছিল গরীবের ছেলে। বিধবার একমাত্র সন্তান।

মনে আছে অধীর ব্যানার্জির বাবা যেদিন মারা গেলেন কাশীশ্বর স্যার খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছিলেন।

অধীর কাঁদছে দেখে বলেছিলেন—কান্দিস নি রে, কান্দিস নি। তোর বাবা মারা গেছে তাতে কী হয়েছে। বাবা তো সকলেরই একদিন-না-একদিন মারা যায়। আর আমি তো আছি। তোর মত আমারও বাবা একদিন মারা গিয়েছিলেন, আমিও তোর মত কেঁদেছিলুম রে। চুপ কর—চুপ কর তুই—

তারপর কোথায় গেলেন সেই কাশীশ্বর বোস স্যার। আর কোথায় গেল সেই স্কুল। একদিন কাশীশ্বর বোস স্যার হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাঁর বিধবা স্ত্রী শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে প্রায় বলতে গেলে ভিক্ষে করে কাটিয়েছিলেন।

কিন্তু অধীর ব্যানার্জির তখন এমনই অবস্থা যে নিজেরই খাওয়া জুটতো না। সেই মৃত শিক্ষকের বিধবা স্ত্রীকে কী করে ভরণ-পোষণ করবে!

জীবন বোধ হয় কোনও ম্যাজিক জানে। অফুরন্ত শক্তি বোধ হয় মানুষের জীবনের। নইলে এত দুর্যোগ, এত বিপর্যয়, এত ভাগ্যহীনতার মধ্যে অধীর ব্যানার্জি এখনও বেঁচে আছে কেমন করে! পাকিস্তান থেকে বিধবা মাকে নিয়ে যখন এখানে এই কলকাতায় এসে উঠেছিল তখন তো কল্পনাও করেনি যে, এই চাকরি সে পাবে। দুটো খেতে পাবার মত চাকরি পেলেই সে তার ভাগ্য-দেবতাকে ধন্যবাদ দিত। বলতে গেলে এ চাকরি তো তার কাছে স্বর্গ। অর্থাৎ স্বর্গ পাওয়া।

কিন্তু সেই চাকরিই যে শেষকালে এমন অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানত!

যারা দু'পয়সা হাতাতে পারে তাদের কাছে এ-চাকরি সত্যিই স্বর্গের চাবি-কাঠি পাওয়া। এই চাকরিতে ঢুকে কয়েক বছরের মধ্যেই দশ লাখ টাকার মালিক

হয়ে গেছে, এমন খবরও অধীর ব্যানার্জি জানে। কিন্তু অধীর ব্যানার্জির টাকা নিতে কী-রকম যেন বাধে। অথচ কত লোক টাকা দিতে আসে। ঠিক ঘুষ নয়। উপকারের প্রতিদান। লাখ-লাখ টাকার উপকারের বদলে কয়েক হাজার টাকার কৃতজ্ঞতা। তা নিতেও অধীর ব্যানার্জির আপত্তি।

বলে—টাকা আমাকে দিতে হবে না। এ তো আমার ডিউটি। আমি আপনার উপকার করিনি, আমি শুধু আমার ডিউটিই করেছি—

কিন্তু বাড়িতে মাধবী বড় কষ্ট করে সংসার চালায়। অধীর ব্যানার্জি তো ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ডিউটি করতেই ব্যস্ত। এক-একদিন সারা রাতই বাড়ি ফিরতে পারে না। পার্টিতে-পার্টিতে ঝগড়া। দু'-পার্টিই মিনিস্ট্রি পেতে চায়। ভোটে জিতে পার্টির লীডাররা মন্ত্রীর গদিতে বসতে চায়। পাড়ায়-পাড়ায় পার্টির ক্যাডারদের মধ্যে তাই নিয়ে ঝগড়া! মাঝখান থেকে যত কিছু চাপ এসে পড়ে পুলিশের ওপর। কত কনস্টেবল, কত এস-আই অধীর ব্যানার্জির চোখের সামনে বোমার ঘায়ে মারা গেছে! এই থানারই ও-সি তো হঠাৎ খুন হয়ে গেল। এক-দিন অধীর ব্যানার্জিও হয়ত খুন হয়ে যাবে। কে বলতে পারে!

মাধবী দরকার পড়লেই টাকা চায়। মাসের শেষের দিকে অধীর ব্যানার্জির হাতে আর কোনও টাকা থাকে না।

বলে—এই ক'টা দিন কোনও রকম করে চালিয়ে নাও, তার পরেই তো মাইনে পাচ্ছি—

অথচ আশেপাশের থানার ও-সি'দের বাড়িতে ফ্রিজ, ট্র্যানজিসটার, টেপ-রেকর্ডার, রেকর্ড-চেঞ্জার, কোনও কিছুরই অভাব নেই। ব্যাঙ্কে নানা নামে কালো টাকা রেখে দিয়েছে তারা। তারা কখনও ভবতোষ সরকার, আবার কখনও পঞ্চানন ঘোষ, আবার কখনও পরেশ সান্যাল। এ-সব জানে অধীর ব্যানার্জি।

কিন্তু সেই অধীর ব্যানার্জিকেই আজ এতগুলো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে সৎ হতে উপদেশ দিতে হচ্ছে।

আশ্চর্য! যে যুগে সততা সত্যবাদিতা শব্দগুলো মানুষের জীবন থেকে উহ্য হয়ে গেছে, সেই যুগে মধ্যবিত্ত মানুষের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাকে সেই সততা আর সত্যবাদিতা পালন করতে পরামর্শ দিতে হচ্ছে। ভাগ্যের এ-ও তো এক নিষ্ঠুর পরিহাস।

—বলুন, আপনারা চুপ করে রয়েছেন কেন? আপনাদের বাড়ির সামনে দিনের আলোয় এত বড় একটা খুন হয়ে গেল আর আপনারা কেউ-ই দেখতে পেলেন না, এটাও কি গভর্নমেন্টকে বিশ্বাস করতে বলেন? গভর্নমেন্ট তো আপনাদের ভালোর জন্যে আমাদের মাইনে দিয়ে রেখেছে। সেই আপনাদের ভালো কে করবে? বলুন, কে ভালো করবে আপনাদের?

মৃত ও-সি'র বিধবা স্ত্রী লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে তখনও আঁচলে চোখ

মুছছে।

বাইরের রাস্তায় যখন মানুষের ভিড় জমেছে, করুণাকান্তবাবুর গৃহিণী তখন জানালার ফাঁক দিয়ে সব দেখছেন। বার বার করে তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন যেন কর্তা কিছুতেই না বলেন যে, তিনি সমস্ত ঘটনা দেখেছেন।

করুণাকান্তবাবু বলেছিলেন—কেন, বলে দিই না সব ঘটনাটা। আমি তো সব দেখেছি। হলদে শার্ট পরা, লম্বা জুলফিওয়ালা ছেলেটাকেও ধরবে, আমাদের বাড়ির এই ছুঁড়িটাকেও ধরবে! আপদ বিদেয় হবে!

গৃহিণী বলেছিলেন—তোমার কী যে বুদ্ধি! তুমি না হয় সব ঠিকই বললে, কিন্তু তারপর? তারপর তোমাকেই যদি কেউ খুন করে ফেলে, তখন?

এ-কথাটা ভেবে দেখেননি করুণাকান্তবাবু। বললেন—তাও তো বটে। তাহলে কি বলবো?

—বলবে আবার কি! কিছুই বলবে না। শুধু বলবে তুমি জানো না। কার স্বামী মরলো, কে বিধবা হলো, তাতে আমাদের কি?

দেবসুন্দরবাবুর বাড়িতেও ওই একই অবস্থা। পুলিশের ডাক পেয়েই দেবসুন্দরবাবু কাঁপতে আরম্ভ করেছিলেন। সোজা ভেতরে চলে গেলেন।

ডাকলেন—ওগো, কোথায় গেলে তুমি?

গৃহিণী সেই দোতলায় তখন পানদোক্তা মুখে পুরে দিয়েছিলেন। সুতরাং সাড়া দেবার মত অবস্থা নেই তখন তাঁর।

দেবসুন্দরবাবু কাছে গিয়ে বললেন—ওগো, শুনছো, আর এক বিপদ হয়েছে, পুলিশ এসে রাস্তায় ডাকছে—

গৃহিণী পানের পিক্ ফেলে এলেন বাথরুমে গিয়ে। বললেন—সারাদিন খেটে-খুটে একটু যে পান খাবো, তারও উপায় নেই তোমার জন্যে। পিক্‌টা ফেলালে তবে ছাড়লে। তা কেন? পুলিশ তোমাকে ডাকছে কেন?

—কী জানি কেন! শুনলুম তো সেই পুলিশের দারোগার বিধবা বউটাকে নাকি রাস্তায় ধরে নিয়ে এসেছে। বলছে, তার স্বামীকে কে খুন করেছে তার নাম বলতে হবে—

—তা বলো গিয়ে।

—পাগল হয়েছো। আমি নাম-ধাম বলি আর আমাকে খুন করে ফেলুক ওরা। আমি বলবো আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই দেখিনি—

তারপর ডাকলেন—রঘুবীর! রঘুবীর কোথায় রে?

বলতে বলতে নিচের দিকে আসছিলেন। সিঁড়ির মাঝপথেই রঘুবীরের সঙ্গে দেখা।

—কী রে? কী করছিলি? শোন ইদিকে। পাড়ায় পুলিশ এসেছে। বুঝলি? সেবারে যেমন এসেছিল, এবারেও তেমনি এসেছে। এসে যদি তোদের

ডাকে, ডেকে জিজ্ঞেস করে—কে দারোগাবাবুকে খুন করেছিল তোরা জানিস কিনা, তুই বলবি জানি না। বুঝলি? বুঝলি তো? তুই বলবি তুই জানিস না, বুঝলি তো?

রঘুবীর বললে—হ্যাঁ বাবু—

—হ্যাঁ, ঠিক যেন মনে থাকে তখন।

—হ্যাঁ, মনে থাকবে।

দেবসুন্দরবাবু বললেন—কমলা কোথায়? কমলাকে ডেকে আন আমার সামনে—

কমলাকে ডেকে আনলে রঘুবীর। দেবসুন্দরবাবু কমলাকেও সেই একই কথাগুলো বললেন। শেষকালে বললেন—বুঝলে তো? পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা, বুঝলে? আমি যা বলছি তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছি—

বলে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু অবস্থা বেশি শোচনীয় হলো হেরম্ববাবুর। তিনি বললেন—তোমরা বলে দাও না যে, আমি ব্লাড-প্রেসারের রুগী, আমার মাথা ঘুরছে, আমি যেতে পারবো না।

ভবেশ বললে—না বাবা, আপনার গিয়ে দাঁড়ানো দরকার, নইলে পুলিশ আপনাকেই সন্দেহ করবে—

—তা আমি গিয়ে কী বলবো?

—বলবেন আপনি ব্লাড-প্রেসারের রুগী, আপনি কিছুই দেখেননি। মিথ্যে কথা বলবেন।

—মিথ্যে কথা বললে যদি আবার উল্টো উৎপত্তি হয়?

—কেন উল্টো উৎপত্তি হবে? কেউ তো জোর করে আপনার কাছে কথা আদায় করতে পারবে না।

হেরম্ববাবু বললেন—কিন্তু আমি যে দেখেছি সব। যদি সত্যি কথা আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়?

গৃহিণী পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন এতক্ষণ। তিনি বললেন—ওই দ্যাখ্, তোর বাবার কাণ্ড দ্যাখ্, কোন্ মানুষকে নিয়ে অ্যাদ্দিন ঘর করেছি তোরা দ্যাখ্। সত্যি কথা ওম্‌নি মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেলেই হলো? আমাদের গেরস্থর ভালো-মন্দ বড় হলো না, তোমার কাছে সত্যি কথাটাই সবচেয়ে বড় হলো? তোমার ছেলে-মেয়ে-বউ-এর মুখ চেয়েও মিথ্যে কথা বলতে পারবে না? তাহলে বিয়েই বা করেছিলে কেন, আর সংসারই বা করতে তোমাকে কে বলেছিল?

হেরম্ববাবুর ব্লাড-প্রেসার তখন এমনিতেই বেড়ে গিয়েছিল, এসব কথায় তা আরো বেড়ে গেল। তিনি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তার দিকে চলতে লাগলেন।

কিন্তু একদিকে নস্কর-বাগান লেনের ওপরে দাঁড়িয়ে ও-সি অধীর ব্যানার্জি যখন সততার নামে, সত্যবাদিতার নামে পাড়ার সমস্ত লোকের সামনে আবেদন জানাচ্ছে, তখন উত্তর কলকাতার একটা স্কুলের ভেতরে ঢুকে একদল ছেলে চেয়ার-টেবিল ভাঙছে, টেলিফোনের তার কাটছে, বোমা ফাটাচ্ছে আর বিল্ডিঙের মাথায় লাল ফ্ল্যাগ টাঙিয়ে দিচ্ছে। হেডমাস্টার ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপছে। স্কুলের সমস্ত ছাত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে হাঁ করে ছেলেদের কাণ্ডকারখানা দেখছে আব স্কুল থেকে মুক্তি পাবার আশায় প্রহর গুণছে।

হঠাৎ চিৎকার উঠলো—লাল সেলাম জিন্দাবাদ—

অধীর ব্যানার্জির বাড়িতে তখন আর এক কাণ্ড। অধীর ব্যানার্জির ছোট মেয়ে স্কুল থেকে বাড়ি আসছিল। সে ভোরবেলা স্কুলে যায় আর বারোটার সময় রোজ বাড়ি ফেরে। কিন্তু দুপুব হয়ে গেল তখনও মেয়ে ফিরছে না দেখে মাধবী থানার অফিসে খবর দিলে।

কিন্তু মেয়ে যখন ফিরলো, তখন সে হাউ-হাউ করে কাঁদছে।

—কী হলো রে? কী হলো? কাঁদছিস কেন?

কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে যা বললে, তা শুনে মাধবী অবাক। দু'হাতে সবু দু'-গাছা সোনার রুলি গড়িয়ে দিয়েছিল মেয়েকে। এমনিতে কখনও তা পরে না সুনু। কিন্তু সেদিন ছিল তার জন্মদিন। ভেবেছিল জন্মদিনে একটু পরুক। তা সেইটেই কে ছিনতাই করে নিয়েছে!

—কে নিলে তোর সোনার রুলি?

—একটা লোক।

—তা তোর সোনার রুলি হাত থেকে কেড়ে নিলে আর তুই কিছু বললি নে? কী-রকম চেহারা লোকটার?

সুনু কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলে—কালো মতন—

—তুই দৌড়ে পালিয়ে এলি নে কেন?

—সে আমাকে ল্যাবেঞ্জুস খেতে দিলে।

সর্বনাশ। লজেন্স খেতে দিয়েছে তাই রক্ষে, তার বদলে বিষ খেতে দিলে কী-ই বা করবার ছিল মাধবীর। যে-কনস্টেবলটা থানায় খবর দিতে গিয়েছিল তাকে মাধবী জিজ্ঞেস করলে—বড়বাবু কোথায় রে?

—তিনি তো নস্কর-বাগান লেনে ডিউটিতেই গেছেন।

নস্কর-বাগান লেনের ওপর তখন আরো ভিড় জমে গেছে। অধীর ব্যানার্জির গলা তখন লেক্‌চার দিতে দিতে আবেগে বন্ধ হয়ে এসেছে। সে বলে চলেছে—

আমি পুলিশ বটে, কিন্তু আমিও তো মানুষ, আমারও তো আপনাদের মত ছেলে-মেয়ে-পরিবার আছে। আমাকেও তো আপনাদের মত সংসার করতে হয়। আমাকেও রাস্তায় বাসে-ট্রামে চড়তে হয়। আমার সমস্ত কিছুই আপনাদের মত। আপনাদের যা সমস্যা, আমারও তাই-ই। আপনাদের যেমন জিনিসপত্রের দাম বাড়লে দেনা করতে হয়, আমারও তেমনি। তাই আজ আপনাদের একজন হয়েই আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, আপনারা আমায় সাহায্য করুন, শান্তি ফিরিয়ে আনতে দিন। সারা পৃথিবীই আজ শান্তির জন্যে আবেদন করছে, আমাদের সরকারও কলকাতায় শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে···আপনারা যাতে সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারেন সেইজন্যেই আমি আজ এখানে এসেছি।—আপনি কিছু জানেন? আপনি?

ভবেশের দিকে চেয়ে আঙুল দিয়ে দেখালে অধীর ব্যানার্জি।

—আপনি? আপনি কিছু জানেন?

ভবেশ বললে—আমি তখন অফিসে গিয়েছিলুম, আমি কিছু দেখতে পাইনি—

—আপনি?

এবার নরেশের দিকে আঙুল দেখালে অধীর ব্যানার্জি।

নরেশ বললে—আমি তো তখন কলেজে—

—আপনি?

এবার দেবসুন্দরবাবুর দিকে আঙুল দেখালে অধীর ব্যানার্জি।

দেবসুন্দরবাবু বললেন—আমি রিটায়ার্ড লোক, রিটায়ার্ড গভর্মেন্ট অফিসার, আমাব সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া অভ্যেস। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে তেতলায় আমার শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছি।

—আপনার ছেলে-টেলে কেউ নেই? তারা দেখেনি?

—তারা সব বাইরে চাকরি করে, একজন বোম্বেতে, আর একজন দিল্লীতে—

অধীর ব্যানার্জি অবাক হয়ে গেল। বললে—ভারি আশ্চর্য তো, আপনারা এতগুলো ভদ্রলোক পাড়ায় বাস করেন. আপনাদের বাড়ির সামনে স্পষ্ট দিনের আলোয় এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল, আর আপনারা কেউ-ই দেখতে পেলেন না? এও কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

—তা আপনি?

এবার হেরম্ববাবুর পালা।

হেরম্ববাবু বললেন—না, আমি দেখিনি—

—কেন—দেখেননি কেন? আপনি তখন কী করছিলেন?

—আমি ব্লাড-প্রেসারের রুগী, সব সময় আমার মাথা ঘোরে। ডাক্তার

আমাকে হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে বারণ করেছে। আমি তাই কোনও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পারতপক্ষে থাকি না।

—আপনার ছেলে ?

—ওই তো দুই ছেলে। তারা তো আগেই বলেছে যা বলবার—

—আপনার স্ত্রী কিছু দেখেছেন ? এমনও তো হতে পারে যে ঠিক সেই সময়ে গোলমাল শুনে তিনি জানালার ধারে এসে অপরাধীকে দেখতে পেলেন—

হেরম্ববাবুর হয়ে ভবেশই উত্তর দিলে। বললে—না, সংসারের সমস্ত কাজ মাকে একলাই করতে হয়, তাই কোনও দিকে দেখবার সময় হয় না মা'র। আমাদের বাড়িতে রাঁধবার লোকও নেই—

অধীর ব্যানার্জি বললে—তাহলে দেখছি আপনারা কেউ-ই দেখেননি।

তারপরে হঠাৎ তার অন্য একজনের মুখের দিকে নজর পড়লো। জিজ্ঞেস করলে—কই, আপনি তো কিছু বলছেন না—

করুণাকান্তবাবু এতক্ষণ এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জন্যে নিজেকে আড়ালে রেখেছিলেন। বললেন—আমি ? আমিও কিছুই দেখিনি স্যার—

—আপনি কী করেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

—আমি ? আমার বড়বাজারে স্টেশনারি দোকান আছে। আমার ছেলেরা এখন দোকান দেখাশোনা করে, আমি দোকানে শুধু মাঝে মাঝে যাই—

—ছেলেরা কোথায় ? তাদের একবার ডাকুন না।

করুণাকান্তবাবু বললেন—তারা সব স্যার আলাদা-আলাদা জায়গায় বাড়ি করে আলাদা হয়ে আছে। কিন্তু শান্তি স্যার কোথাও নেই। তাদের পাড়াতেও গোলমাল সুরু হয়েছে। কলকাতায় কোন্ পাড়াতেই বা শান্তি আছে বলুন ? কেন মরতে যে বাঙলাদেশে জন্মেছিলুম তাই ভাবি—

—আপনি না দেখতে পারেন, কিন্তু আপনার বাড়ির কেউ ঘটনাটা চোখে দেখেছেন হয়ত ?

করুণাকান্তবাবু বললেন—বাড়িতে বলতে আমার গৃহিণী ছাড়া আর তো কেউ নেই। তা তিনি তো পুজো-আহ্নিক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। দিনরাত ঠাকুর আর ঠাকুর। তবে আমার বাড়িতে একজন ভাড়াটে থাকে—নিচের তলায়—

—কে ? ভাড়াটে কে ?

—সে একজন মেয়েমানুষ। তীর্থময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের মাস্টারনী।

অধীর ব্যানার্জি বললে—কই, তাঁকে তো দেখছি না। তাঁকে একটা খবর পাঠালে হয়।

—তার বুড়ো বাবাও ও-বাড়িতে আছেন স্যার। তাঁকে ডাকলেও হয়। তিনি হয়ত ঘটনাটা দেখে থাকতে পারেন, হয়ত বলতে পারবেন কে আসলে খুন করেছে, কী-রকম চেহারা তার।

হেরম্ববাবু বললেন—তিনি আসতে পারবেন না স্যার। তিনি অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তিনি পার্কে বেড়াচ্ছিলেন, কে যেন তাঁর মাথায় ইঁট ছুঁড়ে মেরেছে—সারা মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন।

অধীর ব্যানার্জি বললে—তাহলে তাঁর মেয়ের সঙ্গেই আগে কথা বলি? তিনি এখন বাড়িতে আছেন তো?

সবাই বললে—হ্যাঁ স্যার, বাড়িতে আছেন—

—তাহলে আমি সেখানেই যাচ্ছি—

বলে অধীর ব্যানার্জি এগোল বাড়িটার দিকে।

চলতে গিয়ে একবার পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলে—কী নাম বললেন মহিলার?

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—প্রভা চক্রবর্তী—

একলা-একলা অন্ধকার তক্তপোশটার ওপর শুয়ে শুয়ে ভৈরববাবু তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। আর কতদিন শুয়ে থাকা যায়! অথচ যখন রায়পুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন তখন কত আশা ছিল তাঁর। নিজের দেশে আসছেন। সেই পিতৃপুরুষের জন্মস্থান! নিজের মেয়ে যখন কলেজ থেকে পাস করে বেরোল, তখন হয়ত মধ্যপ্রদেশেই একটা চাকরি পেত সে। কিন্তু কেন যে কলকাতায় চাকরি নিলে প্রভা! আর কলকাতার নাম শুনে তিনিও আপত্তি করলেন না। কলকাতা! কলকাতার কথা ভাবলেই তাঁর মনে পড়তো রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, সুভাষ বোসের কলকাতা। সেই কলকাতার জল-হাওয়া-মাটিও যেন পবিত্র। যাক, প্রভা কলকাতাতেই যাক। তারপর চাকরি থেকে রিটায়ার করে তিনিও কলকাতায় গিয়ে শান্তিতে বাস করবেন।

মিস্টার মহাজন বলেছিলেন—কেন মিছিমিছি যাচ্ছেন সেখানে ভৈরববাবু, সে-কলকাতা কি আর এখন তেমন আছে! বরং আপনার মেয়েকে এখানে আসতে বলুন, আমি এখানে প্রভার একটা চাকরি করে দেব—

ভৈরববাবু সে-কথা শুনে হেসেছিলেন। বলেছিলেন—না মিস্টার মহাজন, যে-ক'টা দিন বাঁচি বাঙলাদেশেই কাটাবো। বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, নেতাজীর দেশ আমার দেশ। মরলে বাঙলাদেশের মাটিতেই মরব—এতে আপনি বাধা দেবেন না—

তা শেষ পর্যন্ত মিস্টার মহাজন বাধা দেননি। রায়পুরের কেউই বাধা দেয়নি। বরং আসবার সময় খুব ঘটা করে ফেয়ারওয়েল দিয়েছিল তারা তাদের

অফিসের সুপারিনটেনডেন্টকে—

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কেন এলেন তিনি ! প্রভাই বা কেন এল !

এক-একদিন প্রভাকে তিনি বলতেন—হ্যাঁ রে, কলকাতায় তোর ভাল লাগছে ?

প্রভা বলতো—কেন, তোমার ভালো লাগছে না বুঝি ?

ভৈরববাবু বলতেন—না রে, তা নয়, আমি বড়-আশা করে এসেছিলুম রে। ভেবেছিলুম এ সেই বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, সুভাষ বোসের দেশ, এখানেই শেষ জীবনটা কাটাবো। কিন্তু এ দেশ যে এমন হয়ে গেছে তা ভাবতে পারিনি—

প্রভা জিজ্ঞেস করতো—কেন, কী রকম হয়ে গেছে ?

ভৈরববাবু বলতেন—সবাই যেন কেমন হয়ে গেছে মা। সব রোগা-রোগা চেহারা, দেখে মনে হয় যেন খেতে পায় না, কিন্তু বাইরে পোশাক-পরিচ্ছদের চাক-চিক্য আছে সকলের। ট্রামে-বাসে উঠে ভাড়া না-দেবার মতলব, বোমা নিয়ে মারামারি, পরীক্ষার হলে শুনেছি নাকি নকল করবার চেষ্টা, গার্ডদের খুন করে পালায়। এরা কি মানুষ ? সব যে জানোয়ার হয়ে গেছে রে। এখানে থাকলে আমিও মারা যাবো, তুইও মারা যাবি, দেখে নিস্—এ কী রাজ্যে বাস করছি আমরা ! দুধ পাব না, জল পাব না, ইলেকট্রিক লাইট পাবে না মানুষ—রোজই হরতাল—

প্রভার ভালো লাগতো না এ-সব কথা। বলতো—তা এর জন্যে কে দায়ী ?

ভৈরববাবু অবাক হয়ে যেতেন প্রভার কথা শুনে। বলতেন—কে আবার দায়ী, বাঙালীরাই দায়ী—

—না, বাঙালীরা দায়ী নয়।

—তাহলে কে দায়ী ?

প্রভা বলতো—তোমার এখানে থাকতে ভালো না লাগে তুমি রায়পুরে চলে যাও। আমি এখানেই থাকবো।

ভৈরববাবু বলতেন—তা এর জন্যে কে দায়ী তা বলবি তো ? অন্য লোকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ভাবছিস তুই বেঁচে যাবি ? আমাদের ঘর, আমাদের বাড়ি, আমাদের পুলিশ, আমাদের সরকার, আমাদের সব কিছু। এখন তো আর ইংরেজরা নেই যে ইংরেজদের ঘাড়ে দোষ চাপাবি ? সেদিন পার্কে কোনও কিছু নেই—এই সব কথাই বলছিলুম এক ভদ্রলোককে, দেখতে দেখতে অনেক লোক জমে গেল, হঠাৎ আমার মাথায় এসে একটা ইঁট পড়লো ? তা আমি কী দোষ করলুম বল্ তো ? আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি—

প্রভা বলতো—হ্যাঁ, তুমি অন্যায়ই বলেছ। সেই জন্যেই তো তোমায় বলি তুমি বাইরে যেও না—বাইরে কারোর সঙ্গে মিশো না, কারোর সঙ্গে কথা বোল না।

—তা ন্যায্য কথা বলবো না ?

—কোন্‌টা ন্যায্য আর কোন্‌টা অন্যায্য তা তুমি বুঝবে না।

—বাসে-ট্রামে উঠে ভাড়া না-দেওয়াটা অন্যায্য নয় ?

প্রভা রেগে উঠে গলা চড়াতো। বলতো—না, অন্যায্য নয়। ভাড়া দেয় না বেশ করে! বাস-কোম্পানীর কর্তারা যখন লাখ-লাখ টাকা চুরি করে নিজেদের পকেট ভরায় তখন তো কেউ তাদের ধরে না, কেউ তাদের জেলে পোরে না! আর আট-দশ পয়সার টিকিট না কিনলেই বুঝি মহা-অপরাধ হয়ে গেল ? তাই তো তারা আজ পয়সা ফাঁকি দিয়ে বাসে উঠছে। বাস-ট্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে—

ভৈরববাবু হেরে যেতেন তর্কে। বলতেন—তোর সঙ্গে দেখছি কথা বলাই দায়। অন্য লোকে চুরি করছে বলে আমিও চুরি করবো ? এই হলো তোর যুক্তি ?

এক-একদিন চুপি চুপি উঠে বাইরে যেতে ইচ্ছে করে ভৈরববাবুর। কিন্তু উঠতে গেলেই মাথাটা কেমন ঘুরে যায়। আবার চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েন। সকালবেলা ইস্কুলে যাবার সময় প্রভা সদর দরজায় তালা লাগিয়ে চলে যায়, যাতে বাবা বাড়ির বাইরে যেতে না পারে। তারপর বেলা হলে যখন ইস্কুল থেকে ফেরে তখন তালা খুলে আবার বাড়ি ঢোকে।

ভৈরববাবু জানালার ধারে এসে বাইরের একফালি আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। রায়পুরে ওই আকাশটা কত বড় ছিল, কত তার বিস্তার ছিল। এখানে এসে একফালি আকাশের মত সকলের মন বুদ্ধি ভাবনা আশা কামনা-বাসনাও যেন সংকুচিত হয়ে গেছে। বাঙলাদেশের মানুষের পরমায়ুও যেন কমে গেছে ওই একফালি আকাশের মত।

—ওরে ও প্রভা, কী করছিস মা তুই ?

প্রভা রান্নাঘরে বসেই বললে—কেন ?

—আমি একটু বাইরে যাবো মা ? আর যে চুপ করে শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না রে!

—কিন্তু বাইরে গিয়ে যদি তুমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাও ?

ভৈরববাবু বললেন—তা গায়ে বলই বা পাচ্ছিনে কেন বল তো মা ? আগেকার মত শরীরে জোর হচ্ছে না কেন আমার?

প্রভা উঠে এসে ভৈরববাবুর সামনে দাঁড়ালো।

বললে—কেন বল পাবে শুনি ? তোমাকে কি আমি খাঁটি দুধ খাওয়াতে পারি ? ফল খাওয়াতে পারি ? দামী ওষুধ ভিটামিন খাওয়াতে পারি যে তুমি শরীরে বল পাবে ? ও-সব মিনিস্টার আর গেজেটেড অফিসারদের জন্যে ঠিকই বরাদ্দ আছে। তাদের কোনও অভাব নেই, দেখে এসো তাদের বাড়িতে গিয়ে। আমরাই যত ভেজাল খাবো! কেন, আমরা খাঁটি জিনিস হজম করতে পারি

না ? গয়লা যখন দুধে জল মেশায় তখন তা ভেজাল দুধ হয়, আর গভর্নমেন্ট যখন দুধে জল মেশায় তখন তা হয় টোনড্-মিল্ক ! আমরা কেবল সেই টোনড্-মিল্ক খাবো—

ভৈরববাবু বললেন—তুই অত রাগ করছিস কেন ?

—রাগ করছি কি সাধে ? রাগের আমার তুমি দেখেছ কী ? কতটুকু রাগ দেখেছ ? এই রাগের আগুনে দেখবে একদিন বাঙলাদেশ পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। এখন এই ক'টা বাস পুড়তে দেখেই তুমি অবাক হচ্ছ, শেষকালে সেই আগুন সামলাতে সমস্ত ভারতবর্ষকে আহুতি দিতে হবে তা মনে রেখো ! তোমার সাধের রায়পুরও সে-আগুন থেকে রক্ষে পাবে না। এখন তো তারা হাসছে আমাদের কষ্ট দেখে, কিন্তু ঘুঁটে পুড়লে তো গোবর চিরকালই হাসে—

ভৈরববাবু বললেন—তুই কি কম্যুনিস্ট হয়ে গেলি নাকি মা ?

প্রভা বললে—কম্যুনিস্ট হতে যাবো কোন্ দুঃখে ? আমি মুখ ফুটে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথাও বলতে পারবো না ? তা বললেও কমিউনিস্ট হয়ে যাবো ? তাহলে তো সমস্ত বাঙালীই কমিউনিস্ট—আমি দুশো কুড়ি টাকা মাইনে পাই, সেই টাকায় কী করে যে সংসার চালাচ্ছি তা আমিই জানি। এর ওপর একটা অসুখ হলে আমার মুখ দিয়ে যদি কোনো শক্ত কথা বেরিয়েই যায় তো আমি সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট হয়ে গেলুম ?

—কিন্তু তুই তো খবরের কাগজে পড়েছিস মা, গভর্নমেন্টের টাকা নেই, টাকার বড় অভাব—

প্রভা বললে—দেখ বাবা, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। টাকা নেই বলে দিল্লীতে কতগুলো মিনিস্টার পোষা হয়েছে জানো ? তাদের মাইনে কত জানো ? তারা এক-একজন বছরে কত আয় করে তা জানো ?

ভৈরববাবু বললেন—তোর কেবল রাগ ওদের ওপর, আগে নিজেদের দোষটা দ্যাখ্—

হঠাৎ বাইরে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

—মিস চক্রবর্তী আছেন ?

প্রভা বুঝতে পারলে কারা এসেছে। বাবাকে রেখে নিজের ঘরে ঢুকলো। সেখান দিয়ে বাইরের সদরের রাস্তা।

প্রভা বললে—বাবা, আমি তোমার দিকের জানালা-দরজা সব খিল দিয়ে বন্ধ করে দিলুম—

বলে সদর দরজাটা খুলে দিলে। খুলে দিতেই দেখা গেল একদল লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে সামনের দিকে পুলিশের ইউনিফর্ম-পরা নস্কর-বাগান থানার ও-সি। আর তার পাশে সামান্য ঘোমটা-টানা একজন বিধবা মহিলা।

—আপনার নামই কি মিস্ প্রভা চক্রবর্তী ?

প্রভা বললে—হ্যাঁ। কিন্তু আপনাদের সকলকে বসতে দেবার মত জায়গা তো আমার ঘরে নেই, আমার এই একটাই ঘর—

অধীর ব্যানার্জি বললে—আমাদের বসতে দিতে হবে না, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গোটাকতক কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে। আপনি উত্তর দিলে খুশী হবো। আমার নাম অধীর ব্যানার্জি, আমি নস্কর-বাগান থানার ও-সি। আর ইনি হচ্ছেন আগেকার মৃত ও-সি'র স্ত্রী। আমি শুধু আপনার কাছে জানতে চাই এই মহিলার স্বামীকে যে আপনার বাড়ির সামনে খুন করা হয়েছিল, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন ?

প্রভা বললে—হ্যাঁ জানি।

—তা আপনি কি বলতে পারেন কে বা কারা তাঁকে খুন করেছিল ? তাদের নাম কী ? আর তাও যদি না বলতে পারেন তো তাদের চেহারা কেমন তা বললেও আমাকে ইন্‌ভেস্টিগেশন করতে সাহায্য করা হবে—

প্রভা মহিলাটির কাঁদো-কাঁদো মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মহিলাটি তখন চোখ বুঁজে আছে, আর মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে।

বললে—এঁকে মিছিমিছি কষ্ট দিতে এনেছেন কেন ?

অধীর ব্যানার্জি বললে—এঁকে দেখলে হয়ত দয়া হবে আপনাদের মনে, তাই। আমি এতক্ষণ পাড়ার সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। সবাই বললেন কেউই খুনটা স্বচক্ষে দেখেননি। আপনাকেই আমি শেষ জিজ্ঞেস করতে এসেছি—আপনি দেখেছেন কী ?

প্রভা বললে—হ্যাঁ—

অধীর ব্যানার্জির মুখ-চোখে বিস্ময়-আনন্দ কৌতূহল সবকিছু ফুটে বেরিয়ে এল। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি নোট-বইটা বার করে নিলে।

বললে—বলুন, কে খুন করেছে ? কী তার নাম-ধাম-পরিচয়। কী-রকম চেহারা ?

প্রভা বললে—আমি বলবো না।

খানিকটা থতমত খেয়ে গেল অধীর ব্যানার্জি। অবাক হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ মিস প্রভা চক্রবর্তীর মুখের দিকে।

বললে—আপনি বলবেন না ?

প্রভা বললে—না।

অধীর ব্যানার্জি'র যেন তখনও মনে সন্দেহ হচ্ছে। ঠিক শুনেছে তো সে ?

—আপনি সব জেনেশুনেও বলবেন না ?

—না।

—তার মানে ?

প্রভা বললে—তার মানে যা বোঝেন তাই। আপনিও বাঙালী, আমিও বাঙালী, আমি তো বেশ স্পষ্ট বাংলা ভাষাতেই কথা বলছি। আপনার তো বাংলা না বোঝবার কথা নয়।

—কিন্তু আপনি তো জানেন আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারি এর জন্যে ?

—হয়ত পারেন।

আশেপাশের সব লোক চুপ হয়ে শুনছে দুজনের কথা-কাটাকাটি। দেবসুন্দর-বাবু, হেরম্ববাবু, করুণাকান্তবাবু, ভবেশ, নরেশ যারা যারা সেখানে ছিল, সবাই পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

অধীর ব্যানার্জি বললে—হয়ত নয়, সত্যিই আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারি।

প্রভা বললে—তা করুন-না। যদি আপনার সে-ক্ষমতা থাকে তো করুন। আমি তো আপনাকে কোন বাধা দিচ্ছি না—

অধীর ব্যানার্জি বললে—না, আপনি আমার ওপর রাগ করছেন। আমি তো আপনাকে কোনও রাগের কথা বলিনি। আমি সরকারি ডিউটি করতে এসেছি। গভর্নমেন্ট চায় এ-পাড়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে—

—মিথ্যে কথা। গভর্নমেন্ট শান্তি চায় না।

অধীর ব্যানার্জি বললে—আপনি বলছেন কী ? গভর্নমেন্ট শান্তি চায় না ? তাহলে আমাদের মত এত পুলিশ-মিলিটারি-সি. আর. পি. রেখেছে কেন ? কার জন্যে ?

প্রভা বললে—রেখেছে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে ?

—তার মানে ?

—তার মানে, আপনাদের রেখেছে যাতে লাটসাহেব কিংবা মিনিস্টার কিংবা বড়লোকদের গায়ে কেউ হাত না দিতে পারে। যাতে তাদের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি, তাদের প্রপার্টি কেউ ছুঁতে না পারে! আর সত্যিই যদি বাঙলা দেশ শান্তি চাইতো তো গভর্নমেন্ট কি দেশ পার্টিশান করতো ? বাঙলা দেশটাকে ভেঙে দু-ভাগ করতো ?

অধীর ব্যানার্জি বললে—সে-সব তো পুরনো কথা। আমি তখন বলতে গেলে জন্মাইনি। আর গভর্নমেন্ট-স্টাফ হয়ে ও-সব আলোচনা আমার না-করাই উচিত। কিন্তু আজ বাঙলা দেশে যে-সব খুনখারাবি হচ্ছে এরও তো একটা বিহিত করতে হবে। আমার ওপরেই তো তার কিছুটা ভার পড়েছে—

প্রভা বললে—যদি পারেন তো বিহিত করুন—

অধীর ব্যানার্জি বললে—সেই বিহিত করতেই তো আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি। আর এর বিহিত হওয়াও তো দরকার। এ-সব কি আপনিই সমর্থন করেন ?

—করি !

—আপনি এ-সব সমর্থন করেন ? এই মারামারি, কাটাকাটি, বাস-ট্রাম পোড়ানো, এই স্কুল-কলেজে ঢুকে বোমা ছোঁড়া, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ পোড়ানো, আপনি এ-সব সমর্থন করেন ?

প্রভা আবার জোর গলায় বলে উঠলো—করি—

অধীর ব্যানার্জি এবার প্রভার মুখের দিকে আরো ভালো করে চেয়ে দেখলো। সে-মুখে কোনও দ্বিধা, সঙ্কোচ, অস্পষ্টতা, কিছু নেই। গলার আওয়াজটা পর্যন্ত কাঁপছে না।

—সত্যিই আপনি সমর্থন করেন ?

প্রভা বললে—হ্যাঁ, করি, করি, করি—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—কেন করবো না বলুন ? গভর্নমেন্ট আমাদের জন্যে কী করেছে যে, সমর্থন করবো না ? আপনাদের গভর্নমেন্ট আমাদের খেতে দিয়েছে ? পরতে দিয়েছে ? এই বাংলাদেশে এত হাজার রিফিউজি এসেছে, এদের কথা ভেবেছে কখনও ? পাঞ্জাব থেকে যে-সব পাঞ্জাবী রিফিউজি এসেছে, তাদের ফেলে-আসা সমস্ত সম্পত্তির হিসেব করে পরিবার পিছু জমি, বাড়ি, টাকা সবকিছুর জন্যে কোটি-কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে। আর বাংলা-দেশের রিফিউজিদের বেলায় ? তাদের শুধু দিয়েছে ক্যাশডোল। তাদের বেলায় শুধু ভিক্ষে। কোটি-কোটি বাঙালী বাস্তুহারাকে শুধু ভিখিরির জাতে পরিণত করেছে। তবু বলছেন, কেন আমি এই গুণ্ডামি সমর্থন করছি ?

অধীর ব্যানার্জি চুপ।

—কই, চুপ করে রইলেন কেন ? কথা বলুন, উত্তর দিন ? আরো শুনতে চান ? বাংলাদেশের কয়লার কথাই ধরুন। এই কয়লা আমরা বাংলাদেশে বসে যে-দরে কিনি, পাঞ্জাবের লোকেরাও সেই একই দরে পায়। কিন্তু তুলো ? সে-দেশ থেকে যখন তুলো বাংলাদেশে আসে, তখন বাঙালীদের বাড়তি দাম দিতে হয়। কেন ? কয়লার বেলায় এক নিয়ম, আর তুলোর বেলায় বুঝি আলাদা নিয়ম হতে হবে ? এই আপনাদের গভর্নমেন্টের শান্তি চাওয়ার নমুনা ? এতেও বিশ্বাস করতে হবে গভর্নমেন্ট শান্তি চায় ?

অধীর ব্যানার্জি তখনও চুপ। দেবসুন্দরবাবু, হেরম্ববাবু, করুণাকান্তবাবু সবাই যেন কেমন বিহ্বল হয়ে [illegible] রইলেন।

খানিক পরে দেবসুন্দরবাবু [illegible]তে গেলেন—কিন্তু মা, আমার বাড়ির দেয়ালে যে আলকাতরা দিয়ে লিখে···

প্রভা তাঁর দিকে চেয়ে বললে—আপনি চুপ করুন। আপনার সঙ্গে আমি কথা বলছি না, আমি যাঁর সঙ্গে কথা বলছি, তিনিই উত্তর দিন—

অধীর ব্যানার্জি বললে—দেখুন মিস্ চক্রবর্তী, আমি নিজেই একজন

রিফিউজি, আমি সব ব্যাপারটা বুঝি। আমি যতটা বুঝি ততটা আপনিও বুঝবেন না। অনাথা বিধবা মায়ের হাত ধরে যেদিন এখানে আসি, সেদিন চোখে অন্ধকার দেখেছিলুম মনে আছে! কিন্তু গভর্নমেন্ট কিছু ভালো কাজও তো করেছে—

—কী ভালো কাজ করেছে, বলুন?

—এই যেমন জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছে। বাঙলা দেশে জমিদার বলতে আর কিছু নেই।

প্রভা গর্জে উঠলো। বললে—আপনার কত মাইনে মিস্টার ব্যানার্জি?

অধীর ব্যানার্জি উত্তরটা দিতে একটু দ্বিধা করতে লাগলো।

কিন্তু প্রভা তার আগেই বললে—ঠিক আছে, আপনি কত মাইনে পান, তা আমাকে বলতে হবে না। কিন্তু আপনারও তো ফ্যামিলি আছে। আপনি যা মাইনে পান তাতে আপনার স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের আপনি খাঁটি দুধ, টাটকা ফল, ওষুধ-ভিটামিন সবকিছু উচিত মত খাওয়াতে পারেন? আমি আমার কথা বলি। আমি বি. এ. পাশ। এখনকার অনেক বি. এ, এম. এ-র মত টোকাটুকি করে পাশ করা নয়। রীতিমত বই পড়ে পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ। সেই আমি মাইনে পাই দু'শো কুড়ি টাকা। তার থেকে চল্লিশ টাকা ওই করুণাকান্ত-বাবুকে মাসে মাসে দিই। উনি ভালো বাড়িওয়ালা। সকাল-বিকেল আহ্নিক জপ-তপ করেন, ওঁর স্ত্রীও ঠাকুর নিয়েই আছেন সারাদিন। কলকাতায় সবাই তো আর এরকম বাড়িওয়ালা নয়। তা বাকি থাকে কত টাকা, বলুন? একশো আশি টাকা। একশো আশি টাকায় আমি চালাতে পারি? আমার রিটায়ার্ড বুড়ো বাবা পাশের বারান্দায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছেন। ডাক্তার দুধ খেতে বলেছে, টাটকা ফল খেতে বলেছে, ভালো-ভালো ওষুধপত্র প্রেসক্রাইব্ করেছে, তার একটাও খাওয়াতে পারি না। টাকা খরচ করলেও তা পাবার উপায় নেই। এখন তো কন্ট্রোল করার ফলে ওষুধ-ভিটামিন বাজার থেকে প্রায় উড়ে গেছে—

বলে প্রভা একটু দম নিলে যেন।

তারপর আবার বলতে লাগলো—হ্যাঁ, আপনি একটা কথা বলেছেন যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু সত্যি করে ভেবে দেখুন তো, সত্যিই কি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে? গ্রামের জমিদাররা চলে গেছে বটে, কিন্তু নতুন আর এক ধরনের জমিদার-ক্লাসের কি জন্ম হয়নি? এই আপনাদের লালবাজার থানার পুব দিকে যে বিরাট মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং হয়েছে দেখেছেন নিশ্চয়ই? ওই বাড়ির মালিক মাসে কত ভাড়া পায় তা জানেন? সাড়ে ছ' লক্ষ টাকা। তার মধ্যে ইণ্ডিয়া-গভর্নমেন্ট নিজেই একজন ভাড়াটে। ভাড়া দেয় মাসে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা! এইরকম কলকাতায় দিন-দিন কত বিরাট-বিরাট বাড়ি উঠছে। খবর নিয়ে দেখুন গে যে, এরাও নতুন ধরনের এক ক্লাসের জমিদার। তবু বলবেন

জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছে ?

অধীর ব্যানার্জি আমতা আমতা করে বলতে লাগলো—দেখুন ও-সব তো আমার জানবার কথা নয়, আমি তো সামান্য চাকরি করি···

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে হেরম্ববাবুর ছেলে ভবেশ বলে উঠলো—কিন্তু এই তো প্রিভি-পার্স উঠিয়ে দিলে গভর্নমেন্ট। তিনশো মহারাজা একেবারে রাতারাতি যেন পথের ভিখিরি হয়ে গেল। এটাও তো একটা ভালো কাজ করেছে ইন্দিরা গান্ধী···

—আপনি কোথায় চাকরি করেন জানি না। আপনি বোধহয় একজন ক্লাশ-ওয়ান গেজেটেড অফিসার। আপনার কথার উত্তরও আছে আমাদের। একদিকে মহারাজারা যেমন গেল তেমনি আবার আর-একদিক থেকে নতুন-নতুন কত মহারাজা উঠেছেন, সে-খবর রেখেছেন ?

হেরম্ববাবু বললেন—কী রকম ?

—আপনি জানেন কি, দিল্লীর একজন মিনিস্টার কত মাইনে পায় ?

সবাই চুপ করে আছে। কারো মুখে কোন জবাব নেই।

—বছরে চার লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ! এ আমার বানানো কথা নয়। মিস্টার ডান্‌ডেকারের স্টেট্‌মেন্ট পড়ে দেখবেন।

—মিস্টার ডান্‌ডেকার কে ?

—সেকালের আই· সি· এস· অফিসার, আগে ছিলেন ইনকাম্‌ট্যাক্স কমিশনার। এখন পার্লামেন্টের মেম্বার। এটা তাঁর হিসেব। চাকর-আয়া বাগান জল ফার্নিচার আলো সব মিলিয়ে আপনাবাই হিসেব করুন না। এতে তো লুকোচুরি কিছু নেই। এরা কি মহারাজাদের চেয়ে কিছু কম ? অথচ দেখুন উনিশ শো একষট্টি সাল পর্যন্ত এই মিনিস্টারদের সংখ্যা ছিল দু'শো চুরানব্বই আর এই উনিশ শো সত্তরে বেড়ে হয়েছে চারশো পঁচানব্বই। এ কেন বাড়ে ? আগে তাদের পেছনে যা খরচ হতো, এখন এই দশ বছরে তা বেড়ে বেড়ে ডবল হয়েছে। গরীব দেশের আর কিছু বাড়লো না, বাড়লো শুধু মিনিস্টারদের সংখ্যা ? আপনি তবু বলছেন গভর্নমেন্ট শান্তি চায় ?

অধীর ব্যানার্জির মুখ দিয়ে আর কোনও টুঁ শব্দ বেরোল না। আস্তে আস্তে নোট-বইটা আবার সে পকেটে পুরে রাখলে।

তারপর বললে—আপনি তা হলে বলবেন না ?

প্রভা বললে—না, আমার কথাগুলো আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন। শুধু জেনে রাখুন, যারা এই সব করছে তারা গুণ্ডা নয়। আপনার আমার মতই ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে। তাদের কেউ ইনজিনিয়ারিং পাশ, কেউ কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে বি· এস-সি ফার্স্ট ক্লাশ, কেউ পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম· এ, এরা সব লেখা-পড়া জানা ছেলে। বাড়িতেও বাপ-মায়ের কাছে এদের স্থান নেই, গভর্নমেন্টের

চোখেও এরা ক্রিমিন্যাল। তাহলে এরা যাবে কোথায়? আমাকে এত পাষাণ ভাববেন না যে, নাম বলে দিয়ে এদের আমি জেলে পাঠিয়ে দেব—আমি তা পারবো না। আর আপনিও যদি বাঙালী হন, আপনারও যদি সংসার থাকে, ছেলেমেয়ে-স্ত্রী-পরিবার থাকে, আপনিও তা পারবেন না—

তারপর গলা নামিয়ে বললে—এখন যান, যা করবার করুন গিয়ে। পাশের বারান্দায় আমার বুড়ো বাবা অসুস্থ, আমি এখন তাঁকে খেতে দেব। তাঁর খাবার সময় হয়ে গেছে—আমিও চলি—

বলে, সদর দরজাটা তাদের মুখের সামনেই আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিলে।

হেরম্ববাবু দেবসুন্দরবাবুর মুখের দিকে চাইলেন। বললেন—এ কী রকম গেছো মেয়ে রে বাবা, খুব খাসা মেয়ের জন্ম দিয়েছেন ভৈরববাবু—

করুণাকান্তবাবু বললেন—কী-রকম তেজ দেখলেন তো? এইরকম ভাড়াটে নিয়ে আমাকে এতকাল ঘর করতে হচ্ছে—

কিন্তু অধীর ব্যানার্জি কিছুই বললে না। কোথায় যেন তার বিশ্বাসের অস্তিত্বের মূলে গিয়ে একেবারে আঘাত করেছে মেয়েটা। অধীর ব্যানার্জি সারাটা রাস্তা জিপের ভেতর চেপে যেতে যেতে সেই নিজের কথাই ভাবতে লাগলো। কী সে পেয়েছে, আর কী সে পায়নি! জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অভাব-অভিযোগগুলোর কথাও তার মনে পড়তে লাগলো। এতদিন চাকরি করে আসছে, কিন্তু এমন করে কখনও ডিউটি করতে এসে নিজের ভেতরেও তলিয়ে যায়নি। তার একটা মেয়ে। সেই মেয়েটাকেও কি সত্যি সে আর পাঁচজন সম্ভ্রান্ত লোকের মত সম্ভ্রান্ত কোনও স্কুলে পড়াতে পারছে? লালবাজার থেকে যা হুকুম এসেছে তাই তামিল করতে করতেই দিন-রাত কেটে গিয়েছে। অথচ কার কোন্ উপকারটা সে করেছে এই শান্তিরক্ষকের চাকরি নিয়ে? নিজের, পরের, সমাজের মানুষের কোন্ দুঃখটা সে ঘুচিয়েছে? মিস চক্রবর্তীর কথাগুলো যেন তখনও তীরের মত বিঁধছিল তার মনের পর্দায়। সে-সব যেন নতুন করে অধীর ব্যানার্জিকে ভাবিয়ে তুলেছে।

বাড়িতে ঢুকতেই মাধবী বললে—ওগো সর্বোনাশ হয়েছে—

—কি হলো?

—সুনুর তো জন্মদিন আজকে, তাই ওর রুলি-জোড়া পরিয়ে ওকে ইস্কুলে পাঠিয়েছিলুম। কে সে-দুটো খুলে নিয়েছে।

অধীর ব্যানার্জি বললে—সোনার রুলি কখনও ছোট মেয়ের হাতে পরাতে আছে?

মাধবী রাগ করে বলে উঠলো—তা তুমি একটা ভালো ইস্কুলে মেয়েকে পড়াতে পারো না? এখানকার সবাই ইস্কুলের বাসে চড়ে পড়তে যায়। তোমার

একটা মেয়ে, তুমি তাও পারো না ? এই সামান্য টাকাও তুমি মেয়ের জন্যে খরচ করতে পারো না ?

রাত্রে থানার ভেতরে নিজের ঘরে বসে সেই কথাগুলোই কেবল মনের মধ্যে গুঞ্জন করছিল। বাইরে লাল-সাদা জিপটা দাঁড়িয়ে আছে থানার গাড়ি-বারান্দার নিচে। দূরে থেকে মাঝে মাঝে বোমা ফাটার শব্দ কানে আসছে। অন্যদিন এমন সময়ে অধীর ব্যানার্জি গাড়িটা নিয়ে বেবোয়। আজ আর তার বেরোতে ইচ্ছে করলো না। কী হবে বেরিয়ে ? কী হবে ডিউটি করে ? যে নিজের একমাত্র মেয়েকে একটা ভালো স্কুলেও পড়াতে পারে না, তার মুখে আবার এত বড় বড় কথা ! তার আবার ডিউটি ! কীসের ডিউটি সে করবে ?

সুইং-ডোরটার বাইরে যেন কার গলার শব্দ শোনা গেল।

—আমি বড়বাবুর সংগে দেখা করতে চাই—

অধীর ব্যানার্জির ঘরের বাইরে ডিউটি দিচ্ছিল কনস্টেবল ছোট্টুলাল।

সে স্যালিউট্ করে ভেতরে ঢুকলো। বললে—হুঁজুর, একজন বুড়ো-মানুষ আপনার সংগে দেখা করতে চায়—

—ভেতরে নিয়ে আয়—

ভৈরববাবু আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলেন। কিন্তু তাঁকে চেনবার উপায় নেই। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। গায়ে আলোয়ান জড়ানো। সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছেন।

—কে আপনি ?

—আমি থানার বড়বাবুর সংগে দেখা করতে চাই।

অধীর ব্যানার্জি বললে—আমিই বড়বাবু। কী বলবার আছে বলুন ? ওই চেয়ারে বসুন আপনি—

ভৈরববাবু বসলেন। বললেন—আমার নাম শ্রীভৈরব চক্রবর্তী। আমি রায়-পুরে চাকরি করতুম, রিটায়ার করে এখন মেয়ের কাছে এসে উঠেছি। আমার মেয়ের নাম প্রভা, বারো-নম্বর নস্কর-বাগান লেনে থাকে।

অধীর ব্যানার্জি প্রভার নাম শুনে এবার সোজা হয়ে বসলো।

বললে—আমি তো আজকে সকালে আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলুম—

ভৈরববাবু বললেন—হ্যাঁ, আমি তা জানি। কিন্তু পাছে আমি আপনার সংগে কথা বলি তাই আমার মেয়ে আমার ঘরের বারান্দার দিকের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছিল।

—তা এত রাত্তিরে এখন আপনার কী দরকার পড়লো ?

ভৈরববাবু বললেন—দেখুন, আমি এখানে লুকিয়ে এসেছি। মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি সেই ফাঁকে চুপি-চুপি বেরিয়ে এসেছি। মেয়ে জানে না।

—আপনার শরীর খারাপ বুঝি ?

—হ্যাঁ, আমি নস্কর-বাগানের পার্কে দাঁড়িয়ে দু'একজনকে দু'চারটে কথা শোনাচ্ছিলুম, হঠাৎ আমার মাথার ওপর কারা থান-ইঁট ছুঁড়ে মারে। তারপরেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমার মেয়ে আমাকে এতদিন বাড়ি থেকে বেরোতে দিত না। আজ প্রথম বেরিয়েছি। না-বেরিয়ে পারিনি বলেই বেরিয়েছি। বলতে পারেন প্রাণের দায়েই বেরিয়েছি—

—প্রাণের দায় মানে?

ভৈরববাবু বললেন—বাঙলাদেশ তো আমার প্রাণের চেয়েও বড় মশাই। সেই দেশ এমন গোল্লায় যাবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। সেই দেশের ছেলেরা বাসে-ট্রামে উঠে ভাড়া দেবে না, বাস পুড়িয়ে দেবে, আবার গান্ধী-বিবেকানন্দ-সুভাষ বোসের অপমান করবে, এটা আমি সহ্য করি কী করে বলুন?

অধীর ব্যানার্জি ভালো করে দেখতে লাগলেন ভৈরববাবুকে। যার মেয়ে কিনা অত কথা শোনালো, সেই তারই বাপ এমন?

ভৈরববাবু বললেন—আমি বুড়ো মানুষ, তার ওপর অসুস্থ, কী বলতে কী বলে ফেলবো, তাতে কিছু মনে করবেন না। উনিশ শো চল্লিশ সালের দশ'ই মে তারিখে জার্মানীর হিটলার একদিন রাত তিনটের সময় হল্যান্ড আক্রমণ করেছিল, তা জানেন আপনি?

—হ্যাঁ, পড়েছি—

ভৈরববাবু বলতে লাগলেন—আমিও খবরের কাগজে পড়েছি। তা সেই সময় যখন হল্যান্ড লড়াই করবার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন হঠাৎ সমস্ত দেশের ইলেকট্রিক লাইট্ নিবে গেল। সে একেবারে বিপর্যয় কাণ্ড। কী হলো, কী হলো রব উঠলো চারদিকে। এ কার কাজ? এ ফিফথ্ কলাম্নিস্ট কেউ? কে এই দেশের শত্রুতা করলে? খোঁজ খোঁজ, খুঁজে বার কর—

বাইরে ছোট্টুলাল সব শুনতে লাগলো। তারপর আর সেখানে দাঁড়ালো না। একটা সাইকেল নিয়ে পাঁই-পাঁই করে দৌড়ুলো উত্তর দিক বরাবর।

তারপর অন্ধকার হাতড়ে একেবারে রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের বস্তিতে গিয়ে পৌঁছুলো। তারপর একটা দরজার সামনে গিয়ে ডাকলে—সমরদা, সমরদা—

খট করে দরজাটা খুলে গেল।

সমর বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো।

—কী রে ছোটু, কী খবর?

—সর্বোনাশ হয়েছে সমরদা। একজন থানায় এসে সব ফাঁস করে দিয়েছে। এখনও থানায় আসামী বসে আছে। বড়বাবুকে সব ফাঁস করে দিচ্ছে! এখখুনি চলো—

সমর বললে—জোয়ান না বুড়ো?

ছোট্টুলাল বললে—মুখ দেখতে পাইনি, আগাগোড়া আলোয়ান ঢেকে এসেছে—

শুধু সমর নয়, আরো অনেকে সঙ্গ নিলে। হাত-বোমা, ছোরা, গুপ্তি, সব আলোয়ানের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল।

সমর বললে—তুই সাইকেলে করে আগে আগে গিয়ে ঘাঁটি আগ্‌লা গে, যা—

ছোট্টুলাল যেমন এসেছিল, আবার তেমনি পাঁই-পাঁই করে সাইকেলে চড়ে চলে গেল। সে আগে গিয়ে মওড়া নেবে।

বড়বাবুর ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে ভৈরববাবু তখনও কথা বলে যাচ্ছিলেন।

অধীর ব্যানার্জি বললে—কিন্তু আপনার মেয়ে যে অন্য কথা বললে?

ভৈরববাবু বললেন—আমার মেয়ে বলুক গে। আমার মেয়ে কী বোঝে! ওর তো মা ছিল না। আমিই ওকে ছোটবেলা থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। আমার চেয়ে আপনি ওকে বেশি চেনেন?

—কিন্তু মিস চক্রবর্তী যে কথাগুলো বললে তাও তো মিথ্যে নয়! এই আমারই ব্যাপার দেখুন না, আমি এ-থানার ও-সি, আমি কত মাইনে পাই? আমার একমাত্র মেয়েকেও আমি ভালো ইস্কুলে ভর্তি করতে পারিনি। অথচ দেখুন বড় বড় লোকদের ছেলে-মেয়েরা ইংরাজি স্কুলে পড়ছে। জহরলাল নেহরুর নাতিরাও তো সব ইংলন্ডে মানুষ হয়েছে। আমরা গরীব বলেই কি আমাদের এত দুর্গতি?

ভৈরববাবু বললেন—আমি তো বলছি আপনাকে, ওর কথা শুনবেন না। আমাদের এ দেশ ধর্মের দেশ। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর দেশ। রামমোহন, পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, সুভাষ বোসের দেশ। এ হলো ত্যাগের দেশ। এ দেশে পাপী-তাপীর ধ্বংস করতে যুগে যুগে অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমরা কেবল কর্তব্য করে যাবো। কর্ম করে যাবো। কর্মফলের ওপর আমাদের কোনও অধিকার নেই। সততা সত্যবাদিতা এইসবের ওপর ভিত্তি করেই আমাদের দেশ গড়ে উঠেছে। আপনি ওর কথায় কান দেবেন না। আপনার ওপর যে কর্তব্য ন্যস্ত আছে, তাই-ই করে যান। দেখবেন, তাতে আপনার ভালো হবে, তাতে সকলের ভালো হবে, তাতে এই হতভাগ্য দেশেরও ভালো হবে—

অধীর ব্যানার্জি বললে—কিন্তু আপনি তো বলছেন এ-সব কথা—এ-সব খুবই ভালো কথা। বইতে এ-সব কথা ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে। আমিও পড়েছি। কিন্তু আজকে গুন্ডা বলে যাদের ধরছি তারাই যদি আবার কাল জাল ভোটে জিতে মিনিস্টার হয়, তখন? তখন যে আমাদেরই ওপর যত চাপ পড়বে।

ভৈরববাবু বললেন—কিন্তু মহাপুরুষদের বাণী কি তাহলে মিথ্যে হবে বলতে চান দারোগাবাবু ?

অধীর ব্যানার্জি বললে—আপনারা সে-কালের মানুষ, সে-কালের রীতি-নীতি ধর্ম-অধর্ম মেনে চলছেন। যখন মহাপুরুষরা ও-সব বাণী লিখে গেছেন, তখন তো ভোট ছিল না। এ-ভোট যে কী ভয়ানক বস্তু তা তো আপনি জানেন না ভৈরববাবু। নামে এটা 'সিক্রেট'। আসলে সবাই জানতে পারে, কে কাকে ভোট দিলে। তাতে আমাদেরই হয়েছে বিপদ—

—কেন ? বিপদ কেন ?

—সে আপনি বুঝবেন না। সে কেউই বোঝে না। আজকে গুন্ডামির অপরাধে যদি কাউকে অ্যারেস্ট করি, কাল যখন সে আবার মিনিস্টার হবে তখন আমার চাকরি নিয়েই টানাটানি করবে। এখন খুন করলেও কাউকে আমরা হঠাৎ অ্যারেস্ট করতে পারি না।

ভৈরববাবু বললেন—তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী হবে ?

—কী হবে তা আপনি কল্পনা করে নিন! আমি যদি অনেস্ট হই তো আমার ফ্যামিলিকে উপোস করতে হবে ; আর নয়তো আমি খুন হবো—

ভৈরববাবু বললেন—তাহলে এই যে আমি এত রাত্রে জ্বর নিয়ে আপনার কাছে এলুম, আপনি এর কোনও প্রতিকার করবেন না ?

—না।

—আমি তার নাম বলছি, তার চেহারার বর্ণনা দিচ্ছি, তবু তাকে আপনি অ্যারেস্ট করবেন না ?

—আপনি তার নাম জানলেন কী করে ?

—আমি যে শুনেছি আমার বাড়িতে। অনেক রাত্রে যখন আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তারা আমার মেয়ের কাছে আসে। আমার মেয়ে তো তাকে 'সমর' বলে ডাকে। মাঝে-মাঝে দু'চারটে করে টাকা দেয়। দেখেছি হলদে সার্ট, আঁট প্যান্ট, লম্বা জুলফি···

অধীর ব্যানার্জি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বললে—আপনি বাড়ি যান ভৈরববাবু, অনেক রাত হয়ে গেল। আপনার মেয়ে যদি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে তো জানতে পারবে আপনি থানায় ডায়েরি করতে এসেছেন—

ভৈরববাবু রেগে গেলেন। বললেন—জানতে পারুক গে। আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি ? মেয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে এসেছি, তার কারণ মেয়ে জানতে পারলে আমাকে ঘরে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখতো। কিন্তু তা বলে সত্যি কথা বলতে কি আমি ভয় পাবো ভেবেছেন ? আমার জীবন বড় না সত্য বড় ? 'সত্যে'র জন্যে আমি জীবন দিতে পারি, তা জানেন ?

অধীর ব্যানার্জি বললে—আপনি পারেন কিন্তু আমি পারি না। আমি সাধারণ গৃহস্থ মানুষ। আমার বউ-মেয়ে আছে, আমায় চাকরি করে খেতে হয়—

—তাহলে কিন্তু কালই আমি আপনার ওপরওয়ালার কাছে যাবো। আপনার পুলিশ কমিশনারের কাছে যাবো লালবাজারে—সেখানে গেলে নিশ্চয়ই এর প্রতিকার হবে—

অধীর ব্যানার্জি বললে—ভুল কথা। তিনিও গৃহস্থ মানুষ। তাঁরও বউ, ছেলেমেয়ে আছে, তাঁকেও চাকরি করে খেতে হয়, তাঁকেও চাকরির প্রমোশনের কথা ভাবতে হয়। আবার যখন ভোট হবে, তখন আবার কোন্ পার্টি হোম মিনিস্ট্রি পেয়ে যাবে তা ভেবে কাজ করতে হয়।

—তাহলে আমি কার কাছে যাবো? কার কাছে গিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার চাইবো?

অধীর ব্যানার্জি বললে—আমাদের কেউ নেই ভৈরববাবু, আমরা অসহায়, হেলপ্‌লেস—

—তাহলে কি বাঙালী জাত মরে যাবে? রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের জাত এমনি করেই ধ্বংস হবে?

—আমাদের মুখে তাঁদের মত মহাপুরুষের নাম উচ্চারণ করাও পাপ। মহাপাপ। দয়া করে বার বার ওঁদের নাম আর উচ্চারণ করবেন না। আপনি বাড়ি যান—

ভৈরববাবু ভালো করে মাথায় গায়ে আলোয়ানটা জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন।

রাস্তায় আসতে আসতে তাঁর মনে হলো, সত্যিই বোধহয় দেশটা গোল্লায় গেল। বিদ্যাসাগরমশাই শেষের দিকে বলে গিয়েছিলেন—'এ পোড়া বাংলাদেশের আর কোনও আশা নেই, এ-জাত গোল্লায় গেল।' আজ ভৈরববাবুরও তাই মনে হলো। একটা সত্যি কথা বলার সাহস নেই কারো, সত্যবাদিতাও চলে গেল! তাহলে আর রইলটা কী? বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সুভাষ বোস তাঁরা সবাই মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। এই অধঃপতন তাঁদের আর চোখে দেখে যেতে হয়নি।

রাত অনেক হয়েছে। নস্কর-বাগান থেকে এমনিতেই কেউ সন্ধ্যের পর পারতপক্ষে রাস্তায় বেরোয় না। তার ওপর এখন রাত কত হয়েছে কে জানে! আসবার সময় ভৈরববাবু প্রভার ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসেছেন। আবার গিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঢুকতে হবে। তারপর প্রভা জানতে না পারে এমন ভাবে দরজায় খিল বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু মনটা তবু বিক্ষিপ্ত হয়ে রইল। শুধু যে অন্যায় করে সে-ই নয়, অন্যায় যে সয় সে-ও তো সমানভাবেই অপরাধী। পাড়ায় এতগুলো লোক রয়েছে

তবু কারো সত্যি কথা বলবার সাহস নেই। তাঁর শরীর খারাপ না হলে তিনি তো আগেই গিয়ে পুলিশের সামনে গুণ্ডাদের নাম-ধাম বলে দিতেন। নস্কর-বাগান লেনে কি একজনও সৎ মানুষ নেই?

—কে?

কিন্তু 'কে' কথাটা তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবার আগেই কারা যেন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেছেন। তখন আর জ্ঞান নেই তাঁর।

ঌ ঌ ঌ

—প্রভাদি, প্রভাদি—

চুপি-চুপি গলায় ডেকেছে যাতে বাইরের লোক কেউ শুনতে না পায়। কিন্তু যাকে ডাকা সে ঠিক শুনতে পেয়েছে। ধড়মড় করে জেগে উঠেছে প্রভা। আবার বোমার ঘা লেগে কেউ মরেছে নাকি?

—প্রভাদি, আমি সমর, তোমার দরজা খোলা কেন?

তাইতো! সদর দরজাটা বন্ধ করেই তো সে শুয়েছিল। খুললে কে?

সমর হঠাৎ বলে উঠলো—আমাকে তুমি ক্ষমা করো প্রভাদি, আমি খুব অন্যায় করে ফেলেছি—

ভোলা, কার্তিক তারাও তখন মাথা নিচু করে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মুখের দিকে চেয়ে প্রভা অবাক হয়ে গেল। অন্ধকার ঘর। বাইরে রাস্তার গ্যাসের আলোয় তাদের চেহারাটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। সবাই যেন কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে।

প্রভা বললে—কী হলো রে তোদের? ক্ষমা করবো কী জন্যে?

—দাদুকে খতম করে দিয়েছি প্রভাদি। আমি চিনতে পারিনি। ছোট্টুলাল আমাকে বলেছিল···

—কী বলেছিল? শিগ্‌গির বল?

—বলেছিল কে একজন থানায় গিয়ে বড়বাবুকে আমাদের নাম-ধাম বলে দিচ্ছে। তাই শুনেই তো দৌড়ে গেলুম। তখন আর ভাববার সময় ছিল না।

প্রভা একটা চাদর জড়িয়ে নিলে গায়ে। বললে—চল্, দেখি কোথায় বাবা—

সমর, ভোলা, কার্তিক তারা আগে আগে চললো। নস্কর-বাগান লেন তখন আরো জনশূন্য। রাস্তার আলোগুলো কুয়াশার ঘেরাটোপ প'রে আরো ঝাপসা হয়ে গেছে তখন। প্রভার মনে হলো যেন সমস্ত কলকাতাটা একটা অনন্ত বিস্তৃত সাদা মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে। আর সেই মরুভূমির মধ্যে যেন মাঝে-মাঝে জেগে উঠছে একটা মৃগতৃষ্ণিকা। আশার, ভবিষ্যতের আর সূর্যোদয়ের

মৃগতৃষ্ণিকা। এই কলকাতা, এই বাংলাদেশ অনেকদিন ধরেই ধুঁকছিল। মুমূর্ষুর মত মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে শেষ প্রহরের জন্যে মুহূর্ত গুনছিল। আজ বুঝি সেই মুহূর্ত গোনা তার শেষ হলো। চাদরের ঘোমটাটা টেনে নিয়ে একবার আকাশের দিকে চাইলে সে। আকাশের এককোণে ধ্রুবতারাটা তখন জ্বলজ্বল করছে। জ্বলজ্বল করে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে এদের মুখের দিকে। যেন বলছে—'অমৃতের সন্তান' কথাগুলো সমস্ত মিথ্যে। ও-সব ঋষি-মহাঋষিদের স্তোক-বাক্য। ও-সব কথায় তোমরা ভুলো না। এটা বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ।' ওরা আজ বিজ্ঞান দিয়ে যুক্তি দিয়ে আমার পেছনেও ধাওয়া করতে আসছে। আজ বিজ্ঞানই সত্য, ঋষি-বাক্য মিথ্যে। উপোসী মানুষের কাছে আবার শাস্ত্রের উপদেশ কী? সে তো উপহাসেরই নামান্তর। তোমরা বুভুক্ষু মানুষ, তোমরা বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ পরমহংসদেবের কথা শুনো না। সবার উপরে মানুষ সত্যি। শুধু মানুষ সত্যি তা-ই নয়। সেই মানুষের ষোল আনাই সত্যি। তার স্বপ্ন সত্যি, তার ক্ষুধা সত্যি, তার বিলাসিতা সত্যি, তার হিংসে, ক্রোধ, লোভ, মোহ, কাম সবটুকুই সত্যি।

—ওই যে ওখানে!

সেই ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যেই স্পষ্ট দেখা গেল বাবার মৃতদেহটা মাঝ-রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে নস্কর-বাগান লেন। রক্তটা গড়িয়ে গড়িয়ে যেন একটা ইন্ডিয়ার ম্যাপ তৈরি করে চলেছে।

সমর, ভোলা, কার্তিক—তাদের মুখেও তখন আর কথা নেই। যেন কথা বললেও তাদের প্রভাদি আঘাত পাবে। অথচ অন্য সময়ে—।

প্রভাদি আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে সেই রাস্তার ওপরেই বসলো। বাবার হাতটা হাতে তুলে নিলে। ঠাণ্ডা কঠোর স্পর্শ। ভোলাদের অস্ত্রগুলো তাদের অব্যর্থ আঘাত হেনেছে। এতদিন পর্যন্ত যা ঘটেছে, এবারও তাই ঘটলো। এবারেও তাদের সন্ধান ব্যর্থ হয়নি। ভৈরববাবুর প্রাণের অস্তিত্বের ক্ষীণতম চিহ্নটুকু পর্যন্ত অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

একটা প্রচণ্ড নেশায় যেন প্রভাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো কিছুক্ষণ। বাবা আর নেই! কিন্তু প্রভার মনে হলো বাবা যেন আছে। বাবা যেন বলছে—ও রে, আমি যে অনেক সাধ নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম—বিদ্যা-সাগর, পরমহংসদেব, বিবেকানন্দের দেশে এসে শেষজীবনটা কাটাবো, এখানকার মাটিতেই মরবো। কিন্তু এ কী হাল হয়েছে মা আমার সাধের বাংলাদেশের! আমার যে কান্না পাচ্ছে মা। বাসে-ট্রামে কেউ ভাড়া দেয় না, ভালো কথা শোনালে মাথায় লাঠি মারতে আসে, গুরুকে গুরুর সম্মান দেয় না, বড়কে ছোট করে এরা আনন্দ পায়···

অনেক দিন আগে উনিশশো চল্লিশ সালে এমনি ঘটনাই ঘটেছিল হল্যান্ডে।

হার মজেস্টির গভর্নমেন্ট তখন ভাবনায় অস্থির। হঠাৎ আলো নিভে গেল মা। সব অন্ধকার হয়ে গেল। সবাই বেরোল খোঁজ করতে। কে আলো নিভোলে? কে এমন দেশের দুশমন! বাইরের শত্রু যখন দেশে হামলা সুরু করেছে তখন কে এই দুশমনি করলে?

—তারপর বাবা, তারপর?

—ওরে, আমিও তো বার বার তাই বলি। তোরা বলিস এখানে অনেক সমস্যা, অনেক অত্যাচার। কিন্তু আমি বলি, সমস্যা লক্ষটাও নয়, হাজারটাও নয়। এমনকি দশটাও নয়, পাঁচটাও নয়। সমস্যা ওই একটাই। সেই একটা সমস্যাতেই আমরা ধ্বংস হয়ে গেলুম মা। তা দেখা গেল, পাওয়ার-হাউসের মেশিনে একটা যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে—

—কী, সেটা কী বাবা?

—একটা ছোট্ট স্ক্রু। আমাদেরও ওই একটাই সমস্যা মা, আমাদের সমাজেরও একটা স্ক্রু হারিয়ে গেছে। আমাদের স্ক্রুই হলো আমাদের চরিত্র। আমরা আমাদের চরিত্রই হারিয়ে ফেলেছি—

ভোরবেলা থানার একজন কনস্টেবল দৌড়তে দৌড়তে থানায় গিয়ে পেঁছেছে।

—হুজুর, আর একটা খুন!

—কোথায়?

—নস্কর-বাগান লেনে।

বড়বাবু রিভলবারটা নিয়ে আবার দৌড়লো।

কিন্তু বাড়িতে দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যে প্রভা তখন নিজের বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে হাউ-হাউ করে নিঃশব্দে কাঁদছে। সমর, ভোলা, কার্তিক তারাও এতক্ষণ ছিল।

সমর বললে—আমাদের তুমি ক্ষমা করো প্রভাদি, আমরা ভুল করেছি, বুঝতে পারিনি। চিনতে পারিনি—

—না, তোরা ভুল করিসনি, ঠিক করেছিস—

ওরা চলে যেতেই প্রভা ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে বিছানার ওপর ভেঙে পড়েছিল।

সেদিনও সন্ধ্যেবেলা যথারীতি রেডিও বাজতে সুরু করলো। নস্কর-বাগান লেনের বাইরে যা-ই ঘটুক, ভেতরে তখনও ঘরে-ঘরে সবাই রেডিওতে কান পেতে রয়েছে। শুধু ভৈরববাবুই নেই। দেবসুন্দরবাবু, করুণাকান্তবাবু, হেরম্ববাবু,

সকলেরই মনে পড়তে লাগলো ভৈরববাবুর কথাগুলো। ভৈরববাবু বলতেন, প্লেটো বলে গেছেন—The punishment that the wise and good men of a country, who decline to take interest in the affairs of their country, must suffer—is to be gladly ruled by the rest, viz. fools and knaves.

হঠাৎ রেডিওতে ঘোষণা হলো—এতক্ষণ আপনারা হিন্দী ফিল্ম-সংগীত শুনছিলেন। এবার শুনুন উচ্চাঙ্গ-সংগীতের খেয়াল—রাগ ভৈরব—

সেদিন সন্ধ্যের পর থেকেই নস্কর-বাগানে কারফিউ জারি হয়ে গেল।

চলো কলকাতা

চলো, কলকাতা চলো।

চলো, চলো, কলকাতা চলো!

আদিযুগে লোক কলকাতায় আসতো অন্য কারণে। তখন কলকাতা মানেই ছিল কালীক্ষেত্র। এই কালীক্ষেত্রের কালীদেবী প্রথমে ছিল পাথুরিয়াঘাটাতে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লেখা আছে—

"ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান দুইকুলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট, দুকুলে যাত্রীর নাট, কিংকরে বসায় নানা হাট॥"

পাষাণে রচিত ঘাট মানেই পাথুরিয়াঘাট। তখনকার দিনে এখনকার স্ট্র্যান্ড রোড ছিল গঙ্গার জলের তলায়। কবিকঙ্কণ তাঁর চণ্ডীতে ওই ঘাটের কথাই উল্লেখ করেছেন। দরমাহাটা স্ট্রীটে ঠিক পানপোস্তার উত্তর দিকে দেবীর মন্দির ছিল। সেখান থেকে কাপালিকেরা দেবীকে আরো নির্জন জায়গা খুঁজে কালি-ঘাটে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করে। তখনকার দিনে কাপালিকদের সবাই ভয় করতো। তারা মন্দিরের দেবীর সামনে নরবলি দিত। কারো ক্ষমতা ছিল না তার প্রতিবাদ করে। নরবলি না দিলে কাপালিকদের পুজো নিয়ম-সিদ্ধ হতো না, কাপালিকদের সাধনা পূর্ণাঙ্গ হতো না।

এখন আর সে-যুগ নেই। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। কলকাতাতে আর কাপালিক নেই। শুধু কলকাতা কেন, সারা বাঙলাদেশ খুঁজলেও আর একটা কাপালিককে দেখতে পাওয়া যাবে না। তাদের অস্তিত্ব চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়ে গেছে কলকাতার বুক থেকে।

কিন্তু না, আসলে সেই সে-যুগের সব কিছুই আছে। কিছুই বদলায়নি। সেই কালীক্ষেত্রও আছে, সেই কালীদেবীও আছে, সেই কাপালিকও আছে। কালীক্ষেত্রের কাপালিকেরা আজও ঠিক তেমনি করেই মন্দিরের দেবীর সামনে নরবলি দেয়। তেমনি করেই কাপালিকেরা নরবলি দিয়ে তাদের পুজো নিয়ম-সিদ্ধ করে। তাদের সাধনা পূর্ণাঙ্গ করে। শুধু তাদের বাইরের পোশাক বদলেছে, তাদের নাম বদলেছে।

আর যাত্রীরা?

আগে যাত্রীরা আসতো আশেপাশের জনপদ থেকে। আসতো অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ থেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। আর এখন যাত্রীরা আসে ইংলন্ড থেকে, রাশিয়া থেকে, আমেরিকা থেকে। সব যাত্রীরাই আসে কলকাতায়। কলকাতায় না এলে বুঝি কারোর চলে না। এখানে না এলে বুঝি কারো পুজো নিয়ম-সিদ্ধ হয় না, কারো সাধনা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

আর আশ্চর্য, আজও এই কলকাতার কালীক্ষেত্রেই প্রতিদিন নরবলি হয়।

একটার পর একটা নরবলি। নরবলির নৈবেদ্য না পেলে কালীক্ষেত্রের দেবীর রসনা বুঝি তৃপ্ত হয় না। কাপালিকদের পুজো বুঝি নিয়ম-সিদ্ধ হয় না, কাপালিকদের সাধনা বুঝি পূর্ণাঙ্গ হয় না।

তাই চলো, কলকাতা চলো।

চলো চলো, কলকাতা চলো।

ওরা ওদিক থেকে আসছিল, আর এরা এদিক থেকে। সমস্ত কলকাতাটা ছড়িয়ে রাস্তা পড়ে আছে। যে যেদিক থেকে পারো চলতে পারো, সকলের সব জায়গায় যাবার এক্তিয়ার আছে। ওরাও তাই চলেছে।

রাত থাকতে উঠেছে ওরা। কোথায় সেই ধাব্-ধাড়া জয়চণ্ডীপুর, আর কোথায় এই কলকাতা।

—জায়, কালী মাঈকী জায়!

বুধবারির মানত ছিল কালিঘাটে। হে কালী মাঈ, আমার যদি এবার ছেলে হয়, তোমার কাছে পাঁঠা-বলি দেব মাঈজী, তোমার পুজো দেব, পরসাদ খাবো—

তা পাঁঠার দামও আজকাল বেড়েছে খুব। বুধবারির বাবা হরবনস্‌লাল যখন চল্লিশ বছর আগে বলির জন্যে পাঁঠা কিনেছিল, তখন একটা ছোট মাপের পাঁঠার দাম ছিল তিন টাকা। সেই তিন টাকা বাড়তে বাড়তে এখন একেবারে কুড়ি টাকায় এসে ঠেকেছে।

বুধবারি সেই পাঁঠাটা নিয়েই জয়চণ্ডীপুর থেকে ট্রেনে উঠেছিল। ছোট ট্রেন, ম্যাচবাক্সের মত চেহারা। তবু জয়চণ্ডীপুর থেকে ইস্টিশান পাকা তিন ক্রোশ রাস্তা। তিন ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসে তবে ট্রেন ধরতে হয়েছে। বুধবারির মা আগের রাত্রে জোয়ারের রুটি করে রেখেছিল। সেই রুটি খেয়েছে বুধবারি, বুধবারির বউ, আর বুধবারির মেয়ে।

বুধবারির বউটা মাথা-আলগা মানুষ। মাথায় কোনও কথা থাকে না। কোনও কথা নেই, বার্তা নেই, মেয়েটাকে ধরে বে-ধড়ক মারে।

বলে—ধাড়ি মেয়ে, বিয়ে দিলে অ্যাদ্দিন চারটে ছেলে পয়দা হতো, এখনও ক্ষিধে পেলে কাঁদে—চুপ রহো—

দলের সঙ্গে মেয়েটাও আছে। সামনে চলেছে বাপ। তার কাঁধের ওপর পাঁঠাটা। দু'হাতে পাঁঠাটার দু'দিকে ধরে আছে। পালিয়ে না যায়। তার পেছনে রাঙিয়া। বুধবারির বউ। রাঙিয়া ধরে রেখেছে মেয়েটার একটা হাত। আর সকলের শেষে বুধবারির মা। বুড়ো মানুষ। চলতে চলতে একটু পেছনে পড়ে গেছে, কিন্তু বুড়ী চলছে ঠিক।

হাওড়া ময়দানে এসে ট্রেন থেকে নেমেছিল সবাই। তারপর থেকেই হাঁটা। সামনেই গঙ্গার ওপর হাওড়ার পুলটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তার নিচেয় গঙ্গা।

বুধবারি পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে। মা ঠিক আসছে তো! তারপর একবার

রাঙিয়ার দিকে চেয়ে দেখলে। তারপর দুখিয়ার দিকে।

মা হাঁটতে পারছে না। রাস্তায় মানুষের ভিড়। জয়চণ্ডীপুরের মানুষ হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে এসে যেন হকচকিয়ে গেছে। খোলা হাওয়ার দেশ থেকে একেবারে শহরের ভিড়ের মধ্যে!

বুধবারি চেঁচিয়ে বললে—খুব হুঁশিয়ার, এ শহর কলকাত্তা—বহুত হুঁশিয়ার মাঈয়া—

মা-ও চোখ মেলে দেখছে কলকাতা শহরকে। তিরিশ-চল্লিশ সাল আগে আর একবার এসেছিল মা এই শহরে। এই শহর কলকাতায়। তখন বুধবারির বাপ বেঁচে ছিল। সেবারও একটা বখ্‌রি নিয়ে এসেছিল কালিমন্দিরে পুজো দিতে।

বুধবারির বাপ বলতো—গরীব ঢোঁড়ে খানা ঔর আমীর ঢোঁড়ে ভুখ—

বুধবারির মা কথাটার মানে বোঝেনি, বুধবারির বাবা হরবনস্‌লাল মানেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। গরীব লোকের খাবার খুঁজতে খুঁজতেই জীবন কেটে যায়, আর বড়লোক কেবল ক্ষিধে খোঁজে। আজ এই বড়লোকের শহর কলকাতার দিকে চেয়ে চেয়ে তাই দেখছিল বুধবারির মা। এখানে সবাই বড়লোক, সবাই আমীর! কিন্তু চল্লিশ সাল আগেকার কলকাতার সঙ্গে যেন আজকের কলকাতার কোনও মিল নেই। গঙ্গাজীর মাথার ওপর এই লোহার পুলটা তখন ছিল না।

বিরাট একটা বাসগাড়ি হাতীর মত একেবারে সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

বুধবারি হাঁ-হাঁ করে উঠলো—হাঁ-হাঁ-হাঁ—সামাল্‌কে—সামাল্‌কে—

কী ভাগ্যিস, একটুখানির জন্যে বুড়ী রেহাই পেয়ে গেছে।

—আমি তোকে বললাম এ কলকাতা শহর, একটু সামলে চলবি, এখখুনি তো বাসগাড়ি তোকে চাপা দিয়ে দিত বুঢ়িয়া। তখন দাঁত বার করে মরে যেতিস, বেশ হতো—

বুধবারির মা সত্যিই সামলে নিয়েছে। বললে—জানিস বুধবারি, তোর বাপ কী বলতো জানিস? বলতো গরীব ঢোঁড়ে খানা ঔর আমীর ঢোঁড়ে ভুখ—

বুধবারি রেগে গেল—রাখো তোমার বয়েত, একটু সামলে চলো—

তারপর বুধবারি এক কাজ করলে। কাঁধ থেকে পাঁঠাটা নামিয়ে গামছাটা দিয়ে ভালো করে তার গলাটা বেঁধে ফেললে। তারপর নিজের ধুতির খুঁটটা দিয়ে বউ-এর শাড়ির খুঁটের সঙ্গে বাঁধলে। বউ-এর শাড়ির খুঁটের সঙ্গে আবার মেয়েটার হাতের কবজি বেঁধে তার সঙ্গে মায়ের শাড়ির খুঁটটাও বেঁধে ফেললে। এইবার আর হারিয়ে যাবার যো নেই কারো। এইবার বুধবারি নিশ্চিন্ত! পাঁঠাটার পা-চারটে দু'হাতে জড়িয়ে করে ধরে আবার চলতে লাগলো বুধবারি—জায় কালী মাঈকী জায়। জায় বজরঙওয়ালী কালী মাঈকী—জায়!

এতক্ষণে হাওড়ার পুল পেরিয়ে বুধবারির দলটা বড়বাজারের মোড়টার কাছে

এসে পড়েছে, ওদিক থেকে একদল হাওয়া-গাড়ি আসছে, আর এদিক থেকে আর একখানা ট্রাম-গাড়ি। মাঝখানে পুলিশ-পাহারা দাঁড়িয়ে আছে।

হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ—

হঠাৎ সবাই হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে। রোখ্‌কে! রোখ্‌কে! হুঁশিয়ার!

—কাঁহাকা গেঁইয়া আদমি হো তুম?

—আরে এরা যে রাস্তা চলতে পারে না, গেঁয়ো-ভুত এসেছে শহরের রাস্তায়। কাঁধে আবার একটা পাঁঠা বয়ে নিয়ে চলেছে!

—না হে, আজকের দিনে ওরাই হলো গিয়ে খাঁটি মানুষ হে, ওদের গেঁয়ো মানুষ বললে আমাদের নিজেদের গালাগালি দেওয়া হয়—

রাস্তায়-বাসে-ট্রামে কত রকম মানুষ, কত চরিত্রের জগাখিচুড়ি। ভালো-মন্দ-সাধারণ-অসাধারণের জড়াজড়ি নিয়ে জগৎ। ওরা যাচ্ছে অফিস-কাছারিতে টাকা উপায়ের কাজে। ওদেরই বা দোষ কী! কেউ টাকা উপায় করতে যাচ্ছে, কেউ নাম উপায় করতে। আবার কেউ বা মা-কালীর প্রসাদ। সেই যে একদিন আদি যুগ থেকে সুরু হয়েছিল অনাদি যাত্রা! একদিন পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে যাত্রা সুরু করেছিল ওরা এশিয়া মাইনর থেকে। এশিয়া মাইনর না সেন্ট্রাল এশিয়া? না, তারও আগে মানুষ ছিল। দশ হাজার বছর আগেও মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বুধবারিরা জয়চণ্ডীপুর থেকে হাঁটতে সরু করেছিল। কিন্তু বুধবারির বাবা হরবনস্‌লাল জয়চণ্ডীপুরের চেয়েও আরো দূরে কোথা থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছিল কে জানে। আর শুধু হরবনস্‌লাল কেন, হরবনস্‌লালেরও তো বাবা ছিল। হরবনস্‌লালের বাপের বাপ! হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ বছর কেটে গেছে এমনি করে। এক দেশ থেকে আর এক দেশে। এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে। ইষ্টদেবতার সামনে তাদের কামনা-বাসনা কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। বলেছে—আমাকে ধন দাও মা, অর্থ দাও, রূপ দাও, জ্ঞান দাও—

চাওয়ার আর শেষ নেই মানুষের।

বুধবারির মা'রও তাই মনে হচ্ছিল। চল্লিশ সাল আগে এই কলকাতাতেই তাকে একদিন নিয়ে এসেছিল বুধবারির বাপ।

পেছনে আসতে আসতেই ডাকলে—ও বুধবারি—বুধবারি—

বুধবারি তখন কাপড়ের খুঁটে-খুঁটে গেরো বেঁধে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত ছিল মনে মনে। হঠাৎ মা'র ডাকে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল।

—কী হলো? চিল্লাচ্ছ কেন?

মায়ের কাছে এসে দাঁড়াতেই মা বললে—দ্যাখ বেটা, তোর বাপ কী বলতো জানিস? তোর বাপ বলতো—গরীব ঢোঁড়ে খানা ঔর আমীর ঢোঁড়ে ভুখ।

বুধবারি রেগে গেল। প্রথমে বুধবারি ভেবেছিল বুঝি না-জানি কী জরুরী কথা আছে। দেখছে, এ কলকাতা শহর! এখানে ভিড়ের জ্বালায় মাথা-গরম হবার

জোগাড়। এই সময় যত বাজে কথা। ওটা কী আর এমন নতুন কথা! চুপ রহো। সামনের রাস্তার দিকে নজর রেখে চলো। কোনও দিকে নজর দেবে না। খুব হুঁশিয়ার। এ কলকাতা শহর। জবর শহর! হ্যাঁ!

বুধবারি আবার চলতে লাগলো! ওপাশে বাসগাড়ি চলছে। ট্রামগাড়ি চলছে। হই-হল্লা চলছে। আর রাস্তার একপাশ ঘেঁষে চলছে বুধবারি, বুধবারির বউ রাঙিয়া, বুধবারির মেয়ে দুখিয়া, আর সকলের শেষে বুধবারির বুড়ী-মা। সকলের সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়েছে বুধবারি। আর পাঁঠাটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছে। জায়, কালী মাঈকী জায়। জায় বজরঙ্‌ওয়ালী কালী মাঈকী—জায়।

হঠাৎ ওদিক থেকে একটা গাড়ি একেবারে বুধবারির ঘাড়ে এসে পড়লো—আর হায়-হায় আওয়াজ উঠলো চারদিক থেকে—

—হ্যাঁ গো, মারা গেছে, না বেঁচে আছে?

—ও মশাই, ওখানে অত ভিড় কীসের? কে চাপা পড়েছে?

—আহা গো, বেচারা! কাঁধে করে কেউ পাঁঠা নিয়ে হাঁটে? বোকার ডিম কোথাকার! সঙ্গে ওরা কারা? বউ? বউ আর মেয়ে? আর ওটা বুঝি ওর বুড়ী-মা?

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল রাস্তার ওপর। রাস্তায় বেকার লোকের ভিড়ের অভাব হয় না। এতক্ষণ সবাই কাজে ব্যস্ত ছিল। রাস্তায় ভিড় দেখে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

—কী হয়েছে মশাই এখানে? কী হয়েছে?

ওরা ওদিক থেকে আসছিল আর এরা এদিক থেকে। এই সমস্ত কলকাতার সব পাড়াতেই ঢালাও রাস্তা পড়ে আছে। যে যেদিক থেকে পারো চলতে পারো। সকলের সব জায়গায় যাবার এক্তিয়ার আছে এই শহরে। তোমরাও চলো।

রাত থাকতে উঠেছে এরা। কেউ যাদবপুরে থাকে, কেউ গড়িয়া। কোথায় কার আস্তানা কেউ জানে না। একসঙ্গে জড়ো হবার পর সবাই সবাইকে দেখছে। তারপর একজন চাঁই এসে সবাইকে সার-সার দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে।

একজন চিৎকার করেছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়েছে—জিন্দাবাদ।

—আরো জোরে, আরো জোরে ভাই! একসঙ্গে সুর করে বলতে হবে জিন্দাবাদ!

অরবিন্দ সুরু থেকেই এই লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, লাইনের মধ্যে অরবিন্দর দাঁড়াবার কথা নয়। কীসের যে লাইন তাও অরবিন্দ জানতো না।

হারান নস্কর লেনের দুটো বাড়ি তার ঠিকানা। একটা বাড়ি গলির বাঁ-দিকে, আর একটা ডানদিকে। অর্থাৎ সাত নম্বর বাড়িতে একখানা ঘর, আর আট নম্বর বাড়িতে আর একখানা। সাত নম্বরে থাকে অরবিন্দর মা আর কুড়ি বছরের আইবুড়ো বোন, আর আট নম্বরে থাকে অরবিন্দর বউ। মুখোমুখি বাড়ি। কিন্তু সাত নম্বর থেকে আট নম্বরে যেতে গেলে আট ফুট চওড়া গলিটা পেরোতে হয়।

আসলে অরবিন্দ মাংস কিনতে বেরিয়েছিল। খাসীর মাংস। এই আধ কিলো মাংস হলে চলে অরবিন্দর। মাংস অরবিন্দর বাড়িতে বড় একটা হয় না। মাংসের দাম আজকাল বড় বেড়ে গেছে। ছ'টাকার কমে ছাড়ে না। ডাক্তার বলেছে গোপাকে মাংস খাওয়াতে। গোপার নাকি বুকের দোষ। প্রোটিন খাওয়া দরকার। ডাক্তার বলেছে—আপনি হলেন ওর হাজব্যান্ড্, আপনি যদি স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে না দেখেন তো কে দেখবে?

সুসীর কথাটাও মনে পড়লো অরবিন্দর।

নিজের মায়ের পেটের বোন। ছোটবেলায় খুব ছটফটে ছিল। বড় মাংস খেতে ভালবাসতো। বলতো—দাদা, কতদিন মাংস খাইনি বলো তো?

তা অনেক দিন যে মাংস হয়নি বাড়িতে তা জানতো অরবিন্দ। অরবিন্দ বলতো—আনবো আনবো, একদিন মাংস আনবো। বেশ একেবারে এক কিলো মাংস এনে খাইয়ে দেব তোদের—

এক কিলো মাংস একসঙ্গে খাওয়ার আনন্দটা কল্পনা করে সুসীর মুখ দিয়ে নাল পড়ে। নাল পড়ে গোপার মুখ দিয়েও—

আড়ালে অরবিন্দকে পেয়ে গোপা চুপি চুপি বলে—তুমি যে মাংস আনবে বললে, তা কোত্থেকে আনবে শুনি?

—কেন, আনতে পারিনে ভেবেছ?

—ওঃ, ভারি তোমার মুরোদ, তোমার মুরোদ আমি দেখে নিয়েছি—

অরবিন্দ রেগে যেত—তোমার জন্যেই তো···তোমার জন্যেই তো কিছু করতে পারি না—তুমি যদি একটু···

কথাটা শেষ করার আগেই চিৎকার করে উঠতো গোপা—থামো! থামো!

—কেন, আমি কি অন্যায্য কিছু বলিচি?

গোপাও চিৎকার করে উঠতো—খুব সোয়ামী হয়েছ তুমি! আমি পারবো না সকলের খেদমত করতে! কেন, আমার কীসের দায় শুনি? তোমার মা, তোমার বোন, তাদের ওপরে তো তোমার জোর খাটে না। যত হেনস্থা আমার ওপর, না? আমার বুঝি শরীর-গতিক থাকতে নেই? আমি বুঝি গাছ? আমি বুঝি পাথর?

ভাগ্যিস আট নম্বর বাড়ির কথা সাত নম্বর বাড়িতে পৌঁছোয় না, তাই রক্ষে।

নইলে ওপাশে বুড়ী অন্ধ শাশুড়ীও চিৎকার করে উঠতো—কী, এত বড় আস্পর্ধা তোমার বৌমা, তুমি আমার সুসীকে ঠেস মেরে কথা বলো ?

তা ঠেস দেওয়ার মত কথাই বটে গোপার।

গোপা বলতো—কেন, সুসী তোমার নিজের মায়ের পেটের বোন বলে বুঝি এত আদর, আর আমি পরের বাড়ির মেয়ে কিনা, তাই আমার ওপর এত জোর, না ? খুব করবো বলবো, হাজার বার বলবো—

বউ-এর কাছ থেকে খোঁটা খেয়ে খেয়ে অরবিন্দর মনটাও খিঁচড়ে গিয়েছিল সেদিন। দুত্তোর নিকুচি করেছে বলে সেদিন অরবিন্দ সকাল বেলাই বাজারের থলেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। সামান্য এক কিলো মাংস তাই কিনা অরবিন্দ খাওয়াতে পারে না। ধিক্, তার জীবনে ধিক্।

মা জিজ্ঞেস করেছিল—কোথায় চললি আবার এত সকালে ?

অরবিন্দ উত্তর দেয়নি প্রথমে।

—বলি, জবাব দিচ্ছিসনে যে, চললি কোথায় ?

তখন চিৎকার করে উঠেছিল অরবিন্দ—যাবো আবার কোথায়, যাবো চুলোয়, তোমাদের পিণ্ডি গেলবার জোগাড় করতে—

থলিটা নিয়ে রাস্তায় তো বেরিয়েছিল, কিন্তু ট্যাঁকে তখন তার মা-ভবানী। কোথা থেকে টাকা আসবে তার ঠিক নেই, তবু থলিটা নিয়ে রোজ নিয়ম করে বেরোতে হয়। অরবিন্দ ভেবেছিল ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে গিয়ে একখানা দশ টাকার নোট হাওলাত চেয়ে নেবে।

'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' বাজারের দোকান। মালিক ছোকরা মানুষ। দিলীপ বেরা। এতদিন বেশ ছিল। খাবারের দোকানে মোটা টাকা মুনাফা পেয়ে দিলীপ বেরা দু'হাতে টাকা খরচ করতো। মাঝে-মাঝে এক-একটা শনিবারে রেসের মাঠে নিয়ে যেত অরবিন্দকে। দামী সিগারেট খেতে দিত। ট্যাক্সি চড়তো। তারপরে ফেরার সময় যেটা অরবিন্দর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, দোকানে গিয়ে সেইটে খাওয়াতো। ভাল বিলিতি মাল। বিলিতি খেতে অরবিন্দর বড় ভালো লাগে।

দিলীপদা বলতো—আর এক পেগ খাবি নাকি রে অরবিন্দ—

অরবিন্দ বলতো—ক'পেগ খেইচি ?

—আমি কি তার হিসেব রেখেছি নাকি ? তুই কত খেলি তা তুই-ই জানিস্—

অরবিন্দ একটু কিন্তু-কিন্তু করতো—কিন্তু তুমি যে আজকে দু'হাজার টাকা হেরে গেছ দিলীপদা, আমি খাই কী করে ?

—দু'হাজার টাকা রেসে হেরেছি। তার জন্যে তুই কম খাবি ? দিলীপ বেরা কখনও হিসেব করে মাল খেয়েছে ?

তা দিলীপদা ওই রকমই। বরাবর সাহায্য করেছে অরবিন্দকে। কিন্তু এখন

হাত-বন্ধ। এখন সেই সন্দেশও নেই, সেই রসগোল্লা-পান্তুয়া, কিছুই নেই। এখন আর তেমন ইচ্ছে থাকলেও অরবিন্দকে যখন-তখন খাওয়াতে পারে না। আগে হাত পাতলেই দিলীপদা'র কাছে ধার পাওয়া যেত। এখন যে টাকার টান পড়েছে সেটা দেখলে বোঝা যায়। এখনও রেসের মাঠে যায় দিলীপদা, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে। একলা একলা।

সেদিনও সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে অরবিন্দ ভাবল দিলীপদা'র কাছে গিয়ে গোটা কতক টাকা হাওলাত্ নেবে! একেবারে খালি হাতে ফেরাবে না দিলীপদা, হয়ত শুধু একটু ঠাট্টা করবে। হয়ত বলবে—কী রে, সুসীর বিয়ে দিচ্ছিস নাকি?

সুসীকে নিয়ে একটু ঠাট্টা তামাশা করে দিলীপদা!

অরবিন্দ বলতো—তুমি আর সুসীকে নিয়ে ঠাট্টা কোর না দিলীপদা—

—কেন, ঠাট্টা করবো না কেন? সুসী তোর বোন হয় বলে?

অরবিন্দ বলতো—না না, সুসীর কানে গেলে রাগ করবে—

—রাগ করলো তো বয়েই গেল। আমি সুসীকে কত টাকা সাপ্লাই করেছি, বল তো? সেদিন যে সিফন্-শাড়িটা পরে সিনেমায় যাচ্ছিল, ওটা তো আমারই কিনে দেওয়া—হ্যাঁ কি না বল?

—অত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছো কেন? লোকে শুনতে পাবে যে?

—থাম্ তুই! গলার হারটা আর ওই শাড়িটা তো আমিই দিয়েছিলুম গেল পুজোয়!

—আঃ, আমি কি বলছি তুমি দাওনি?

দিলীপদা বোধহয় রেগে গিয়েছিল। বললে—তা আমাকে দেখে সুসী তাহলে মুখ ঘুরিয়ে নিলে কেন সেদিন? যেন কত সতী একেবারে! কলেজের মেয়েদের সামনে দেখাতে চায় যেন সব শাড়ি গয়না গুণধর দাদার কিনে দেওয়া, না?

এমন করে কথাগুলো বলে দিলীপদা যে বড় ভয় করে অরবিন্দর। বাইরের কেউ শুনতে পেলেই বিপদ! 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে' আগে খদ্দেরের ভিড় থাকতো সব সময়ে। যার-তার সামনে যা-তা কথা বলা স্বভাব দিলীপদা'র। অরবিন্দ ভেবেছিল দিলীপদা'র কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলবে—দশটা টাকা দিতে পারো দিলীপদা?

দিলীপদা হয়ত বলবে—কেন, দশ টাকায় সুসী কী কিনবে?

—সুসী অনেক দিন মাংস খায়নি, তাই ভাবছিলুম এক কিলো মাংস কিনে নিয়ে যাবো—

সব প্ল্যান মাথায় ছিল অরবিন্দর। কিন্তু গোলমাল হয়ে গেল মিছিলটা দেখে। 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'টা বড় রাস্তার মোড়ের ওপর। সেখানে গিয়েই দেখেছিল মিছিলের জমায়েত। চেনা-শোনা অনেকেই রয়েছে ভিড়ের ভেতর, আবার অনেক অচেনা মুখ।

—ও অরবিন্দবাবু, আসুন না!

দূরে দাঁড়িয়ে ছিল কেলো-ফটিক। ফটিক নামের দু'জন আছে পাড়ায়। একজন কালো, একজন ফরসা। গোলমাল এড়াবার জন্যে একজনকে কেলো-ফটিক বলে ডাকে সবাই, আর একজনকে শুধু ফটিক। লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল কেলো-ফটিক।

অরবিন্দ বলেছিল—কোথায় যাচ্ছিস্ রে তোরা?

—আসুন না, কলকাতায় যাচ্ছি—

—কেন, আজকে আবার কী আছে?

তখন সবে ভিড় জমাবার চেষ্টা হচ্ছে। লোকজন জড়ো করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশেপাশের পার্টির ছেলেরা অরবিন্দকে পিঠে হাত দিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলে। অরবিন্দ গিয়ে কেলো-ফটিকের পাশে দাঁড়ালো।

—এক লাইনে দাঁড়ান, লাইন ভাঙবেন না!

অরবিন্দ বললে—আমি যে মাংস কিনতে বেরিয়েছিলাম রে।

—আরে মাংস পরে হবে। আমরা বলে ভাত খেতে পাচ্ছি না, আপনি মাংস কিনতে এসেছেন!

অরবিন্দ নিজের কাছে যেন লজ্জায় পড়লো। বললে—আরে না ভাই কেলো তা নয়, আসলে ডাক্তার বউকে মাংস খাওয়াতে বলেছে। বলেছে প্রোটিন-ফুড্ চাই। কিন্তু ডাক্তার তো বলেই খালাস। টাকা দেবার বেলায় তো সেই আমিই। মাংস কেনা কি সোজা কথা ভাই আজকাল? যা গলা-কাটা দর! তা ভাবলাম, বছরে একটা তো দিন—

—আপনার বউ-এর কী হয়েছে?

—কী আর হবে ভাই। না খেতে পেলে যা হয়, বুকের দোষ।

—বুকের অসুখ তো চেঞ্জে নিয়ে যান না?

—দূর, কী যে বলিস তুই? ছ'টাকা কিলোর মাংস খাওয়াতে পারছি না তার ওপর চেঞ্জ! বেটাছেলে হলে কোনও ভাবনা ছিল না, কিন্তু মেয়েমানুষ যে, কিছু বলতে পারি না—

ততক্ষণ সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে।

অরবিন্দ বললে—তা কতক্ষণ লাগবে তোদের?

—কতক্ষণ আর লাগবে, বেশিক্ষণ নয়, বারোটা-একটার মধ্যে ফিরে আসবো সবাই। আসবার সময় বাসে চড়ে চলে আসবো।

—কিন্তু হঠাৎ আজকে সকালবেলা কেন? অন্যবার তো দুপুরবেলা বেরোয়?

কেলো-ফটিক বললে—আজ যে শনিবার—শনিবার যে আধরোজ আপিস হয়—

অরবিন্দ বললে—তা শনিবার মিছিল বার করা কি ঠিক হচ্ছে? আজ তো রেসের দিন। বাবুরা বাজি ধরতে মাঠে যাবে। দিলীপদাও তো ব্যস্ত—

কেলো-ফটিক কথাটা তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিলে।

বললে—আরে, আপনিও যেমন, আমাদের আবার শনিবার-শুকক্কুরবার! আমাদের কাছে যাঁহা শনিবার তাঁহা শুকক্কুরবার! বারের হিসেব রাখবে বাবুরা, আমরা তো ফতো-বাবু—

অরবিন্দ কেলো-ফটিকের কথায় মন দিয়ে সায় দিতে পারলে না। কারা বাবু আর কারা বাবু নয়, তা বাইরেটা দেখে কে বিচার করবে! অরবিন্দকেও তো বাইরে থেকে সবাই বড়লোক বলেই জানে। জামা-কাপড় জুতো দেখে তো তাই-ই মনে হবে। অরবিন্দ যদি বড়লোক হয় তো কলকাতার সবাই বড়লোক।

তা ঠিক আছে। ফিরে এসেই দিলীপদা'র কাছে টাকাটা চেয়ে নেবে।

ঌ ঌ ঌ

অরবিন্দর মনে পড়লো 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপদা একদিন আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল অরবিন্দকে। গলা নিচু করে বলেছিল—কী রে, কী করছিস আজকাল?

কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল অরবিন্দ। বলেছিল—কী আবার করবো, কখনও কিছু করেছি যে আজ করবো? কাজ আর কে দিচ্ছে বলো না আমাকে?

—তা তোর আর কাজ করেই বা কী হবে, অত বড় ধাড়ি বোন তোর ঘরে।

অরবিন্দ এ-সব কথায় লজ্জায় পড়ে না। বরং হি হি করে হাসে। বলে—কী যে তুমি বলো দিলীপদা, তার ঠিক নেই। ধাড়ি বোন তা আমার কী?

দিলীপদা হাসে না। মিষ্টি বিক্রির কাঁচা পয়সার মালিককে সহজে হাসতে নেই।

বলে—কথাটাতে হাসির কী আছে শুনি? আমি একটা সিরিয়াস কথা বলছি, আর তুই গবেটের মত দাঁত বার করে হাসছিস? হাসিস নি। অত হাসি ভাল নয়—

—আচ্ছা দিলীপদা আর হাসবো না। বলো না, কী বলছিলে?

—মবলক্ কিছু টাকা উপায় করবি?

অরবিন্দ বললে—কী করতে হবে, বলো?

দিলীপদা বললে—কিছ্ছু করতে হবে না। খাটনি-ফাটনি কিছ্ছু নেই, স্রেফ্ ফোকটের টাকা। একজন কাপ্তেন লোক কিছু পয়সা ওড়াতে চায়—

—কাপ্তেন লোক?

অরবিন্দ বুঝতে পারলে না কথাটা।

—আরে কাপ্তেন মানে কাপ্তেন। যাকে বলে ক্যাপটেন। বেশ মালদার মানুষ।

দু'নম্বর টাকা জমে জমে শ্যাওলা পড়ছে। খরচ করবার রাস্তা পাচ্ছে না।

অরবিন্দ তবু বুঝতে পারলে না।

—তা আমি কী করবো ?

দিলীপদা বললে—না, আমি তাকে তোর কথা বলেছি। লোকটা তোর সঙ্গে ভাব করতে চায়—মিশেই দ্যাখ না তার সঙ্গে, হয়ত তোরও কিছু হিল্লে হয়ে যেতে পারে—বলা যায় না—

অরবিন্দ তখন জিনিসটা একটু বুঝতে পেরেছে।

বললে—আমার কী হিল্লেটা হবে ?

দিলীপদা রেগে গেল। বললে—হিল্লে হবে না ? দু'নম্বর টাকার মালিক তোর সঙ্গে ভাব করতে চাইছে কি ওমনি-ওমনি ? কিছু গাঁট-গচ্ছা দিতে হবে না ? না দিলে তুই ছাড়বি কেন ? আচ্ছা করে দুয়ে নিবি। ও তো টাকা খরচ করবার জন্যে হাঁস-ফাঁস করছে, খরচ করবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না—

এতক্ষণে অরবিন্দ নরম হলো। বললে—কত দেবে ?

দিলীপদা বললে—তুই আগে কতখানি ছাড়তে পারবি তাই বল ? তোর বোনটা রাজী হবে ?

অরবিন্দ জিভ কাটলে।

বললে—তুমি যে কী বলো দিলীপদা তার ঠিক নেই, সুসী শুনলে রেগে এ্যাকসা করবে, তা আমার জানা আছে—।

তারপরে হঠাৎ দিলীপদা যেন রেগে গেল।

বললে—তাহলে আমিও সাফ কথা বলে দিচ্ছি, আমার কাছে আর টাকা ধার চাইতে আসিসনি বাপু, আমি আর টাকা দিতে পারবো না তোকে। আমার সন্দেশ-রসগোল্লা নেই, আমি নিজেই এখন ফতুর হয়ে গেছি—

দিলীপদা চটে যাচ্ছে দেখে অরবিন্দ নরম হয়ে গেল।

বললে—তুমি রাগ করছো কেন দিলীপদা, তুমি রাগ করলে আমার কী করে চলে বলো দিকিনি ! মা'র রোজ এক পোয়া রাবড়ি আমি কোত্থেকে যোগাই বলো দিকিনি ? সুসীর শাড়ি, গোপার ওষুধ···

—গোপা ? গোপার আবার কীসের ওষুধ ?

দিলীপদা কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

অরবিন্দ বললে—বা রে, তোমাকে তো বলেছি। গোপার বুকের দোষ তোমায় বলিনি ? গোপার ওষুধ কিনতে কিনতেই তো আমার শালার জান নিকলে গেল ! তারপর দু'টো বাড়ির ভাড়া। একটা সাত নম্বর, আর একটা আট নম্বর। দু'জন বাড়িওয়ালাই তো নোটিশ দিচ্ছে—

ও-সব দিলীপদা জানে। তাই বললে—এখন তোর যা ভাল বিবেচনা তাই কর। তোর ভালোর জন্যেই আমার বলা। নইলে আমার কলাটা—

অরবিন্দ তখন গলার সুরটা আরো নরম করে দিলে।

বললে—তা তুমি যখন রেকমেন্ড করছো তখন আর আমার আপত্তি কীসের। শুধু একটা কথা, মদ-ফদ খায় না তো ভদ্রলোক ?

—আরে, তোর দেখছি আক্কেল বলিহারি !

অরবিন্দ মাঝপথে বাধা দিয়ে বললে—না দিলীপদা, আমি সে জন্যে বলছি না। মানে ভদ্রলোকের পাড়ার মধ্যে থাকি তো। হারান নস্কর লেনের সাত নম্বর বাড়িতে তুমি তো কতবার গিয়েছ, পাড়ার মধ্যে একটা কেলেংকারি হলে, বুঝলে না—

দিলীপদা বললে—সে আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না বাপু, টাকাওয়ালা লোক, জোয়ান স্বাস্থ্য আর মদ খাবে না, তা কী হয় ?

অরবিন্দ বললে—তা মদ খাক, কিন্তু মাতলামি যেন না করে এইটি শুধু তুমি তাকে বলে দিও দিলীপদা—মানে পাড়ার মধ্যে জানাজানি হোক এটা চাই না—

দিলীপদা বলেছিল—সে তোকে ভাবতে হবে না, আমিও তো ভদ্দরলোকের ছেলে রে, আমার একটা দায়িত্ব-জ্ঞান নেই ?

বলে আবার দোকানের গদিতে উঠে ক্যাশবাক্সের সামনে গিয়ে বসেছিল। তখন ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ভেতর অনেক খদ্দের এসে ভিড় জমিয়েছে।

হ্যাঁ, এই হলো সূত্রপাত !

মানে এই যে-গল্প লিখতে বসেছি, যে-গল্পের সুরুতে বুধবারি পাঁঠা কাঁধে করে নিয়ে কলকাতার রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে, আর যে-রাস্তায় মানুষের মিছিল চলেছে কলকাতার রাজভবন লক্ষ্য করে, সেই মিছিলের আরো হাজারটা লোকের মধ্যেই এই অরবিন্দ রয়েছে। যে অরবিন্দর বাইরে ফরসা সার্ট, পায়ে পালিশ-করা নিউকাট, আঙুলে সোনার আংটিতে গোমেদ, আর পকেট ফাঁকা। তাকে বলো ইন্ডিয়ার কনগ্রেস-গভর্নমেন্টকে গালাগালি দিতে, সে টপ-টপ করে গভর্নমেন্টের সব দোষগুলো একনাগাড়ে বলে যাবে। সেগুলো তার মুখস্থ। তাকে বলো রাশিয়া-আমেরিকা-চায়নার পলিটিক্স আলোচনা করতে, সেও তার মুখস্থ। রাস্তায় পার্কে 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে' চায়ের দোকানে অরবিন্দ বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে আর তারপর দুপুর একটার সময় সাত নম্বর বাড়িতে এসে চান করে ভাত খেয়ে আট নম্বর বাড়িতে গিয়ে ঘুমোবে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত। সেই তখন উঠে এক কাপ চা খাবে, খেয়ে ফরসা জামাকাপড় পরে আবার বেরোবে।

আর তারপর ?

আর তারপরই হলো আসল উপন্যাস।

আসল উপন্যাস অবশ্য আরম্ভ হয়েছে সেই মার্টিন কোম্পানীর জয়চণ্ডীপুর থেকে। সেই যেখান থেকে বুধবারিরা আসছে পাঁঠা কাঁধে করে কালিঘাটে বলি দেবার জন্যে। আর এদিক থেকে যখন একটা মিছিল চলেছে রাজভবনের দিকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যয়ের শেকড়ের ওপর নতুন করে গজিয়ে উঠছে আর এক অবিশ্বাসী সমাজের আগাছা। সে সমাজের রান্নাঘর কলতলা হলো হারান নস্কর লেনের সাত নম্বর বাড়ি, আর আট নম্বর বাড়িতে হলো তার শোবার ঘর।

সেই আট নম্বর ঘরেই সেদিন সন্ধেবেলা গোপা ভাঙা চেয়ারখানায় বসে বসে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পড়ছিল। শ্রীকান্ত বইখানা যে ভাল বই বলেই পড়ছিল তা নয়। আসলে সারা বাড়ি দু'টোতে বই বলতে যা তা ওই একখানাই। হয়তো বই-খানার কী নাম কিংবা কার লেখা তাও জানে না। একটা কিছু করতে হবে বলেই বই মুখে দিয়ে বসে থাকা।

হঠাৎ ঘরে ঢুকলো অরবিন্দ। সঙ্গে আর একজন বেশ সাজ গোজ-করা ভদ্রলোক।

ঘরে ঢুকতেই গোপা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

অরবিন্দ বললে—এইটে হলো আট নম্বর। রাস্তার নাম ওই একই, হারান নস্কর লেন। আপনার খুব কষ্ট হলো তো শিরীষবাবু···

শিরীষবাবু আদ্দির পাঞ্জাবির তলায় ঘামছিল।

অবাক হয়ে বললে—কেন?

—আপনার গাড়িটা গলির বাইরে রেখে হেঁটে আসতে হলো।

—আরে তাতে কী হয়েছে! গাড়ি আছে বলে কি হাঁটতেও ভুলে গেছি নাকি। কী যে বলেন আপনি অরবিন্দবাবু!

বলে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। তারপরে ছাদের দিকে মুখ তুলে তাকালো।

—পাখাটা আর একটু জোরে ঘোরে না?

অরবিন্দ নিজের দারিদ্র্য হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইলে—সেই কথাই তো আপনাকে এতক্ষণ বলছিলুম স্যার, আমাদের দেশটা বড় পাজি দেশ হয়ে গেছে, কাউকে বিশ্বাস করবার যো নেই, সব বেটা জোচ্চোরের ধাড়ি—

—কেন?

শিরীষবাবু কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারলে না। পাখাটার সঙ্গে দেশের কী সম্পর্কে তা তার বোধগম্য হলো না সেই মুহূর্তে।

—এই দেখুন না, আজকাল লেবারদের কী রকম তেজ দেখুন না। দশ দিন মেকানিক-মিস্ত্রির বাড়িতে হেঁটে হেঁটে আমার পায়ের রং-খিল খুলে গেল। তারপর যখন বাবু দয়া করে একদিন এলেন তখন একটুখানি হাত ছোঁয়ালেন, আর পঁচিশটি টাকা মাথায় চাঁটি মেরে নিয়ে চলে গেলেন!

এ-সব বাজে কথা ভাল লাগছিল না শিরীষবাবুর। নিজে থেকেই গোপার দিকে দুই হাত জোড় করে নমস্কার করে বললে—এঁর সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন না অরবিন্দবাবু—

অরবিন্দ জিভ কাটলে—দেখুন দিকি কাণ্ড, আরে এই-তো আমার ওয়াইফ গোপা, আর ইনি হচ্ছেন শিরীষবাবু।

ভদ্রলোক পাদপূরণ করে দিলেন—শিরীষ দাশগুপ্ত—

—হ্যাঁ হ্যাঁ শিরীষ দাশগুপ্ত, জুয়েলার্স—

শিরীষবাবু আবার পাদপূরণ করে দিলে—জুয়েলার্স অ্যান্ড ওয়াচ ডীলার্স—

—হ্যাঁ হ্যাঁ জুয়েলার্স অ্যান্ড ওয়াচ ডীলার্স! আপনার বুঝি আবার ঘড়ির কারবারও আছে শিরীষবাবু?

শিরীষবাবু বললে—সোনার কারবারে তো আপনাদের গভর্নমেন্ট বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, ওই ঘড়ি বেচেই যা দুটো খেতে পাচ্ছি—আর সম্প্রতি একটা গ্লাস-ফ্যাক্টরি করেছি বেনামীতে, ইন্টারন্যাশন্যাল গ্লাস ফ্যাক্টরি—

—তা ঘড়ির ব্যবসা তো ভালো ব্যবসা শিরীষবাবু! ঘড়ির কি আজকাল কম দাম?

শিরীষবাবু গলায় হতাশার সুর ঢেলে বললে—আরে দূর, ভালো না ছাই, আজকাল কি আর সেই রকম দিনকাল আছে? মাসে দশ হাজার টাকা উপায় করতে আমার জিভ বেরিয়ে আসে, কিছুছু লাভ নেই—

—দশ হাজার?

—তা তার কমে তো আর ভদ্রভাবে চালাতে পারা যায় না। তিনখানা গাড়ির পেটে কি কম পেট্রল খায় ভেবেছেন?

তারপর হঠাৎ বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথা ধরলে। বললে—এসব কথা থাক এখন অরবিন্দবাবু, সারা দিন টাকার কথা ভাবতে ভাল্লাগে না, তা আপনি কী বই পড়ছিলেন? আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না—

অরবিন্দরও যেন এতক্ষণে নজরে পড়লো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো, তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস না।

ঘরের ভেতরে মাত্র দুখানা চেয়ার। অথচ তিনজন লোক। গোপা যেন একটু দ্বিধা করছিল। কিন্তু এরকম ঘটনা এই প্রথম নয়, তাই আর দেরি না করে বাকি চেয়ারটায় বসে পড়লো গোপা।

—আর আপনি?

অরবিন্দ বললে—আমার কথা ছেড়ে দিন, আমারই তো বাড়ি মশাই, আমি তো সারা দিন বসেই আছি—তার চেয়ে আপনারা একটু আলাপ করুন, আমি আসছি—

—আপনার সিসটার কোথায়? তার সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন না

অরবিন্দবাবু !

আসলে শিরীষবাবু যার সংগে আলাপ করতে এসেছিল, সে-ই গর-হাজির। ব্যাপারটা কি রকম সুবিধের মনে হচ্ছিল না শিরীষবাবুর। অথচ 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপ বলেছিল একটা ধাড়ি বোন আছে বাড়িতে।

—আমি আসছি শিরীষবাবু, এখনি আসছি—

—কোথায় যাচ্ছেন আবার ?

অরবিন্দ হাসলো। বললে—ভয় নেই, পালাচ্ছি না, আসছি—

বলেই সেই সন্ধেবেলা শোবার ঘরের মধ্যে দু'জনকে রেখে অরবিন্দ গলি পেরিয়ে সোজা সাত নম্বর বাড়িতে চলে গেল। বোধ হয় চায়ের ব্যবস্থা করতে।

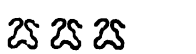

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ !

—সবাই জোরসে বলো ভাই জিন্দাবাদ ! একজন চেঁচাবে ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ বলে আর আপনারা শুধু একসংগে বলবেন—জিন্দাবাদ।

তা ততক্ষণে এদিক-ওদিক থেকে টেনেটুনে জন পঞ্চাশেক জোগাড় হয়েছে। আরো জন পঞ্চাশেক জোগাড় হলে ভালো হতো। শ্যামবাজারের দিক থেকে নর্থের দল আসবে, আর এই সাউথের দিক থেকে যাবে এই দল। দু'দিক থেকে অ্যাটাক করতে হবে রাজভবন। পুলিশ দল যেন দু'ভাগ হয়ে যায়।

যাদবপুরের এ-পাড়ায় তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ।

কে একজন সাইকেল চড়ে যেতে যেতে বলে গেল—এসব প্রোসেশান করে কিছু হবে না ভাই, ভোট দেওয়ার সময় সবাই কংগ্রেসকেই তো ভোট দেবে।

কেলো-ফটিক চিৎকার করে উঠলো—শালা নিশ্চয়ই সরকারের দালাল রে—

তারপর অরবিন্দর দিকে নজর পড়লো—কী অরবিন্দবাবু, কী ভাবছেন ?

অরবিন্দ বললে—দিলীপদা'র কথা ভাবছিলুম। ভেবেছিলুম দিলীপদা'র কাছ থেকে কিছু টাকা হাওলাত্ নেব—

—দিলীপদা কে ?

—ওই যে 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র প্রোপ্রাইটার। তা দেখা হলো না—টাকা না পেলে মাংসটা কেনা হবে না—

—মাংস-টাংস খাওয়ার কথা ছাড়ুন এখন। দু'দিন বাদে ভাতই জুটবে না কপালে, এই বলে রাখলুম আপনাকে ! পারেন তো দলে ঢুকে পড়ুন—

বহুদিন থেকেই কেলো-ফটিক তাকে দলে ঢুকে পড়তে বলছিল। কিন্তু আজকে তো অরবিন্দ সব দলেই আছে। তোমার দলেও আছি, আবার ওদের দলেও। কেউ আমার পর নয়। ওই দিলীপদাই বলো, আর শিরীষবাবুই বলো,

সবাইকেই আমাকে হাতে রাখতে হবে। সবার কাছ থেকেই টাকা ধার নিতে হবে।

প্রথম-প্রথম শিরীষবাবু একটু লাজুক ছিল। প্রথম দিন তো লজ্জাতে গোপার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারেনি। প্রথম দিন যখন শিরীষবাবুকে আট নম্বর বাড়িতে বসিয়ে বাইরে চলে এসেছিল তখন অরবিন্দ ভেবেছিল সে বাইরে চলে এলেই শিরীষবাবুর আড়ষ্ট ভাবটা একটু কমবে। হাজার হোক পরের বউ তো!

সাত নম্বরে আসতেই মা বললে—কী রে, এ রাবড়ি তুই কিনে আনলি নাকি?

অরবিন্দ বললে—আমি তো কিনে আনতুম, কিন্তু আমার বন্ধু যে ছাড়লে না—

—তোর বন্ধু? এ আবার তোর কোন্ বন্ধু? বলাই?

—দূর, কী যে তুমি বলো। সে তোমাকে কখনও এক কিলো রাবড়ি দিয়েছে? তার অত টাকা আছে? এ বন্ধুর ক'টা গাড়ি জানো?

—কী জানি বাপু, তোর বন্ধুর ক'টা গাড়ি আমি কী করে জানবো?

অরবিন্দ রেগে গেল—যা জানো না, তা নিয়ে তাহলে কথা বলতে আসো কেন? রাস্তায় গিয়ে দেখে এসো কত বড় গাড়ি, পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম,—

মা বললে—আমি আর দেখেছি, আমি বলে ভাতের থালাই দেখতে পাইনে। তুই তো একটা চশমাও করে দিলিনে আমার—

—এবার করাবো। আমার এই বন্ধুই করে দেবে। এর এই রকম তিনখানা গাড়ি আছে, জানো মা। একখানা গাড়ির দাম যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় তা হলে তিনখানা গাড়ির দাম ভাবো। শিরীষবাবু খুশী হলে চাই-কি একখানা বাড়িও দিয়ে দিতে পারে। চশমা তো ছার—

—তা আমার চশমার দরকার নেই, তুই বরং একদিন সুসীকে আর বৌমাকে মটর চড়িয়ে নিয়ে আয়, ওরা মটর চড়তে পায় না—

অরবিন্দ বললে—আরে, সেইজন্যেই তো আমার বন্ধুকে বাড়ি নিয়ে আসা। আমার মতলব তো তাই। কিন্তু তোমার মেয়ে তো সে-কথা বোঝে না। বড়লোক বন্ধু যারা তাদের একটুখানি খাতির করলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

—তা সুসী তো তোর বন্ধুদের খাতির করে! করে না?

—ছাই করে! ও যদি একটু আমার কথা শুনতো তো আমার এই দুর্দশা? সেদিন বললাম আমার এক বন্ধু আসবে তাকে একটু খাতির করে নিজের হাতে চা দিয়ে আয়, তা শুনলে? এই যে তোমার আফিমের নেশা, তোমার রাবড়ি আমি রোজ রোজ কোত্থেকে যোগাই বলো তো?

মা হঠাৎ বললে—শুনছি নাকি দোকানে আর রাবড়ি করছে না? গবরমেন্ট নাকি করতে দিচ্ছে না।

—তুমিও যেমন !

অরবিন্দ বললে—শিরীষবাবুকে যদি বলি আমার মা'র জন্যে গাধার দুধ চাই তো তাই-ই যোগাড় করে দেবে, এর নাম টাকার জোর। এখন তো দিলীপদা লুকিয়ে লুকিয়ে সন্দেশ-রসগোল্লা বাড়িতে বাড়িতে যোগান দিচ্ছে—

হঠাৎ মা'র বোধ হয় খেয়াল হলো। বললে—তুই ওখানে করছিস কী ?

—কী আবার করবো, চা করছি। তোমার মেয়েকে দিয়ে তো এতটুকু উব্‌কার হবার জো নেই। একটা বন্ধু এলো বাড়িতে, তাও যে-সে বন্ধু নয়, কোটিপতি বন্ধু, তাকে তো শুধু মুখে বিদেয় করে দিতে পারি না—

—তা বৌমা কোথায় গেল ? বৌমাকে চা করতে বললি নে কেন ?

—তোমার কেবল বৌমা আর বৌমা ! কেন, বৌমা ছাড়া কি আর বাড়িতে মানুষ নেই ?

—তা চা করতে আর কী এমন খাটুনি ! চোখ থাকলে আমিই করে দিতে পারতুম।

—তোমাকে কি আমি করতে বলেছি ?

—না, আমি বলছিলুম বৌমাকেই চা করতে বলতে পারতিস ! তুই কেন আবার হাত দিতে গেলি ?

—তা বাড়িতে একটা ভদ্রলোক এলো, তার সঙ্গে কথা বলাও তো একটা কাজ। তোমার বৌমা আছে বলে তবু তো একটু ভদ্রতা রক্ষে হয়। নইলে কে এ সব করতো শুনি !

ততক্ষণে দু' কাপ চা করে নিয়ে অরবিন্দ বাড়ি থেকে বেরোল। দুটো হাতে দুটো চায়ের গরম কাপ। সাত নম্বর বাড়ির সদর দরজাটা পেরিয়ে একটু ডান-হাতি গেলেই আট নম্বর বাড়ির ঘরখানা। সেইটেই অরবিন্দর বেড-রুম-প্লাস-বৈঠকখানা। যেদিন বৃষ্টি হয় সেদিন ছাতা মাথায় দিয়ে ও-ঘরে যাতায়াত করতে হয়। ঘরটার ভেতরে বসলে গলির দিকের দুটো জানালা বন্ধ করে দিতে হয়, নইলে তক্তপোশখানার ওপর বিছানাটা নজরে পড়ে। শুয়ে থাকলে আস্ত শরীরটা পথচারীদের করুণার ওপর সমর্পণ করা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় থাকে না। এমনিতে শীতকালে বিশেষ অসুবিধে হয় না অরবিন্দর। রাত্রিবেলা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেই হলো। তারপর যত ইচ্ছে নাক ডাকাও। কিন্তু গরমের রাতে সারা রাত পাখা খুলে দিয়েও দু'জনে ঘামে একেবারে রোস্ট হয়ে যায়। তখন যে গায়ের কাপড় খুলে দিয়ে একটু ঠাণ্ডা হবে তার উপায় নেই। জানালা-দরজায় আবার অসংখ্য ফুটো। রাস্তার গুণ্ডা-বদমাইস কেউ যদি কৃপাদৃষ্টি দিতে চায় তো তাতে বাধা দেবার কিছু নেই।

অরবিন্দ খবরের কাগজগুলি পাকিয়ে ফুটোগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির জলে আবার সেগুলো পচে যায়। পচে গিয়ে আবার ফাঁক হয়ে

যায়। তখনই হয় বিপদ।

অরবিন্দর যেসব বন্ধু ঘরে এসে বসে তারা এই ফুটোগুলোয় সন্ধান রাখে না। বসে বসে একান্তে গোপার সঙ্গে ফিস্টিনস্টি করে। অরবিন্দর যদি ইচ্ছে হয় তো বাইরে দাঁড়িয়ে ওই ফুটো দিয়ে দেখে যেতে পারে ভেতরে কী হচ্ছে।

কেউ কেউ বেশ গোপার কাছে গিয়ে বসে। একেবারে মুখোমুখি।

বন্ধুরা গোপার মুখোমুখি বসুক, সেইটেই মনেপ্রাণে চায় অরবিন্দ। যত ঘেঁষাঘেঁষি বসবে তত আনন্দ হবে অরবিন্দর। আর যদি দ্যাখে বন্ধুরা গোপার হাত ধরে আছে; কিংবা মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে তাহলে তার আনন্দ আর ধরে না!

সেই জন্যেই চা আনবার নাম করে অরবিন্দ আট নম্বর বাড়ি থেকে সাত নম্বর বাড়িতে চলে যায়। যাবার সময় দরজা-জানালাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে যায়, যেন দু'জনে একটু আড়াল পায়, যেন দু'জনে একটু ঘেঁষাঘেঁষি বসবার সাহস পায়।

হঠাৎ সামনেই যেন ভূত দেখলে অরবিন্দ।

—কীরে সুসি, তুই? এত সকাল-সকাল যে?

সুসী মানে সুসীমা। আগে ছিল সুশীলা। মা-ই নাম রেখেছিল। কিন্তু ও-নাম পছন্দ হয়নি সুসীর। কী যাচ্ছেতাই সেকেলে নাম! সুশীলাই শেষকালে সুসীমা হয়ে গিয়েছিল। দাদাকে চা নিয়ে যেতে দেখে সুসী বুঝলো আবার কোনও বন্ধু এসেছে।

অরবিন্দকে পাশ কাটিয়ে সুসী ভেতরেই চলে যাচ্ছিল, কিন্তু দাদা যেতে দিলে না।

বললে—বাইরে একটা বড় গাড়ি দেখলি?

—দেখেছি, খুব বড়লোক বুঝি?

অরবিন্দ বললে—হ্যাঁরে, ওই রকম তিনখানা গাড়ি আছে, টাকার কুমীর! চা নিয়ে যাচ্ছি। বলছিল আমার সিসটারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে—

—তোমাকে কত টাকা দিয়েছে?

—ওই তোর কেবল এক কথা। কেন, সামনে গেলে তোর কী হয়? তোকে খেয়েও ফেলবে না বা কিছু না, শুধু চা'-টা দিয়ে আসবি। আর কিছু করতে হবে না, মাইরি বলছি।

সুসীর গা দিয়ে ভুর ভুর করে সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। একটা নতুন সিল্কের শাড়ি পরেছে সুসী, পায়েও নতুন এক জোড়া চটি। অরবিন্দ এক পলকে সবটা দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল।

বললে—ঠিক আছে, আমি তোকে কারো সঙ্গে আলাপ করতে বললেই যত দোষ, আর তুই নিজে যে কত লোকের সঙ্গে ঘুরিস, আমি বুঝি টের পাই না?

ক্ষেপে উঠলো সুসী। বললে—আমি নিজে ঘুরি ?

—হ্যাঁ ঘুরিসই তো ! সব্বাই তোকে ঘুরতে দ্যাখে।

—কে দেখেছে আমাকে ঘুরতে, বলো। কার সঙ্গে ঘুরতে দেখেছে ? তোমাকে বলতেই হবে। অমনি-অমনি আমার নামে দোষ দিলেই চলবে না। বলো কে দেখেছে ? কোন্ হারামজাদা দেখেছে ?

—কে আবার দেখেছে, দিলীপদা দেখেছে।

—তোমার দিলীপদা তো একটা জানোয়ার।

—কী বললি ?

দু'হাতে দু'কাপ গরম চা নিয়ে অরবিন্দ রেগে উঠলো। হাতে চায়ের কাপ না থাকলে কী করতো বলা যায় না। বললে—দিলীপদা কি মিথ্যে কথা বলে বলতে চাস ? তাহলে তোর এই নতুন শাড়ি রোজ রোজ কোত্থেকে আসে শুনি ? এই নতুন জুতো কে দেয় ? তোর কলেজের মাইনে মাসে মাসে তোকে কে যোগায় ?

—ও মা, দেখ, দাদা কী বলছে ?

ভেতর থেকে বুড়ী মা'র গলা শোনা গেল—ওরে খোকা, আবার ঝগড়া করছিস তোরা ?

অরবিন্দ রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে বললে—যাও, আর নাকি-কান্না কাঁদতে হবে না। শিরীষবাবু এক কিলো রাবড়ি কিনে দিয়েছে, খাওগে যাও। আমার কপালে কষ্ট আছে, আমি কী করবো ?

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। সাত নম্বর বাড়ি ছাড়িয়ে আট নম্বরের শোবার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকার গলিটাতে লোকজন কেউ নেই। বেশ নিরিবিলি চারদিকটা। আসলে হারান নস্কর লেনটাই সরু এক ফালি গলি। এটা আবার তারও তস্য গলি। হারান নস্কর লেনের গা থেকে বেরোন ব্লাইন্ড লেন একটা।

অরবিন্দ দু'কাপ চা নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়ালো। পা দিয়ে ধাক্কা দিলেই দরজাটা খুলে যায়। কিন্তু কী খেয়াল হলো, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। জানালাও ভেতর থেকে বন্ধ। অরবিন্দর জানা আছে কোথায় কোন্ ফুটোয় চোখ দিলে ভেতরে সব কিছু দেখা যাবে।

ফুটোর ভেতর চোখ দিয়ে দেখে অরবিন্দ অবাক হয়ে গেল।

কই, শিরীষবাবু তো সেই এক জায়গাতেই বসে আছে। দু'জনে তো কই একটুও ঘেঁষাঘেঁষি হয়নি। সব দেখছি মাটি করবে গোপা। একটু আক্কেল-বুদ্ধি কিছু যদি থাকে ! আমি তো ঘরে নেই, আমি তোমাদের সুযোগ দেবার জন্যেই তো বেরিয়ে এসেছি আর তোমরা কি না বসে বসে ভ্যারেন্ডা ভাজছো ? এই করলেই সংসার চলেছে ! যত সব উজবুক নিয়ে হয়েছে সংসার। ঝাঁটা মারো,

ঝাঁটা মারো কপালের মাথায়।

তারপর পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলতেই শিরীষবাবু মুখ ঘোরালো।

—কী হলো, আপনি নিজেই চা নিয়ে এলেন ?

—একটু দেরি হয়ে গেল চা আনতে। কিন্তু শুধু চা নিয়ে এলাম। আর কিছু আনবো ? এই সিঙাড়া-টিঙাড়া···

—না না, ওসব পেটে সহ্য হবে না।

—তাহলে চা খান, আমি পান-সিগারেট নিয়ে আসি—

—না না, সিগারেট আমার কাছে আছে—

অরবিন্দ বললে—তাহলে পান নিয়ে আসি, এক দৌড়ে যাবো—

শিরীষবাবু বললে—তার চেয়ে বরং আপনার সিসটারকে ডেকে নিয়ে আসুন, আলাপ করি—

—সেই আমার বোনকে খুঁজতেই তো গিয়েছিলাম স্যার, তা এখনও বাড়ি আসেনি কলেজ থেকে।

—সে কি, এত রাত্তির পর্যন্ত কলেজ ?

অরবিন্দ বললে—আজকালকার কলেজের লেখাপড়ার কথা আর বলবেন না স্যার, একেবারে গো-হাটা হয়ে গেছে, অথচ আমাদের সময় কত পড়ানো হত বলুন তো। আর কলেজের মাস্টারগুলো হয়েছে তেমনি অগা। তারপর কলেজ থেকে যে বাড়ি আসবে, বাসে ট্রামে তা জায়গা পাবে নাকি ? ইজ্জত বাঁচিয়ে মেয়েদের বাসে চড়াই তো···

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বললে—খান, চা খান, আমি ততক্ষণ পান নিয়ে আসি, দৌড়ে যাবো আর আসবো—

বলে অরবিন্দ দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে আবার বেরিয়ে গেল।

—হেই, হেই, হেই—

ডালহৌসি স্কোয়ারের ফুটপাতের ওপর একটা বিরাটাকার ষাঁড় প্রায় গুঁতিয়ে দেয় আর কি ! বুধবারি এক হ্যাঁচকা টান দিলে মেয়েটার হাত ধরে।

তার পরেই আবার পাঁঠার পা দুটো জোরে ধরে ফেললে।

—এক থাপ্পড় মেরে মাথার খাল খিঁচে দেব। বেশরম বেল্লিক বেওকুফ মেয়ে কোথাকার !

একটু আগেই বাসগাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে বুধবারির মা। রাস্তার লোকজন খুব হল্লা করে উঠেছিল। তারপর মেয়েটাও ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে বেঘোরে মারা পড়তো। খুব সামলে নিয়েছে সময় মত !

সব কাপড়ের সংগে কাপড়ের খুঁটে গেরো বাঁধা। পালাবার উপায় নেই। কাপড়ে হ্যাঁচ্‌কা টান পড়তেই বুড়ী মা'র নজর পড়লো এদিকে। এতক্ষণ রাস্তার জাঁকজমক-জটলা দেখছিল চোখ দিয়ে।

বললে—ক্যা হুয়া রে বুধবারি ?

—দেখ না, হারামীর বাচ্ছার দেমাগ দেখ না, রাস্তায় চলছে অন্ধা হয়ে। যখন গাড়ি চাপা পড়বে তখন পিলে চ্যাপটা হয়ে মরবে, বেশ হবে আচ্ছা হবে—হারামীর বাচ্ছার হুঁশ হবে—

মা বললে—ওটা কীসের মোকান রে বুধবারি ? অত বড় মোকান ?

বুধবারি চেয়ে দেখলে। বিজ্ঞের মত বললে—কোই ভারি সরকারী দফতর হোগা শায়েদ—

বুধবারির মা হয়ত চল্লিশ বছর আগেকার কলকাতার স্মৃতির সংগে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিল। তখন আদমি হরবনস্‌লালের সংগে ওই বুধিয়ার মতই মাথায় ঘোমটা দিয়ে এমান করে এই রাস্তা দিয়েই হেঁটে হেঁটে এসেছিল। অথচ এ কলকাতা যেন সে কলকাতা নয়। সব কুছ বদল গয়া। ইনসান ভি বদল গয়া। না কি উমের বেড়েছে বলে সব ভুলে গেছে।

—বেটা !

বেটা বুধবারি তখন ছোট দলটার লীডার হয়ে সামনে সামনে চলেছে। একেবারে সকলের সামনে। ফতুয়ার পকেটের ভেতর একটা দশ টাকার নোট লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। সেটা খরচ করবে না বুধবারি। কিন্তু থাকা ভাল। বিপদ-আপদ বুঝলে বার করে দেবে। আর খুচরো টাকা নয়া-পয়সাগুলো সামনে রেখেছে। গুণ্ডার শহর কলকাতা। টাকার শহর কলকাতা, আবার ভিখিরির শহরও কলকাতা। বুধবারি আসবার আগে সব জিজ্ঞেস করে নিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে এসেছে।

বাসে-ট্রামে ঝুলন্ত মানুষগুলোর দিকে চেয়ে দেখল বুধবারি। তাজ্জব মানুষগুলোর ঝোলবার তাগদ। বাবুলোগ সবাই ঝুলছে। ঝোলো তোমরা। আমরা পায়দল যাবো। যন্তরপাতি বিগড়ে যেতে পারে। আমাদের পা বিগড়োবে না। আমরা হাঁটতে হাঁটতে যাবো। হেঁটে হেঁটে ফিরবো।

বুড়ী মা'রও সব দেখেশুনে তার মরদ হরবনস্‌লালের কথাগুলো মনে পড়ছিল। ওরা আমীর লোগ। আমরা গরীব। ওরা যাচ্ছে ভুখ খুঁজতে, আমরা যাচ্ছি খানা খুঁজতে।

—আরে বুধবারি ? তুম ইধর কাঁহা ?

হাতের মুঠোয় যেন একেবারে স্বর্গ পাওয়া গেল। দুখমোচন ! জয়চণ্ডী-পুরে দুখমোচনের রিস্তাদার আছে। সেখানেই একবার গিয়েছিল দুখমোচন ছুটি নিয়ে। সেই দুখমোচন। বিরাট গোঁফ। পাকিয়ে পাকিয়ে কাঁকড়াবিছের

মত দু'পাশে ছুঁচলো করে রেখেছে।

—কালিঘাটে যাচ্ছি চাচাজী।

—ওরা কারা ?

—আমার বহু, বেটি আর মাতারি—

দুখমোচনের গায়ে খাঁকি উর্দি। বুকের ওপর পেতলের তকমায় দফতরের নাম খোদাই করা।

—চলো ভাইয়া, মেরা ঘর চলো, জেরা পানি ভি পিও—

এমন অসময়ে এমন ক্লান্তির পর একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া যেন কল্পনার বাইরে ছিল বুধবারির।

—আপনা মোকান্ বানায়া ?

—নেহি ভাইয়া, দফতরকা কোয়ার্টার, ম্যায় তো বিলাইতি ব্যাংককা দারবান, তিরিশ সাল ইসি কম্পানি মে কাম করতা হুঁ, কোয়ার্টার নেহি দেগা ?

দুখমোচন লোকটা ভাল। কোথায় বুঝি ডিউটিতে যাচ্ছিল। দেশোয়ালি লোক পেয়ে বর্তে গেছে। একটু জলটল খেয়ে তবে যাও। কালী মাঈকী মন্দির তো কাফি দূর ভৈয়া। লগ্‌ভগ তিন ক্রোশ তো জরুর হোগা।

দল-বল রাস্তা ছেড়ে আবার চললো। বুড়ী মা আত্মীয়র নাম শুনে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে। হরবনস্‌লালকে চিনতো দুখমোচন। আহা, ভাইয়া মারা গেছে। অফসোস কি বাত। লেকন দুনিয়ামে রহনে কি লিয়ে তো কোই আয়া ভি নেহি। সবকোই কো যানা পড়ে গা। দুখ্ মাত করো ভাইয়া। ইসকী নাম হ্যায় দুনিয়া।

নিজের ঘরে নিয়ে গেল দুখমোচন। ঘর মানে বিরাট একটা ব্যাংক-বাড়ির সিঁড়ির তলায় বাথরুম আর পায়খানার লাগোয়া একখানা চার দেওয়ালওয়ালা জায়গা। মাথার ওপর একটা ছাদও আছে।

—ইঁহা আরাম করো ভাইয়া।

বুধবারি বললে—কালিঘাটে যেতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে চাচাজী।

—আরে নেহি নেহি—হাম সব কুছু বাতা দেঙ্গে—

তা দুখমোচন লোকটা সত্যিই ভালো। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এমন লোক পাওয়া ভাগ্যের কথা। লোটা করে ঠাণ্ডা জল আনলে কোথা থেকে। পাঁঠাটাকে উঠোনে ছেড়ে দিয়ে তাকে দুটো চানা ছড়িয়ে দিলে। বেশ জোয়ান পাঁঠা। কত কিম্মত ভাইয়া ? দাম কত নিলে ? বিশ রুপেয়া বহুত সস্তা ভাইয়া। কলকাত্তামে ইসকী কিম্মত লগ্‌ভগ্ ত্রিশ রুপেয়া সে কমতি নেহি।

—তামাকু পিও গী ভাবিজী ?

অর্থাৎ—বৌদি তামাক খাবে ?

তামাকের বন্দোবস্তও রেখেছে দুখমোচন। বেশ ভালো করে ডাবা হুঁকোয়

তামাক সেজে টিকে ধরিয়ে ধোঁয়া বার করে দিলে দুখমোচন। বুধবারির মা ঘোমটা টেনে দিয়ে ভুড়ুক-ভুড়ুক করে হুঁকো টানতে লাগলো। রাঙিয়াকে এক বাটি দুধও এনে দিলে কোথা থেকে। তারপর খইনি বানাতে লাগলো বাঁ হাতের তালুতে। তামাকটাকে টিপে টিপে গুঁড়ো করে ধুলো ঝেড়ে একভাগ দিলে বুধবারিকে আর একভাগ বুধবারির বউকে, আর একভাগ নিজের মুখে পুরে দিলে।

বললে—জেরা আরাম করো ভাইয়া—

বুধবারি পিচ ফেলে বললে—কলকাতা কেমন শহর, চাচাজী?—

দুখমোচন কলকাতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তিরিশ সাল এক নাগাড়ে এই বিলাইতি ব্যাঙ্কের দারবানি করছে। সব জানে সে। কলকাত্তা রুপেয়াকা শহর, বেইমানিকা শহর ভি। কলকাতায় আমীরও আছে, গরীবও আছে। লেকন সকলের এক হি ধান্দা।

—কেয়া ধান্দা?

—রুপেয়া, ঔর কেয়া? সারেঁ আদমী রুপেয়া কা পিছে লগ্ পড়া হ্যায়। রুপেয়া ঔর আওরত!

বিলিতি ব্যাঙ্কের ওপরতলায় যখন কোটি-কোটি টাকার হিসেব নিকেশ করতে ব্যাঙ্কের বাবুরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তখন সেই ব্যাঙ্কেরই বাড়ির সিঁড়ির তলায় বসে ব্যাঙ্কের হেড-দারোয়ান টাকার নিন্দে করতে লাগলো। রুপেয়া বড় খতরনাক চিজ ভাইয়া। ফির ভি রুপেয়া কে লিয়ে আদমিলোগ দিওয়ানা বন যাতা হ্যায়।

ষাট টাকা মাইনের হেড-দারোয়ান দুখমোচন ঝা সেদিন অনেক উপদেশ দিলে বুধবারিকে। বন্ধুর ছেলে, নতুন শহরে এসেছে। জীবনে প্রথম বার। গুন্ডার খপ্পরে না পড়ে তাই এত সতর্কতা। হ্যাঁ, খুচরো টাকা-কড়ি ট্যাঁকে রাখাই ভালো। কালি-মন্দির দেবী কা স্থান। লেকন্ পাণ্ডা লোগোঁসে হুঁশিয়ার রহনা ভাইয়া, হাঁ।

এবার ডিউটি করতে যাবে দুখমোচন। সে উঠলো।

বুধবারি বললে—ফেরবার সময় আসবো চাচাজী। মাংসর প্রসাদ নিয়ে আসবো।

ততক্ষণে তামাক খেয়ে পেটটা ঠাণ্ডা হয়েছে বুধবারির মা'র। বুধিয়াও খইনি খেয়ে গায়ে জোর পেয়ে গেছে। পাঁঠাটাকে আবার কাঁধে তুলে নিলে বুধবারি। সেও ছোলা খেয়ে একটু শান্ত হয়েছে।

—চলি চাচাজী।

—ঠিক হ্যায় ভাইয়া। বলো কালী মাঈকী জায়!

বুধবারিও বলে উঠলো—কালী মাঈকী জায়!!

২১ ২১ ২১

কলকাতা শহরটা ঠিক যেন একটা অজগরের মত। যখন ঘুমিয়ে পড়ে তো ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু যখন কলকাতার ক্ষিধে পাবে তখন আর তাল-মাত্রা জ্ঞান থাকবে না। বেশ আছে সব। সকালবেলা টালার ট্যাংক থেকে কলের জল গড়িয়ে গড়িয়ে আসতে সুরু হলো। গঙ্গার জল দেওয়া আরম্ভ হলো হোস-পাইপ দিয়ে। খবরের কাগজের সাইকেল-পিওনরা কাগজগুলোকে পাকিয়ে-পাকিয়ে তিন-তলা চার-তলা পাঁচ-তলায় ওপরের ফ্ল্যাটে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে চলতে লাগলো। কাঁচা-কয়লার তোলা-উনুনগুলো ধরিয়ে রাস্তার ফুটপাতে এসে বসিয়ে দিলে গৃহস্থরা। আগের দিনের বাসি সিঙাড়া-কচুরি রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে কাকভোজন সমাধা করে পুণ্য-অর্জন করলে মেঠাই-ওয়ালারা। তখন আস্তে আস্তে শহরের মানুষের রোজকার কাজকর্ম সুরু হয়। তখন হারান নস্কর লেনের সাত নম্বর বাড়িতে অরবিন্দর বুড়ী মা আফিমের ঝোঁক কাটিয়ে এক-নাগাড়ে কাশতে সুরু করবে। সে এক বেদম কাশি। সেই কাশির শব্দের চোটেই ঘুম ভেঙে যাবে সুসীর। সে চোখ মুছতে মুছতে যাবে কলতলায়। তখন আট নম্বর বাড়ি থেকে গোপা আসবে এ-বাড়িতে। রোজকার মত উনুনে আগুন পড়বে। কোথা থেকে কতকগুলো কাক এসে এ-বাড়ির কলতলার মাথায় এসে কা-কা করে এঁটো বাসনের ছিটেফোঁটার দাবী জানাবে।

তারপর যখন আরো বেলা হবে, তখন রাস্তায় বাস-ট্রাম চলতে সুরু করবে। তখন পিল পিল করে লোক বেরোবে বাজারের থলি হাতে করে। এত মানুষ যে কোত্থেকে আসে তা বোধ হয় কলকাতা নিজেও বলতে পারে না। কোথা থেকে এরা আসে আর কোথায় যে যায় তা কলকাতা অনেক মাথা ঘামিয়েও ঠিক করতে পারে না।

ওই যে বুধবারি একটা পাঁঠা কাঁধে করে নিয়ে আসছে হাওড়া ময়দান থেকে ওরা আদিকাল থেকে আসছে এমনি করে। ওই যে শিরীষবাবু বিরাট গাড়িখানা থেকে নেমে হারান নস্কর লেনের অন্ধকার ব্লাইন্ড গলিটার মধ্যে গিয়ে হারিয়ে গেল, ওই বা কেন হারিয়ে গেল তাও কলকাতা জানে না। আর শুধু কি ওরা? ওই 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপ বেরা টাকার বাণ্ডিল নিয়ে বসে বসে কীসের মতলব আঁটছে সারাদিন তাও কেউ বলতে পারে না। আর তারপর রাস্তার ওপর যেখানে মিছিলের লোকগুলো বেকার নিষ্কর্মার মত লাল-নীল ফেস্টুন নিয়ে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলে চেঁচাচ্ছে ওরাই বা কীসের আকর্ষণে কার প্রতিবাদ করতে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে তা ওরা হয়ত নিজেরাও জানে না।

তা না জানুক, কিন্তু সেই অনাদিকাল থেকে কলকাতা বরাবর সেই একই

দৃশ্য দেখে আসছে, আজও দেখছে। আজও দেখছে সাত নম্বর হারান নস্কর লেন থেকে সুসী বেরোল সেজেগুজে। কোথা থেকে যে ওর রোজ নতুন নতুন শাড়ি জুতো আসে তা ওর দাদা ওর মা ওর বৌদি কেউই বলতে পারে না। সুসীও তা জানাতে চায় না।

বাসে যখন ওঠে তখন ওর পিঠে বেণী ঝোলে, হাতে থাকে একখানা একসারসাইজ-বুক। ওখানা কলেজ প্রফেসারের নোট টুকে নেওয়ার খাতা। আর থাকে একটা পেটমোটা ভ্যানিটি-ব্যাগ।

কিন্তু বাসে চলতে চলতে কত কলেজের গেট পেরিয়ে যায়, তবু সুসী নামে না। নামে একেবারে পূর্ণ থিয়েটারের সামনে। তারপর টুক করে পূব দিকের একটা সর্পিল গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। দুপাশে দুতলা তিনতলা সব বাড়ি। গলিটা এঁকেবেঁকে কোন্ দিকে যে মোড় ফিরে কোন্ রাস্তায় গিয়ে মেশে তা মাঝে মাঝে গলির আদিবাসিন্দারাও বলতে পারে না। কিন্তু সুসী জানে কোথায় তাকে যেতে হবে।

তিনতলা একখানা বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে সুসী। তারপর পাশের গলিটা দিয়ে খানিকটা ঢুকলেই একটা সিঁড়ি পাওয়া যাবে। সেই সিঁড়ি দিয়ে একেবারে তিনতলায় চলে যাও। সেখানে কলিং বেলের বোতাম আছে, সেইটে টেপো। টেপবার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কিছু উত্তর দেবে না। একটা ফুটোতে মোটা কাচ লাগানো আছে। সেখান দিয়ে ওপাশ থেকে কেউ উঁকি মেরে তোমাকে দেখবে। যদি দ্যাখে তুমি তার চেনা লোক তাহলে হুট করে দরজা খুলে দেবে বেণুদি।

বেণুদি বললে—কী রে, তুই? এত সকাল সকাল?

বেণুদির যে টাকা-পয়সা প্রচুর আছে তা ঘরের ভেতরকার আসবাবপত্র দেখলেই বোঝা যাবে। সুসী বললে—বেণুদি, তোমার কাছে এলাম—

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, এসেছিস ভালো করেছিস, তা তোর মুখটা এত শুকনো কেন রে?

সুসী বললে—কালকে যে লোকটার সঙ্গে তুমি আমায় পাঠালে বেণুদি, সে ভালো লোক নয়—

—নিখিল? কেন, কী করলে?

সুসী বললে—কথা ছিল আমি শুধু তার সঙ্গে সিনেমা দেখবো, আর কিছু করবো না, তা সিনেমা ভাঙলো সন্ধ্যে ছ'টার সময়, তখন কী বলে জানো? বলে—লেকে চলো—

বেণুদি বললে—ওমা তাই নাকি?

সুসী বললে—হ্যাঁ, তা আমি বললাম, লেকে যাবার তো কথা ছিল না। ফুরন হয়েছিল শুধু তার সঙ্গে সিনেমায় যাবো, সব খরচ-খরচা বাদে আমায়

দশটা টাকা দেবে। আমার যা রেট। কী বলো ?

বেণুদি বললে—তা তো বটেই, তারপর ?

—আমি বললাম লেকে গেলে ঘণ্টা পিছু আরো দশ টাকা দিতে হবে। শেষ-কালে লেকে নিয়ে গিয়ে অন্ধকারে কী করবে কে জানে! তখন মরি আর কী! আমার খুব ভয় হয়ে গেল বেণুদি। তখন তোমার নিখিল বলে কি জানো ? বলে কাছে টাকা নেই, পরে দেবো। তা এ-সব কারবার কি বাকিতে চলে ? তুমিই বলো না বেণুদি! এতই যদি মেয়েমানুষের নেশা তো পকেটে টাকা নিয়ে বেরোলেই পারো ? আমি স্পষ্ট কথার মানুষ!

—তা, তুই কী করলি ?

—তখন বলে কি জানো ? বলে—আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি, ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। বলে—চলো একটা হোটেলের ঘর ভাড়া করে দু'জনে একসঙ্গে রাত কাটাই। আমি বললুম, অমন ভালবাসার মুখে আগুন। অত ভালবাসা দেখাতে গেলে টাকা ফেলতে হয়।

তারপর একটু থেমে বললে—তারপর কী করলে জানো ? আমার গায়ে হাত দিয়ে টানাটানি করতে লাগলো।

—সে কী ? তুই গালে চড় কষালি না কেন একটা ?

সুসী বললে—আমি ভাবলুম তোমার ক্লায়েন্ট, শেষকালে হয়ত তুমি শুনে রাগ করবে।

—ছাই, রাগ করবো কেন ? আমার সঙ্গে এক-রকম কনট্র্যাক্ট করে নিয়ে গিয়ে কথার খেলাপ ? এ তো ভালো কথা নয়। না না মেয়ে, তুই ঠিক করেছিস। এবার এলে নিখিলের মুখে জুতো ঘষে দেবো। ছি ছি, আমি এতদিন কারবার করছি, এমন ছোটলোকের মত ব্যবহার তো কারো দেখিনি। এবার এলে সাফ বলে দেবো, যদি এই রকম প্রবৃত্তি হয় তোমার তো তুমি সোনাগাছি-চিৎপুরে যাও বাছা, সেখানে ও-সব ইল্লুতেপনা চলবে। আমার মেয়েরা ভদ্দরঘরের গেরস্থ মেয়ে, পেটের দায়ে সখ করে একটু ফুর্তি করছে বলে ভেবো না তারা চরিত্র নষ্ট করবে—

সুসী বললে—আমিও তো তাই বললাম—

—শুধু তুই কেন, আমিও তো আমার ছেলেদের সকলকে তাই বলি। বলি, এ তুমি সোনাগাছি-চিৎপুর পাওনি বাবা। এখানে আমার মেয়েরা কারবার করতে আসে বলে ভেবো না টাকার জন্যে তারা ইজ্জৎ দেবে। দুটো পয়সা জমিয়ে এক-দিন আমার মেয়েরাও জমি কিনবে বাড়ি করবে, বিয়ে-থা করবে, সংসার করবে—

তারপর একটু থেমে বললে—খেয়ে এসেছিস তো ?

—হ্যাঁ বেণুদি। কলেজ যাবার নাম করে একেবারে ভাত খেয়েই বেরিয়েছি।

—বেশ করেছিস। আয় বোস,—বলে বেণুদি জোরে পাখাটা খুলে দিলে।

বেণুদির ঘরে যারা আসে তাদের আদর-আপ্যায়নের এলাহি বন্দোবস্ত

আছে। খবরটা ওয়াকিবহাল যারা, তারা জানে। জানে বলেই বেণুদির ক্লায়েন্ট মহলে সুনাম আছে। তবু একটা-কি-দুটো ব্যতিক্রম হলে বেণুদি ভীষণ চটে যায়। আজ এই আঠারো বছর বেণুদি এই কারবার চালাচ্ছে, অনেক রকম বে-আইনী কাণ্ড বাধিয়েছে ক্লায়েন্টরা। কিন্তু সকলকে শক্ত হাতে শায়েস্তা করেছে বলেই আজ বেণুদির এত পসার।

বেণুদি বলে—সেইজন্যেই তো ব্ল্যাকমার্কেটারদের আমি ঢুকতে দিই না বাছা আমার বাড়িতে। আমি বলি, তুমি যদি স্টুডেন্ট হও তো আমার বাড়িতে এসো, আমার ছেলেরাও সব স্টুডেন্ট, মেয়েরাও তাই—

সুসী বললে—তা তোমার নিখিল কি স্টুডেন্ট নাকি?

বেণুদি বললে—বলে তো স্টুডেন্ট, আমি তো আর কলেজে গিয়ে রেজিস্ট্রি-খাতা দেখে আসিনি। মানুষের কথায় বিশ্বাস করেই আমি এখানে ঢুকতে দিই—

—ওইটেই তো তুমি ভালো করো না বেণুদি! আজকাল কি আর মুখের কথায় কাউকে বিশ্বাস করা যায়?

—ঠিক বলেছিস মা, ঠিক বলেছিস। দিনকাল সব পালটে গেছে মা, সব পালটে···

বলতে বলতে কথায় বাধা পড়লো। টেলিফোনের রিসিভারটা বেজে উঠলো পাশের ঘরে। বেণুদি ধরতে গেল দৌড়ে।

তারপর বেণুদির গলা শোনা গেল—হ্যালো—কে? সমীর? কী খবর বাবা? এতদিন দেখা নেই কেন? বেণুদিকে একেবারে ভুলে গেলে নাকি বাবা?

তারপর কিছুক্ষণ চুপ। অনেকবার হাঁ-হুঁ-না চললো। শেষকালে বললে—আসবে? তা এসো-না বাবা! বেণুদির কাছে আসবে তার আবার লজ্জা কীসের!

সুসী কান খাড়া করে রইল।

—আছে, আছে। আমি যখন আছি, তখন কিছু ভাবনা নেই তোমার বাবা। মেয়ে? হ্যাঁ এক মেয়ে তো আমার কাছেই বসে রয়েছে এখন। সুসী। আমার সুসীকে চেন তো? হ্যাঁ থার্ড ইয়ারে পড়ে। রাত দশটা কোরো না বাবা। তা তুমি এসো, এলে তখন কথা হবে—আচ্ছা রেখে দিলাম—

ফোন ছেড়ে দিয়ে বেণুদি হাসতে হাসতে এ-ঘরে এল।

বললে—ভালই হয়েছে রে, তুইও ঠিক সময়ে এসে গেছিস—

সুসী জিজ্ঞেস করলে—কে বেণুদি?

—সমীর রে, সমীর। সমীরকে চিনিস না? খুব বড়লোকের ছেলে। বাপ গেজেটেড অফিসার, দিন-রাত লন্ডন-আমেরিকা করছে, তারই ছেলে। তোর সঙ্গে মানাবে ভাল!

সুসী বললে—কিন্তু টাকা ?

—টাকা তুই যা চাইবি তাই।

সুসী বললে—শুধু সিনেমা দেখা, না হোটেলে যেতে হবে ?

—এই তোর বড় দোষ একটা, এই তোর বড় দোষ! আগের থেকেই টাকা টাকা আর টাকা। আগে আসুক, কথাবার্তা বল, মানুষটা কী রকম দ্যাখ, তবে তো ?

সুসী বললে—মানুষ দেখে আমার কী হবে বলো তো বেণুদি। আমি তো মানুষটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না। সে যখন করবো, তখন করবো। এখন আমার টাকা নিয়ে দরকার—

—কেন বল দিকিনি ? তুই কলেজে পড়িস, তোর এত টাকার খাঁকতি কেন বল তো ?

—বাঃ, টাকার দরকার নেই ? তুমি বলছো কী ? একটা ভদ্দরগোছের শাড়ি কিনতে গেলে কত টাকা লাগে আজকাল বলো তো ? তিরিশ টাকার কমে এক-জোড়া জুতো হয় ? তারপর বাড়ি ভাড়া আছে, চাল-ডাল-তেল-নুন, মা'র রাবড়ি, তবু তো মা'র চশমা একটা করে দিতে পারছি না। আমার কি বাবা আছে, না বাবার জমিদারি আছে ?

—তা তোর দাদাটা এখন কী করে ? এখনও সে রকমই ভ্যারেণ্ডা ভাজছে নাকি ?

—দাদার কথা আর বোল না। বাড়িতে কেবল বন্ধু-বান্ধব আনছে, আর আমার পেছনে লাগছে। কেবল আমাকে নিয়ে টানাটানি। আমায় খাটিয়ে বড়-লোক হতে চায়।

বেণুদি বললে—না না, দাদার খপ্পরে পোড় না। নিজে গতর দিয়ে যে-কটা টাকা উপায় করছো একটা পোস্টাপিসের বই করে তা জমাও, তাতে আখেরে নিজের ভাল হবে। শেষে একটা তেমন সুবিধে দরে যাদবপুরের দিকে জমি কিনে বাড়ি-টাড়ি করো। তারপর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে কত ভাল-ভাল বর জুটবে তোমার। চাই কি, আমার সন্ধানে কত ভাল পাত্র আছে, আমি নিজে সম্বন্ধ করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবো—

সুসী বললে—আমারও তো সেই মতলবই আছে বেণুদি, সেইজন্যেই তো এত টাকা টাকা করি—

বেণুদি বললে—তাহলে ততক্ষণ একটু আমার বিছানায় গড়িয়ে নে তুই, সমীর আবার দুটোর মধ্যেই আসবে বললে। একটা শাড়ি দিচ্ছি, ওটা পরে শুসনে, নট-ঘট হয়ে যাবে তোর মুর্শিদাবাদীটা। তারপর সে আসবার আগেই মুখ-হাত ধুয়ে পাউডার স্নো-ক্রীম মেখে সেজে-গুজে থাকবি, চল—

সুসী ড্রইংরুম থেকে বেণুদির শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

২১ ২১ ২১

'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপদা দূর থেকে দেখতে পেয়েছে।

—কী রে অরবিন্দ, কোথায় চলেছিস ?

—এই একটু 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' করে আসছি দিলীপদা !

—তোর আবার মরতে এ শখ হলো কেন ?

অরবিন্দ বললে—না দাদা, এই কেলো-ফটিক ডাকলে।

কেলো-ফটিক পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

দিলীপদা বললে—কী রে কেলো-ফটিক, ওকে আবার দলে টানলি কেন ?

—এই দ্যাখ না দিলীপদা, এই এত বেলায় মাংস কিনতে যাচ্ছিল হাতে থলি নিয়ে। তাই দেখে বললুম, আমাদের সঙ্গে আসুন, নইলে দু'দিন বাদে মাংস তো মাংস, ভাতই জুটবে না কপালে।

ওদিক থেকে লীডার গোছের কে একজন চিৎকার করে উঠলো—বলো ভাই ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

—জিন্দাবাদ।

কংগ্রেস সরকার জবাব দাও—

দিলীপ বেরা হাসতে লাগলো। চিৎকারটা থামলে অরবিন্দকে বললে—কখন ফিরছিস ?

অরবিন্দ বললে—কেলো-ফটিক বলছে বেলা বারোটা-একটার মধ্যেই ফিরতে পারবো। আসবার সময় পাঁচ নম্বর বাসে আসবো—

—খাওয়া ?

অরবিন্দর হয়ে জবাব দিলে কেলো-ফটিক। বললে—পার্টি থেকে পাঁউরুটি-চা'র বন্দোবস্ত আছে—আর তাছাড়া একটা দিন না-খেলে কী হয় দিলীপদা ? সারা বাংলাদেশ উপোস করছে মাসের পর মাস, আর আমরা সেই বাঙালীসন্তান হয়ে একটা বেলা উপোস করতে পারবো না ?

—কর উপোস।

বলে দিলীপদা চলেই যাচ্ছিল। পেছন থেকে ডাকলে অরবিন্দ।

—তোমার কাছে যাবো বলেই বেরিয়েছিলাম দিলীপদা—

—কেন রে ? আমার কাছে আবার কী দরকার ? টাকা ?

অরবিন্দ লাইন থেকে বেরিয়ে এসে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললে—আসলে মাংস কিনতে বেরিয়েছিলাম দিলীপদা, এই দ্যাখ, হাতে থলি রয়েছে—

—তা মাংস না কিনে হুজুগ করছিস কেন ?

—মাংস যে কিনবো তার টাকা কোথায় ? ছ'টাকা কিলো। তাই ভাবছিলাম-যদি তুমি গোটা দশেক টাকা দিতে।

দিলীপদা বললে—টাকা নেই তো আবার মাংস খাবার শখ কেন শুনি ?

—না দিলীপদা, সত্যি কথা বলছি, আমার নিজের জন্যে নয়। বউটার শরীরটা দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ভালো-মন্দ খাওয়াতে পারছি না তো। তাই।

—আগের টাকা এখনও তোর কাছে পাই আমি, তা খেয়াল আছে?

—সে আমি দোব, মোটামতন একটা টাকা পেলেই তোমার সব টাকা এক থোকে শোধ করে দেবো। মাইরি বলছি দিলীপদা, আমি তোমার টাকা মেরে দেবো না—

—আচ্ছা, আচ্ছা, সে পরে শুনবো'খন, এখন তুই আগে ঘুরে আয়— বলে দিলীপদা চলে গেল নিজের দোকানের দিকে।

মিছিলটা এবার ছাড়বে। অরবিন্দ নিজের জায়গায় গিয়ে আবার দাঁড়াল। যা থাকে কপালে একটা কিছু হয়ে যাক। হয় এসপার নয় ওসপার। আর কিছু ভাল লাগে না অরবিন্দর। ধার-দেনা করে আর কাঁহাতক চালানো যায়! সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলে বোধ হয় একটা সুরাহা হতো। কেলো ফটিক বলে ঠিক। সমস্ত কলকাতাটা যদি একবার উল্টে দিতে পারা যেত তো বাঁচা যেত। মানে বড়লোকের পাড়াটা যদি এখানে চলে আসতো, আর এ-পাড়াটা বড়লোকদের পাড়ায়। সোজা অবস্থায় সেরকম তো হবার জো নেই। শিরীষবাবুর ব্যাপারটাই দ্যাখ না। অত বড় একটা টাকাওয়ালা লোক, সেও বেশিদিন ভিড়লো না।

অথচ কত তোয়াজ তাকে করেছে অরবিন্দ। নিজের হাতে তাকে চা করে দিয়েছে প্রথম দিনটা। আবার দৌড়ে মোড়ের বেনারসীলালের দোকান থেকে পান কিনে নিয়ে এসেছে।

মনে আছে বাইরের জানালার ফুটো দিয়ে অরবিন্দ উঁকি মেরে দেখছিল। সেই ঠিক তেমনি জরদ্গবের মত বসে আছে। আরে বাবা, একটু গায়ে হাত দে। পাশাপাশি দুজনকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেলুম, দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলুম, কেউ কিছু বলবার নেই, দেখবার নেই, পরের বউ, ভয় করবার দরকারটা কী? আর আমি তার স্বামী হয়ে যখন বলছি, তখন লজ্জা-সরমটা কী? তা নয়, কেবল সিসটার আর সিসটার? কেন, গোপা কি খারাপ দেখতে? একটু রোগা-পটকা, এই যা। ওই গোপারই গায়ে একটু মাংস চাপিয়ে দিলে কত লোক পাগল হয়ে লুফে নেবে যে!

সেইজন্যেই তো মাংস কেনার কথাটা ক'দিন ধরে ভাবছিল অরবিন্দ। গোপাকে আর একটু মাংস টাংস কি ঘি-দুধ-ডিম খাওয়াতে পারলেই আর ভাবনা নেই। তখন ওই সুসীকে আর খোসামোদ করতে হবে না। ওই গোপাকে দেখিয়েই লাখ-লাখ টাকা উপায় হবে। সেই টাকাতে বাড়ি হবে, গাড়ি হবে। তখন সুসী এসে খোসামোদ করবে দাদাকে। তখন অরবিন্দ লাথি মেরে দেবে তাকে। বলবে—এখন কেন? এখন কেন দাদাকে খোসামোদ করতে আসছিস শুনি? সেই সব দিনের কথা মনে নেই? কতদিন বলেছি একটু খাতির

কর আমার বন্ধুদের, একটু হেসে কথা বল, একটু সিনেমায় যা ওদের সঙ্গে, লেকের দিকে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আয়, তখন তো শুনিসনি আমার কথা। তাহলে এখন কেন এসেছিস আমার বাড়িতে খোসামোদ করতে।

পান কিনে নিয়ে এসে আবার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলে অরবিন্দ।

শিরীষবাবুর তখন চা খাওয়া হয়ে গেছে। গোপাও সব চা-টা শেষ করে দিয়েছে।

শিরীষবাবু বললে—আপনার বুঝি খুব বই পড়ার শখ ?

গোপা বললে—না শখ নয়, কোন কিছু কাজ ছিল না বলেই বইটা উল্টো-চ্ছিলুম—

—কী বই, দেখি !

বইটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে গোপা বললে—শ্রীকান্ত—

—শ্রীকান্ত ? ঠাকুর-দেবতার বই বুঝি ?

—না, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।

—শরৎ চট্টোপাধ্যায় ? কোথাকার লোক ? ইস্ট বেঙ্গল ? বাঙাল ?

—আপনি শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের নাম শোনেননি ?

শিরীষবাবু বইখানা নিয়ে নাড়তে-চাড়তে বললে—না, ঠাকুর-দেবতার ওপর আমার ভক্তি-টক্তি নেই, আর সে-সব যখন বুড়ো হবো, তখন পড়বো। এখন সিনেমা দেখবার বয়েস—

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। বললে—অরবিন্দবাবু কোথায় গেলেন—

—উনি আপনার জন্যে পান কিনে আনতে গেলেন।

—পান কিনতে এত দেরি ? অনেক দূরে বুঝি পানের দোকান ?

গোপা হাসলো। বললে—না—

শিরীষবাবু বললে—হাসছো কেন ?

—হাসছি আপনার কথা ভেবে।

—কেন, আমি কী করলুম !

—আপনি ভাবছেন উনি এখনি আসবেন ?

শিরীষবাবু বললে—কেন, দেরি হবে ?

—হ্যাঁ, দেরি হবে।

শিরীষবাবু বললে—দেরি হবে ? কত দেরি হবে ?

গোপা আবার মুচকি হাসলো। বললে—অনেক দেরি হবে, এক ঘণ্টার আগে নয়।

শিরীষবাবু কী করবে বুঝতে পারলে না। অরবিন্দবাবুর একটা বোন আছে বলেছিল দিলীপ বেরা। 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপ বেরাই আসলে যোগাযোগটা করে দিয়েছিল। কিন্তু সেটাকে বার করছে না সামনে। এদের

মতলব খারাপ বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ মনে হলো দরজার পাল্লা যেন ঈষৎ ফাঁক হলো। তারপর মনে হলো বইরে থেকে কে যেন উঁকি মারছে। শিরীষবাবু অবাক হয়ে গেল।

—কে ?

আর তারপরেই চিনতে পারলে। অরবিন্দ। অরবিন্দই দরজাটা ফাঁক করে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

অবাক হবার কথাই বটে। ঘরে না ঢুকে বাইরে থেকে ডাকার কী মানে ?

শিরীষবাবু দরজাটা খুলে বাইরে যেতেই দেখলে, যা ভেবেছে তাই। অরবিন্দ দাঁড়িয়ে আছে হাতে পানের খিলি নিয়ে।

শিরীষবাবুকে পানের খিলিটা দিয়ে মুখটা তার মুখের কাছে এনে বললে—হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন ?

শিরীষবাবু পানটা মুখে পুরে বললে—বসে থাকবো না তো কী করবো ?

অরবিন্দ গলাটা আরো নিচে নামিয়ে ফিসফিস করে বললে—কেন, কিস্-টিস্ খান—

হঠাৎ ওদিক দিয়ে আরো জোরে চিৎকার উঠলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

সবাই মিলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

পাশ থেকে কেলো-ফটিক বললে—কী অরবিন্দবাবু, কী ভাবচেন ? চেঁচান—সস্তা দরে খাদ্য চাই—

অরবিন্দর তখন ভাবনার ঘোর কেটে গেছে। বলে উঠলো—সস্তা দরে খাদ্য চাই—

—মজুতদারের শাস্তি চাই—

সকলের সঙ্গে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে অরবিন্দও বলে উঠলো—মজুতদারের শাস্তি চাই—

✿ ✿ ✿

বহুদিন আগে একদিন জঙ্গল ছিল ওখানে। পাশেই ছিল গঙ্গা। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ওই গঙ্গার ধারেই বেশ নিরিবিলি জায়গা দেখে ইন্ডিয়ান ভাইস্‌রয়ের জন্য ওই প্যালেসটা বানিয়েছিল। তখন ওর নাম ছিল 'ভাইসরয়েস প্যালেস'। তারপর ১৯১১ সালে যখন ইন্ডিয়ার ক্যাপিটেল দিল্লীতে চলে গেল তখন ওর নাম হলো, গভর্নরস হাউস'।

ততদিনে গঙ্গা সরে গেছে। কলকাতার বুকে ইউনিয়ন-জ্যাক বেশ মজবুত করে খুঁটি গেড়েছে। কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে ব্রিটিশ-এম্পায়ারের খুঁটি কখন যে আলগা হয়ে এলো, তার নিজের দেশের দশ-নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের

বাড়ীতেই তা কেউ দেখতে পায়নি। সেখানেই একদিন দেখা গেল বোমা পড়ছে মাথার ওপর, মাটি সরে যাচ্ছে পায়ের তলায়। তখন পালাও পালাও রব উঠলো নিজের দেশে। ছাড়তে হলো ইন্ডিয়া, বার্মা, সিলোন, সিংগাপুর, মালয়, ঘানা, আফ্রিকা···ছাড়তে হলো এশিয়ার এম্পায়ার।

কলকাতায় কংগ্রেসের মীটিং বসলো। তারা বললে—ইংরেজ, ইন্ডিয়া ছাড়ো —কুইট্ ইন্ডিয়া—

ইন্ডিয়া তো ছাড়তেই তারা তৈরি, তবে আর নতুন করে মীটিং করবার কী দরকার ?

কিন্তু না, যেতে যখন হবেই তখন একটা চিহ্ন রেখে যাবো যা দেখে চিরকাল আমাদের কথা মনে পড়বে।

—সেটা কী জুডি ?

জুডি হবসন-এর জন্ম হয়েছিল নটিংহামশায়ারে। পোস্ট-ওয়ার যুগের ইংলিশম্যান। যখন লন্ডনে হিটলারের বোমা পড়ছিল তখন বয়েস খুব কম। একটু-একটু মনে আছে সে-সব কথা, খুব অস্পষ্ট সে-সব স্মৃতি।

নতুন বিয়ে করে বউ নিয়ে এককালের পৈতৃক জমিদারিতে বেড়াতে এসেছে। যে-হোটেলটায় উঠেছে, চৌরঙ্গীর অনেকখানি জায়গা জুড়ে তার পরিধি। বাইরের টুরিস্ট-ট্রাফিক ওই হোটেলেই এসে ওঠে। ক্যালকাটা বললেই টুরিস্টের দল বলে স্ট্র্যান্ড্ হোটেল!

স্ট্র্যান্ড্-হোটেল এমনিতেই সারা সিজন জম-জমাট থাকে। এবার টুরিস্ট বেশি এসেছে। অন্য সকলের সঙ্গে এসেছে জুডি হবসন। আর তার নতুন বিয়ে করা বউ ক্লারা। ক্লারা ডেনহ্যাম।

স্ট্র্যান্ড্ হোটেলের ভেতরে সব সময় আটকে থাকা যায় না। ভেতরে ঠাণ্ডা-ঘরে থেকে বাইরের ক্যালকাটাকে দেখতে পাওয়া যায় না স্পষ্ট করে। তাই লাঞ্চের পর জুডি হবসন স্ট্র্যান্ড হোটেলের আর্কেডের ছাদে দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তার দিকে ঝুঁকে দেখছিল।

পাশে ছিল নতুন বিয়ে করা বউ ক্লারা।

ক্লারা বললে—কী ফেলে গেছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ?

—ওয়ান-আইড ক্যানন—

—তার মানে ?

—একচক্ষু কামান। কালকে গভর্নরস হাউসের গেটের সামনে যে-কামানটা দেখলে ওটার একটা চোখ!

—তুমি জানলে কী করে জুডি ?

জুডি হবসন অনেক জানে। ইন্ডিয়ায় না এসেও অনেক কথা জেনে গেছে, অনেক কথা শিখে গেছে। আগের দিন হলে এই জুডি হবসনই এখানে হয়তো

আই·সি-এস অফিসার হয়ে আসতো। এসে হয়ত ওই গভর্নরস হাউসে এসে উঠতো। তারপর ডিফেন্স-অফ-ইন্ডিয়ার অ্যাক্টে এই ইন্ডিয়ানদেরই অ্যারেস্ট করতো।

ছাদের প্যারাপেট ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগা-পাশ-তলা দেখতে লাগলো জুডি। জুডি আর তার নতুন বিয়ে করা বউ ক্লারা। দিস ইজ ক্যালকাটা। দিস ইজ ইন্ডিয়া। জুড়ির পূর্বপুরুষদের এম্পায়ার। এই ক্যালকাটা থেকেই একদিন কোটি কোটি পাউন্ড ইংলন্ডের ব্যাংকে গিয়ে হাজির হয়েছে, নটিং-হামশায়ারের ক্ষেতে খামারে বাড়িতে গিয়ে ঐশ্বর্য যুগিয়েছে। আজ সমস্ত লস্ট। ইন্ডিয়া এখন সেই লস্ট এম্পায়ার।

—লুক, লুক! দেখ দেখ জুডি দেখ! সমস্ত কলকাতাটাই এখান থেকে দেখা যায়। এই ছাদ থেকে। রাস্তা দিয়ে বাস চলেছে, ট্রাম চলেছে, মানুষ চলেছে আর চলেছে গাড়ি। আর তার ওপরে ঘাস ভর্তি মাঠ। আর তারও ওপাশে অক্টার-লোনী মনুমেন্ট। আনকেল হবসন ছিল ইন্ডিয়ার মিলিটারি সেক্রেটারি। ইন্ডিয়ানদের সম্বন্ধে সব কথাই জানতো কাকা। আনকেল ছুটিতে যখন দেশে যেত তখন গল্প করতো ইন্ডিয়ার। বড় আলসে জাত এই ইন্ডিয়ার নেটিভরা, ঝগড়াবাজ। যদি ইন্ডিয়া স্বাধীন করে দেওয়া হয় তো সব গোলমাল করে ফেলবে। মোস্ট ব্যাকওয়ার্ড রেস। এখন ইন্ডিপেনডেন্ট হয়েছে এই কান্ট্রি। এখন ইন্ডিপেনডেন্ট ইন্ডিয়া দেখতে এসেছে আনকেল হবসনের ভাইপো।

—কিন্তু এক-চক্ষু কামানটা রেখে দিয়ে গেল কেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট? হোয়াই?

জুডি হবসন বললে—আনকেল জানতো একদিন এই গভর্নরস-হাউসের সামনেই আবার গুলি চালাতে হবে নেটিভ গভর্নমেন্টকে। জানতো নিজেরা নিজেদের মধ্যে ফাইট করবে! আমার আনকেল বলতো, নেটিভরা গভর্নমেন্ট চালাতে পারবে না।

—হাউ সিলি!

ক্লারা ডেনহ্যাম সুন্দরী মেয়ে। হাসলে গালে টোল পড়ে। কাল সকালে নেমেছে দমদম এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে ভি-আই-পি রোড ধরে সোজা চলে এসেছিল এই হোটেলে। ন্যাস্টি হোটেল আর ন্যাস্টি সিটি। এই সিটিরই গর্ব করতো তোমার আনকেল? কিন্তু হোয়াই সো ডার্টি টাউন? কেন এত নোংরা? কাল টাউনটা ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছে দুজনে। বড় পুওর পিপল সব। পুওর কান্ট্রি। এই নাকি এককালে ছিল সেকেন্ড সিটি ইন দি ব্রিটিশ এম্পায়ার! হিজ মেজেস্টিজ প্রাইড।

—লুক, লুক জুডি, হোয়াটস্ দ্যাট? ওটা কী?

জুডি হবসন আর দেরি করলে না। হাতের ক্যামেরাটা নিয়ে নিচের রাস্তায় ফোকাস করতে লাগলো। ভেরি বিউটিফুল পিকচার!

—বাট, হোয়াটস্ দ্যাট ? ওটা কী জুডি ?

জুডি হবসনের আনকেল এই ইন্ডিয়াতেই এখানকার গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারি ছিল। অনেক গল্প করেছে আনকেল, কিন্তু এরকম গল্প করেনি। এ-ছবির অনেক দাম হবে। অনেক দামে বিক্রি হবে কনটিনেন্টে।

স্ট্র্যান্ড হোটেলের একজন ওয়েটার-বয় ঘরের ভেতরে কাজ করছিল। তাকেই ডাকলে জুডি। কাম হিয়ার, এদিকে শোন। হোয়াটস্ দ্যাট ? ওটা কী ?

বহুদিনের পুরোন কর্মচারী গুণধর। গুণধর তিরিশ বছর ধরে এই হোটেলের সাহেব-সুবাদের সেবা করে আসছে। সাদা চামড়ার মেমসাহেব দেখেই সেলাম করলে। তারপর ছাদের প্যারাপেটের কাছে এগিয়ে এসে নিচের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলে।

—কই ? কোনটা হুজুর ?

—দেয়ার, দেয়ার—

গুণধর এক মুহূর্তেই বুঝে নিলে ব্যাপারটা। বললে—ও কিছু না হুজুর। পাঁঠা। পাঁঠা কাঁধে করে নিয়ে কালিঘাটে যাচ্ছে।

—কালিঘাট ? হোয়াটস্ দ্যাট ?

—গডেস মা-কালী হুজুর। ওখানে এই পাঁঠাটাকে বলি দিলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে ওদের।

জুডি হবসন কী বুঝলো কে জানে। স্ট্রেঞ্জ ! এ স্ট্রেঞ্জ সাইট ! বাট ভেরি বিউটিফুল।

নিচের রাস্তায় তখন বুধবারি নিজের মনেই উত্তর থেকে দক্ষিণে চলেছে। কাপড়ের খুঁটে সকলকে বাঁধা আছে। হোটেলটার কাছে আসতেই পেছন থেকে বুড়ী মা জিজ্ঞেস করলে—আরে বুধবারি, এ কেয়া মোকান রে ? ইসমে কেয়া হোতা হ্যায় ?

বুধবারি মাথাটা ঘুরিয়ে মোকানটা একবার দেখে নিলে ভালো করে। দেখলে, ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দুজন সাহেব-মেম তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। মা'র কথায় বিরক্ত হয়ে উঠলো বুধবারি।

বললে—থাম বুঢ়িয়া, চুপ রহো—

তবু বুড়ী থামে না। অবাক হয়ে দ্যাখে বাড়িটাকে। একেবারে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত। এত বড় মোকান কিস্‌কা ? কলকাতার জমিনদার হবে বেশখ !

বুধবারি বললে—নেহি, এ ভারি দফতর, সাহাব-লোগকা দফতর।

সাহেবরা যে হিন্দুস্থান ছেড়ে সাগরপারে কবে পাড়ি দিয়েছে, বুধবারিদের সে খবর রাখবার দরকার হয় না। খবরটা বলে সে চলতে আরম্ভ করেছে সামনের দিকে। মা-কালীর মন্দিরের দিকে।

১১১

জুডি হবসন ততক্ষণে ছবি তুলে নিয়েছে ইন্ডিয়ার। ইন্ডিয়া আর ইন্ডিয়ার বুধবারির। কড়া দামে সে ছবি বিক্রি হবে। লন্ডন নিউ-ইয়র্ক ওয়েস্ট-জার্মানীর বাজারে রিয়্যাল ইন্ডিয়ার ছবির দাম আছে খুব।

কিন্তু যে ছবি তুললে আসল ইন্ডিয়ার আরো পরিচয় পাওয়া যেত সে ছবি জুডি হবসন তুললো না। ওই হোটেলের ভেতরেই কাল তোলবার মত অনেক ছবি দেখেছে জুডি হবসন আর ক্লারা ডেনহ্যাম। সারা দুনিয়া দেখবে বলেই তারা হাওয়াই-জাহাজে উড়ে বেড়াতে বেড়াতে ইন্ডিয়াতে এসে ঠেকেছে। কিন্তু ইন্ডিয়ার মাটির তলায় যে সুড়ঙ্গ আছে, আর সেই সুড়ঙ্গের ভেতরে যে ষড়যন্ত্র চলছে তার সন্ধান পেলে না নটিংহামশায়ারের সেই যুগল-টুরিস্ট। যদি সন্ধান পেত তো আমেরিকায় তৈরি ক্যামেরায় তারা তার ছবিও তুলে নিত! আর আরো চড়া দামে পৃথিবীর বাজারে তা বিক্রি করতো!

বুধবারিদের ছবি তুললো বটে, কিন্তু অরবিন্দদের ছবি তো তুলতে পারলে না জুডি হবসন।

কারণ বুধবারিদের মত অরবিন্দরা অত পেট-আলগা নয়। অরবিন্দরা যখন চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় তখন তাদের ধোপ-দুরস্ত সার্ট, পালিশ-করা জুতো, আর সদ্য কামানো দাড়ি দেখে তাদের হাঁড়ির খবর রাখবার কথা কারো মনে আসে না। বেণুদিরা যখন ভবানীপুরের ফ্ল্যাট-বাড়িতে ফার্নিচার সাজিয়ে সংসার করে আর টিকে দিয়ে বেড়ায় পাড়ায়-পাড়ায়, তখন কেউ সন্দেহ করে না যে, সেই ফার্নিচার সাজানো ফ্ল্যাট-বাড়ির ভেতরেই আবার অন্ধকারের ষড়যন্ত্র কত কুটিল হয়ে ওঠে। কিংবা সুসীরা যখন স্টুডেন্ট সেজে সমীরদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে সিনেমা দ্যাখে কিংবা স্ট্র্যান্ড হোটেলের ভেতরে পাম্-গ্রোভের পাশে বসে কফি খায়, তখন জুডি হবসনরা বুঝতেও পারে না, ঘণ্টা পিছু কত করে রেট এ-মেয়েদের। জানতে পারে না কারা এদের সাপ্লাই করে। জানতে পারে না কাদের কাছে এদের চাহিদা।

যেদিন জুডি হবসন আর ক্লারা ইন্ডিয়া দেখতে এই হোটেলে এসে উঠলো সেদিন সুসী এখানেই এসেছিল এই হোটেলের পাম্-গ্রোভে।

—সিনেমাটা কেমন লাগলো?

গভর্নমেন্ট গেজেটেড অফিসারের ছেলে সমীর এই লাইনে আনকোরা। বাজারে নতুন বেরিয়েছে। বেণুদি আগে অনেককে দিয়েছে তার সঙ্গে। আগেকার মেয়েরা সিনেমা থেকে বেরিয়েই নিউ-মার্কেটে যেতে চেয়েছে। সেখানে গিয়ে যা হাতের কাছে পায় তাই কিনেছে। এ সে-জাতের নয়।

সিনেমা থেকে বেরিয়েই সমীর জিজ্ঞেস করেছিল—এখান থেকে কোথায়

যাবে ?

অন্য মেয়েরা হলে জবাব দিত—চলো নিউ-মার্কেটে যাই—

সুসী বলেছিল—যেখানে নিয়ে যাবে।

—হাতে তোমার খাতা কীসের ?

—কলেজের খাতা।

—সত্যি সত্যিই কলেজে পড়ো, না লোক-দেখানো ?

সুসী বলেছিল—তুমি দেখছি এর পরে আমার হাঁড়ির খবরও জিজ্ঞেস করবে !

সমীর বলেছিল—সত্যি বলো না, তোমাদের বাড়ি কোথায় ?

সুসী বলেছিল—বেণুদির কাছে খবর দিলেই আমি খবর পাবো।

—তুমি বুঝি তোমার ঠিকানা বলবে না ?

—বলা নিয়ম নেই।

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমায় যেন কোথায় দেখেছি !

—তা দেখতে পারো। যে আমাদের টাকা দেয় তার সঙ্গেই আমরা বেরোই, তার সঙ্গেই আমরা সিনেমায় যাই। আমরা তো সুখের পায়রা।

—এখন যাবে কোথায় তাই বলো।

—বলছি তো যেখানে নিয়ে যাবে।

—কতক্ষণ থাকতে পারবে ?

—বেণুদি তোমাকে বলেনি কিছু ?

—কই, কিছু মনে পড়ছে না তো ? কী সম্বন্ধে ?

—আমার রেট সম্বন্ধে ? সন্ধ্যে ছ'টার পর আমার রেট ঘণ্টায় দশ টাকা। আর রাত দশটার পর আমি কারো নয়।

—বড় বেশি রেট করেছ তো ?

—তা সব জিনিসের দাম বেড়েছে, আর আমাদের রেট বাড়বে না ? এতে যদি রাজী থাকো তো বলো, যেখানে খুশী তোমার চলো—

তা সেই সূত্রেই সুসীকে নিয়ে সমীর চলে এসেছিল এইখানে। এই স্ট্র্যান্ড হোটেলের পাম্-গ্রোভে।

ওদিকে জুডি হবসনও বউ নিয়ে তখন সবে সেখানে এসে বসেছে।

সমীর বললে—ওরা টুরিস্ট, ইন্ডিয়া দেখতে এসেছে—

সুসী বললে—ওরা তোমার মতই বড়লোক !

—আমি বড়লোক, তা তোমাকে কে বললে ?

—বড়লোক না হলে তুমি আমার পেছনে এত টাকা খরচ করেছো কী করে ? এখানে কী সবাই আসতে পারে ? তুমি নিয়ে এসেছ বলেই তো আমি আসতে পেরেছি। নইলে কি এখানে এসে কফি খাওয়ার মত পয়সা আছে আমার ?

সমীর একটা সিগারেট ধরালে। বললে—সিগ্রেট খাবে ?

—সিগ্রেট খেলে আরো পাঁচ টাকা বেশি দিতে হবে কিন্তু।

—তা না হয় দেব। কিন্তু সব কথাতে তোমার এত টাকা-টাকা কেন বলো তো ?

সুসী বললে—আমি টাকা-টাকা করলেই দোষ, আর সারা পৃথিবীর লোক যে টাকা-টাকা করছে ! তার বেলায় ? আমি কি পৃথিবীর বাইরে ?

—ওই দ্যাখ, ওই মেমসাহেবটা কেমন সিগ্রেট খাচ্ছে ! ও তো সিগ্রেট খাওয়ার জন্যে টাকা-টাকা করছে না ?

সুসী বললে—ও তো ওই সাহেবটার বউ !

—তা না-হয় তুমিও এখানে দু'ঘন্টার জন্যে আমার বউ-ই সাজলে !

—দায় পড়েছে আমার। বিয়ে করলে তোমার মত লোককে বিয়ে করবো কেন ? তোমরা তো কেবল মেয়েমানুষের পেছনে টাকা ওড়াও। যারা লম্পট তাদের বিয়ে করতে যাবো কোন্ দুঃখে !

সমীর বললে—আমি যদি লম্পট হই তো তুমি কী ? সতী ?

সুসী বললে—খবরদার বলছি চেঁচামেচি কোর না—

কিন্তু ঝগড়াটা আর বেশি গড়ালো না। হঠাৎ দূর থেকে শিরীষবাবুকে আসতে দেখা গেল। দেখেই চিনতে পেরেছে সুসী। একদিন মাত্র দেখেছে ভদ্রলোককে। গলিটার সামনে তাঁর বিরাট গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। আর ভদ্রলোক তখন আট নম্বর বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন।

দাদার বন্ধু। দাদাই তাড়াতাড়ি আলাপ করিয়ে দিতে এসেছিল—এই আমার সিসটার, আসুন শিরীষবাবু, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই আমার সিসটারের—

মনে আছে, শিরীষবাবুর মুখ দিয়ে যেন লালা গড়িয়ে পড়ছিল। লাল পানের লালা।

শিরীষবাবু হাত-জোড় করে নমস্কার করে এগিয়ে এসেছিল।

—ও, আপনার নামই তো সুসীমা দেবী ! আপনার কথা অনেক শুনেছি অরবিন্দবাবুর মুখে।

সুসী একটা শুকনো নমস্কার করে ঠোঁটে হাসি ফোটাবার ভদ্রতা করেছিল।

—কলেজ থেকে আসছেন বুঝি ?

মাঝখান থেকে অরবিন্দ বলেছিল—জানেন শিরীষবাবু, আজকাল কলেজের মাস্টারগুলো কিন্তু পড়ায় না, শুধু বসে বসে মাইনে খায়—কেবল ফাঁকি—শুধু নোট-বই লেখে !

শিরীষবাবু বলেছিল—অনেস্ট লোক যে সব শেষ হয়ে গেছে দুনিয়া থেকে অরবিন্দবাবু, আমরা কয়েকজন চলে গেলে পৃথিবীটা একেবারে মরুভূমি হয়ে

যাবে—

হয়ত আরো অনেকক্ষণ কথা বলবার ইচ্ছে ছিল।

অরবিন্দ বলেছিল—একটু বেড়িয়ে আসবি নাকি রে সুসী, শিরীষবাবুর গাড়ি রয়েছে, চল না আমিও যেতে পারি সঙ্গে—

শিরীষবাবু কথাটা লুফে নিয়ে বলেছিলেন—চলুন না, আমার গাড়িই আছে, চড়বার লোকের অভাব—

অরবিন্দ টপ করে বলেছিল—চড়বার লোকই যদি না থাকে তো তিনখানা গাড়ি কেন কিনতে গেলেন মিছিমিছি ?

—ওই বলে কে ? আর এত টাকা নিয়েই বা আমি কী করবো তাই বা কে জানে !

সাত নম্বরের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল।

অরবিন্দ আবার বলেছিল—কী রে সুসী, যাবি ?

—চলুন না। শিরীষবাবুর মুখ দিয়ে আরো লালা গড়াতে লাগলো।

সুসী বলেছিল—মাফ করবেন, আমি এখন খুব টায়ার্ড—

বলে হঠাৎ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, আর বেরোয়নি।

তারপর কতদিন শিরীষবাবু তাদের বাড়িতে এসেছে, কত হাঁড়ি হাঁড়ি রাবড়ি এনে মা'কে দিয়েছে। মা কতবার বলেছে—খোকা তোর এই বন্ধুটা খুব ভালো তো। এর রাবড়িটা খুব মিষ্টি !

দাদা বলতো—মিষ্টি হলে কী হবে মা, তোমরা তো কেউ খাতির করো না ওঁকে।

মা রেগে উঠতো।—কেন ? খাতির করিনে মানে ? বৌমা চা করে দেয় না ?

—বৌমা চা করে দিলেই বা !

—তা আমি কী করে খাতির করি বল তো ? আমার কি পোড়া চোখ আছে ? আমাকে তো একটা চশমাও করে দিলিনে তুই ?

অরবিন্দ রেগে যেত। বলতো—তুমি বুড়ো মানুষ, চোখে দেখতে পাও না, তোমাকে কি আমি খাতির করতে বলেছি যে বড় বলছো ? কিন্তু তোমার ধাড়ি মেয়ে তো বাড়িতে রয়েছে, সে তো হাতে করে চা-টা পানটা দিয়ে আসতে পারে। তাতেও খুশী হয়ে যায় মানুষটা !

—তা বৌমা তো দেয়। সুসী হোক বৌমা হোক, যে কেউ একজন দিলেই তো হলো।

অরবিন্দ রেগে যেত। বলতো—ওই তোমার এক কথা, কেবল বৌমা বৌমা আর বৌমা। বৌমার বুকের অসুখ তা জানো ? ওই বুকের অসুখ নিয়ে এত ধকল সহ্য হয় ? কেন, তোমার অত বড় ধাড়ি মেয়ে একটা কাজ করতে পারে না ? সে কি এ-বাড়ির কেউ নয় ? বৌমা একলাই খেটে খেটে মরবে ?

আশ্চর্য, সেই শিরীষবাবুকেই এই হোটেলের ভেতরে দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল সুসী। মনে হলো শিরীষবাবু যেন একলা নয়। সঙ্গে যেন আর কেউ রয়েছে। আর একজন মেয়েমানুষ। কিন্তু ভদ্রলোক তো বলেছিল তার বউ নেই।

সমীরের ওঠবার ইচ্ছে ছিল না। সুসী বললে—চলো, উঠি—

সমীর বললে—কেন, এত তাড়াতাড়ি কীসের? আমি তো ঘন্টা পিছু দশ টাকা দেব বলেছি—

—না, আমি এখন উঠবো, বাড়ি যাবো।

কথা শেষ হবার আগেই শিরীষবাবু এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ালেন—এই যে সুসীমা দেবী। কেমন আছেন?

যেন আচমকা বেত মেরেছে কেউ সুসীকে এমনিভাবে সে পেছনে ফিরলো। বললে—কাকে বলছেন আপনি?

—আপনার নামই তো সুসীমা দেবী?

—কী বলছেন আপনি? কে সুসীমা দেবী?

—আপনার নাম সুসীমা দেবী নয়? আপনারই ডাকনাম তো সুসী?

সুসী অবাক হবার ভান করলে। বললে—আপনি কাকে কী বলছেন? কে আপনি?

শিরীষবাবুও সত্যি সত্যিই আকাশ থেকে পড়েছে! বললে—সে কী? আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমার নাম শিরীষ দাশগুপ্ত। আপনার দাদার নামই তো অরবিন্দবাবু? সেই আপনাদের হারান নস্কর লেনে আট নম্বর বাড়িতে আমি গিয়েছিলুম।

সুসী বললে—আমার মনে পড়ছে না, আপনি ভুল করছেন!

—এ কি, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন! আপনার বুড়ো মা আছেন বাড়িতে, আমি রাবড়ি নিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম!

—খবরদার বলছি বাজে কথা বলবেন না। মদ খেয়ে মাতলামি করবার আর জায়গা পাননি? চলো সমীরদা, চলো—

—কী?

শিরীষবাবুর বোধহয় অপমানে তখন নেশা ছুটে গেছে। জীবনে টাকার জোরে অনেক অপকীর্তির নায়ক হয়েছেন তিনি, কিন্তু এমনভাবে প্রকাশ্য স্থানে অপমানের মুখোমুখি হবার দুর্ভাগ্য বোধহয় তাঁর এই প্রথম!

—আচ্ছা, আমিও দেখে নেব! অনেক রাবড়ি খরচ করেছি তোমার মায়ের পেছনে, অনেক পায়ের ধুলো নিয়েছি···

জুডি আর ক্লারা একটু দূরেই দুটো চেয়ারে বসে সফট্-ড্রিঙ্ক খাচ্ছিল। পাশের প্রোভের তলায় একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে বিলিতি জ্যাজ মিউজিক

বাজছে। হঠাৎ ঝগড়ার শব্দে টুরিস্টদের তাল কেটে গেল।

—ওখানে কী হলো দ্যাখো জুডি। লুক! লুক!

ক্লারা দেখছিল। জুডিও মুখ ফিরিয়ে দেখলে। ওরা নেটিভ। আমার আনকেল বলতো আগে নেটিভদের এই হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হতো না এই জন্যে। দে অলওয়েজ ফাইট উইথ ওয়ান-অ্যানাদার। কুকুরের মত কেবল ঝগড়া করবে।

জুডি বললে—দে আর লাইক দ্যাট—

ক্লারা বললে—কিন্তু হোয়াই ডু দে কোয়ারল? ওরা ঝগড়া করছে কেন?

জুডি বললে—আমার আনকেল বলতো, বেঙ্গলীরা কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। কারো কিছু ভালো হলে ওরা জ্বলে-পুড়ে মরে—। ইন্ডিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কোয়ারলিং রেস—

—স্ট্রেঞ্জ!

জুডি বললে—এই বেঙ্গলে স্ট্রেঞ্জ বলে কিছু নেই। এনিথিং মে হ্যাপেন এনি টাইম—।

তারপরে বললে—আজ বিকেলে দেখলে না গভর্নরস-হাউসের সামনে রাস্তার দিকে মুখ করে একটা কামান পড়ে আছে? ওটা চাইনিজ কামান। ওই কামান দিয়েই এতদিন আমরা এই বাঙালীদের শায়েস্তা করে এসেছি। এখন আবার ঠিক তেমনি করে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টও ওই কামান দিয়ে এদের শায়েস্তা করে রেখেছে—

—কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চলে যেতে গেল কেন জুডি? হোয়াই?

জুডি বললে—এই বেঙ্গলীদের জন্যে। এরা কারো অথরিটি মানবে না। আমাদের অথরিটিও মানেনি, নিজেদের গভর্নমেন্টের অথরিটিও মানছে না। আমার আনকেল আমাকে সব বলেছে—

—স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

কিন্তু ওদিকে তখন পাম্-গ্রোভের তলায় তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে। সুসী যত চেঁচায়, শিরীষবাবুও তত চেঁচায়। চারদিক থেকে দৌড়ে এল হোটেলের ম্যানেজার, কেয়ার-টেকার বয়, খানসামা, চাকর, সবাই।

শিরীষবাবু হোটেলের পুরোন খদ্দের। তাকে সবাই চিনতে পেরেছে। হোয়াটস্ আপ স্যার? কী হয়েছে স্যার? দিস লেডী? হু ইজ সি? এ কে? হু আর ইউ?

সুসীর চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে।

বললে—চলো সমীরদা, আমরা চলে যাই, এই জন্যেই তো আমি কারো সঙ্গে হোটেলে আসি না।

সমীর বাইরে বেরিয়ে বললে—কিন্তু ও-লোকটা কি তোমায় চেনে?

—ও কাকে ভুল করে কাকে ধরে টানাটানি করছে!

—কিন্তু ও তো তোমার বাড়ির ঠিকানা বলছে, তোমার দাদার নাম বলছে, তোমার বৌদির নাম বলছে, তোমার নাম বলছে!

সুসী বললে—দাও, আমার টাকা দিয়ে দাও, আমি চলে যাই,—

—কত টাকা হয়েছে?

সুসী বললে—সিনেমা দেখেছি, তার দশ টাকা আর এই চার ঘণ্টার চল্লিশ টাকা। যত ছোটলোকের আড্ডা এখানে, আর কখ্খনো এখানে আসবো না। বাজারের মেয়েমানুষ নিয়ে এখানে ফুর্তি করতে এসেছে আর ভদ্রলোকদের মেয়েদের নিয়ে টানাটানি—দাও—

টাকাটা গুণে নিয়ে সুসী টপ করে বাসে উঠে পড়লো।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

আস্তে আস্তে লোক জমতে জমতে প্রোসেসানটা ততক্ষণে অনেক লম্বা হয়ে গেছে। মাঝখানের লাইনে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ গড্ডালিকায় এগিয়ে চলেছে। সকালটা আজ মন্দ কাটছে না। নইলে রোজই সেই টাকার চিন্তা আর ভাল লাগে না। সকাল থেকে সুরু করে কেবল সারাদিন টাকা আর টাকা।

আর জিনিসপত্রের দামও যেন বাড়ছে হাউই-এর মত হু-হু করে। কিন্তু হাউই-এর মত হু-হু করে তো পড়বার নাম নেই। ডাক্তার বলেছিল গোপাকে একটু করে মাংস খাওয়াতে। মাংসের দোকানে সার সার পাঁঠা সাজানো থাকে। হাঁ করে রাস্তার দিকে চেয়ে দোকানদার খদ্দের ধরবারও চেষ্টা করে। অথচ দেখতে-না-দেখতে সে মাংস ফুরিয়েও তো যায়।

সেদিন ঝগড়াই করে ফেলেছিল অরবিন্দ বাজারে গিয়ে।

গাঁয়ের লোক। গাঁ থেকে মুলোটা বেগুনটা নিয়ে বাজারে আসে।

বলেছিল—কোত্থেকে দেব বাবু, দেশ-গাঁয়ে এক পালি চাল আড়াই টাকা। আমরা একবেলা কচুর শাক সেদ্ধ করে খেয়ে বেঁচে আছি—তা জানেন?

অরবিন্দ বলেছিল—আর আমাদেরই বুঝি টাকা সস্তা?

সত্যিই, টাকা যে কত কায়দা করে উপায় করতে হয় তা অরবিন্দই জানে। শিরীষবাবুদের আর ভাবনা কী। এদিকে হারান নস্কর লেনেও আসছে, আবার খদ্দর পরে রাজভবনেও যাচ্ছে। সেই রাজভবন! রাজভবনের ভেতরে কখনও যায়নি অরবিন্দ। কিন্তু বাইরে থেকে দেখছে একটা বিরাট কামান সামনে সাজানো আছে। দিলীপদা'র টেলিফোনের বিল দিতে যেতে হয়েছিল ওই পাড়ায়।

লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেতরে চেয়ে দেখছিল অরবিন্দ।

হঠাৎ একটা গাড়ির ভেতরে দেখলে শিরীষবাবু বসে আছে।

—শিরীষবাবু, শিরীষবাবু!

সেই গাড়িটা। যে গাড়িটা চড়ে শিরীষবাবু এসেছিল অরবিন্দর বাড়িতে!

—শিরীষবাবু, এই যে, আমি অরবিন্দ। কোথায় যাচ্ছেন? ও শিরীষবাবু—

কিন্তু আশ্চর্য। গাড়িটা বোধ হয় একটু থেমেছিল ডাক শুনে। শিরীষবাবু একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেও ছিল, কিন্তু যেন চিনতে পারলে না। শিরীষবাবু এক পলক অরবিন্দকে দেখেও চোখ ফিরিয়ে নিলে। যেন কে-না-কে কাকে ডাকছে। পাশেই ছিল ভুধরবাবু।

ভুধরবাবু বললেন—কে যেন ডাকলে না আপনাকে রাস্তা থেকে?

—কে? কই?

শশব্যস্ত হয়ে শিরীষবাবু এদিক-ওদিক তাকালেন। বললেন—এই দেখুন, পাবলিক ওয়ার্ক করতে করতে কত লোকের সংস্পর্শে যে আসতে হয়, সকলকে সব সময়ে চিনতেও পারিনে।

গাড়িটা তখন রাজভবনের চেক-পোস্ট পেরিয়ে অনেকখানি ভেতরে গড়িয়ে গেছে।

শিরীষবাবু জিজ্ঞেস্ করলেন—আপনি চীফ-মিনিস্টারকে সব বুঝিয়ে বলে রেখেছেন তো?

ভুধরবাবু গভর্নমেন্ট-মহলের নামজাদা লোক। সর্বঘটে আছেন তিনি। কোথায় কোন্ মহলে কাকে ধরলে কার কী কাজ হবে তা তাঁর নখদর্পণে। এ-সব ব্যাপারে তিনি বোধহয় ম্যাজিক জানেন। এগজিবিসন হবে ময়দানে, সেখানে কারো স্টল নেওয়া দরকার, ভুধরবাবুকে ধরো, তিনি সস্তায় সব ম্যানেজ করে দেবেন। বাড়ি করতে পারছেন না টাকার অভাবে, গভর্নমেন্ট থেকে লোন নেওয়া দরকার। এমনিতে দরখাস্ত করলে সে দরখাস্ত ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে চলে যাবে। কিন্তু ধরুন ভুধরবাবুকে। তিনি এক মিনিটে সব আদায় করে দেবেন। যাকে বলে ক্ষমতাবান লোক। ভুধরবাবু তাই।

কিন্তু শিরীষবাবুর কথা আলাদা। শিরীষবাবুকে উপকার করা মানে নিজেরই উপকার।

—জমির কথা আগে থেকে বলে রেখেছেন তো ভুধরবাবু?

ভুধরবাবু বললেন—আপনি পাবেন শিরীষবাবু, আপনি জমি পাবেন। চীফ-মিনিস্টার যাই বলুন, আপনি জমি পেলেই তো হলো?

যে কথা শিরীষবাবু হামেশা সবাইকেই বলেন, সেই একই কথা ভুধরবাবুকে বললেন। বললেন—আমি তো আর নিজের খাওয়া-পরার জন্যে করছি না এ সব ভুধরবাবু, আমার বউও নেই ছেলেও নেই যে তাদের জন্যে জমাবো।

তাছাড়া টাকা-কড়ি হলে লোকের কত রকম বদখেয়াল থাকে। আমার তো সে-সব বালাই নেই। জীবনে কখনও মেয়েমানুষের মুখদর্শনও করলাম না, নেশা-ভাঙ করতেও শিখিনি যে তাতে টাকা ওড়াবো। ছোটবেলায় দেশের কাজে মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই ভাবলাম, চাকরি আর করবো না, করলে ব্যবসাই করবো। স্যার পি সি রায়, আমাদের সেই শিক্ষাই যে দিয়ে গেছেন। তা···

ভূধরবাবু বললেন—এ-সব কথা চীফ-মিনিস্টারের কানে আমি অল্‌রেডি তুলে দিয়েছি—

—আমি মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গিয়েছিলাম সেটাও বলেছেন তো ?

—আপনাকে বললাম তো যে জমি আপনি পাবেন ! আপনার ফ্যাক্টরি হবে এটা তো আর আপনার নিজের কাজ নয় মশাই। দেশের কাজ। দেশে নতুন ইনডাসট্রি হলে তো গভর্নমেন্টেরই লাভ মশাই। গভর্নমেন্টই তো বলছে প্রোডাকশান বাড়াতে !

শিরীষবাবুর তবু ভয় গেল না। বললেন—কিছু দিতে-টিতে হবে নাকি ?

চমকে উঠলেন ভূধরবাবু। বললেন—কাকে ? চীফ-মিনিস্টারকে ? আপনি কি পাগল হয়েছেন ?

—না না, তা বলছি না, আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি। চীফ-মিনিস্টারকে ঘুষ দেবার কথা কখনও আমি ভাবতে পারি ?

ভূধরবাবু বললেন—সে যখন ডিপার্টমেন্টে যাবে তখন দিতে হবে। কত দিতে হবে সে আমি সময়মত বলে দেব।

শিরীষবাবু বললেন—সে-জন্যে আমার কিছু ক্যাশ কিন্তু আলাদা করা আছে।

—সেটা আলাদা করেই রেখে দেবেন, যেন হঠাৎ দরকার হলে দিতে দেরি না হয়।

—আসলে আমার ভয় হচ্ছে কেন জানেন রেসিডেন্সিয়াল-কোয়ার্টারের জন্যে গভর্মেন্ট প্লট করছে। সেখানে ফ্যাক্টরি করবো এটা যেন ডিপার্টমেন্ট চেপে যায় !

—নিশ্চয়ই চাপবে ! আর এখনও স্কীমটা বাইরে আউট হয়নি, এখন তো কারো জানবার কথা নয়। খবরের কাগজে যখন বিজ্ঞাপনটা বেরোবে তার আগেই যাতে প্লটটা অ্যালট করা হয়ে যায়, সেইজন্যেই এত তোড়জোড়, নইলে আর কী !

গাড়িটা একেবারে রাজভবনের পোর্টিকোর তলায় পেঁছোতেই ভূধরবাবু নামলেন। বললেন—আসুন, এখানে গাড়িটা থাক, ওদিক দিয়ে ঘুরে যেতে হবে, চিফ-মিনিস্টার ওই দিকের বাড়িতে থাকেন—

অরবিন্দ হাঁ করে সেই গেটটার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটা অদৃশ্য হতেই

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে। গেটের ভেতরে চেক-পোস্টের সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। তারা অরবিন্দর দিকে কেমন সন্দেহজনক দৃষ্টি দিয়ে চাইতে লাগলো।

তারপর তার দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে—এখানে কী চান মশাই? কী দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? এখানে কীসের দরকার, হ্যাঁ?

অরবিন্দ তাড়াতাড়ি আর কিছু না বলে পাশে সরে এল। বিরাট কামানটা সাজানো রয়েছে রাস্তার দিকে মুখ করে। অরবিন্দর মনে হলো কামানটা যেন এক চোখ দিয়ে তার দিকে দেখছে। এক চোখ দিয়ে তার দিকে গুলি তাগ করছে।

ওটা কেন রেখেছে ওখানে কে জানে! ভয় দেখাচ্ছে? কাকে ভয় দেখাচ্ছে? গরীবদের? না চোর-ডাকাতদের?

যার দিকেই তাগ করুক, যাকেই ভয় দেখাক, অরবিন্দর ওখানে যাওয়ার দরকার কী? শেষকালে তাকেই হয়ত গুলি খেয়ে মরতে হবে। অরবিন্দ মরে গেলে কেউ প্রতিবাদও করবে না। কেউ প্রতিকারও করবে না। তার কেউ নেই সংসারে। বরং তার ওপরে নির্ভর করে একটা সংসার কোনও রকমে খেয়ে পরে বেঁচে আছে। তখন তাও থাকবে না। তখন মাকে রোজ রোজ রাবড়ি যোগাবে কে? তখন দুটো বাড়ির ভাড়াই বা কোত্থেকে জুটবে? তখন গোপাই বা কী করে পেট চালাবে? যা শরীর! একটু মোটা হলে তবু কথা ছিল। মোটা হলে শিরীষবাবুর হয়ত তবু পছন্দ হতো!

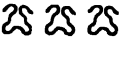

সেখান থেকে যাদবপুরে ফিরে গিয়েই দিলীপদা'কে সেই কথাই বললে অরবিন্দ।

'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র মালিকের কাছে এ-সব কথা নতুন নয়। বললে—তা তোকে পাঠালুম টেলিফোনের বিল জমা দিতে, তুই আবার রাজ-ভবনের সামনে গেলি কেন?

অরবিন্দ বললে—ভাবলাম এত দূরে এসেছি, একটু ডালহৌসী-স্কোয়ারটা দেখে যাই।

—কত ট্রাম ভাড়া লাগলো?

অরবিন্দ বললে—ট্রাম-ভাড়াটা আমি বাঁচিয়েছি দিলীপদা—

—কী করে বাঁচালি?

—ভাড়া দিলুম না।

—সে কী রে? তোকে ভাড়া না নিয়ে চড়তে দিলে?

অরবিন্দ বললে—না, তা নয়, যেই ভাড়া চাইতে এল কনডাকটার আর অমনি

নেমে পড়লুম। নেমে পেছনের ট্রামে উঠলুম। এমনি করে কেবল উঠেছি আর নেমেছি—

—তা বেশ করেছিস। বিলটা দে।

অরবিন্দ বিলটা দিয়ে দিলে। বললে—কিন্তু তোমার বন্ধু শিরীষবাবুর কাণ্ডটা কেমন দেখলে তো? আমাকে মোটে চিনতেই পারলে না। অথচ আমাদের বাড়িতে যখন আসেন তখন আমি নিজের হাতে চা করে দিই, তা জানো?

—সে সব তো শুনেছি। কিন্তু কথা ছিল তোর বোনের সঙ্গে তুই আলাপ করিয়ে দিবি, তার বেলায়!

অরবিন্দ বললে—কী করবো দিলীপদা, তুমি তো সুসীকে জানো। কী রকম জাঁহাবাজ মেয়ে সে তো তোমার জানতে বাকি নেই। কিছুতেই রাজী হয় না। আমি কত করে বললাম যে মস্ত বড়লোক, তুই একটু ওর গাড়িতে চড়ে লেকের দিকে বেড়িয়ে আয়, তা কিছুতেই শুনলে না—

—অথচ বারো টাকা দিয়ে এক কিলো রাবড়ি কিনে দিলে তোর মা'কে শিরীষবাবু—

—সত্যি খুব ভাল রাবড়িটা দাদা! খুব সর ছিল ভেতরে।

—দূর হতভাগা, দিলে তোর মা'কে আর তুই খেলি?

অরবিন্দ বললে—মা যে দিলে! আমি কি একলা খেয়েছি? আমি খেয়েছি, গোপা খেয়েছে, সুসী খেয়েছে।

—শিরীষবাবুর রাবড়ি খেতে তো তোর বোনের বাধলো না! যাই বলিস, তোর বোনটা সুবিধের নয় তেমন।

অরবিন্দ বললে—সে তো হাজার বার! সে আর বলতে! যদি একটু বিবেচক হতো দিলীপদা তো আজকে আমার ভাবনা! অত বড় ধাড়ি বোন থাকতে আমার এই অভাব ভাবতে পারো? তুই তো দেখতে পাচ্ছিস দাদার হাল, দেখতে পাচ্ছিস তোর বৌদির স্বাস্থ্য, দেখতে পাচ্ছিস টাকার জন্যে মা'র একটা চশমা পর্যন্ত করতে পারছি না। সবই তো দেখতে পাচ্ছিস, তবু তোর সংসারের জন্যে একটু দয়া হয় না রে!

দিলীপ বললে—আজ আমি একটা কথা তোকে বলে রাখছি অরবিন্দ, তুই তোর বোনের জন্যে অত করছিস তো, একদিন কিন্তু তোর বোন তোকে কলা দেখিয়ে দেবে, তা বলে রাখছি—

অরবিন্দ বললে—তা আমি জানি দিলীপদা, আমার কপালে অনেক দুখু আছে!

—তোর বোন লুকিয়ে লুকিয়ে হোটেলে গিয়ে লোক বসায়, তা জানিস?

—না না, কী যে বলো তুমি দিলীপদা, সুসী অত খারাপ নয়।

—খারাপ নয় মানে ? তুই প্রমাণ চাস ?

অরবিন্দ বললে—না না, ওই সিল্কের শাড়ি পরে বলে বলছো তো ?

দিলীপদা বললে—না, তা নয়, শিরীষবাবু নিজে সাক্ষী আছে। তোর বোনকে বাইরের লোকের সঙ্গে হুইস্কি খেতে দেখেছে !

—ছিঃ, কী যে তুমি বলো দিলীপদা। সুসীর অত সাহস হবে না।

—বেশ, তাহলে শিরীষবাবুর সঙ্গে মুকাবিলা করে দেব তোর। তুই শিরীষবাবুর মুখ থেকেই শুনিস। শিরীষবাবু তো আর মিথ্যে কথা বলবে না !

অরবিন্দ যেন আকাশ থেকে পড়লো। খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না তার। সুসীকে যে সে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। সেই সুসী লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাবে এ-কথা কল্পনা করতেও যেন অরবিন্দর কষ্ট হলো। খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল দিলীপদা'র মুখের দিকে।

—তুমি সত্যি বলছো দিলীপদা ?

দিলীপদা হেসে উঠলো হো হো করে। বললে—তোর বোন একলা মদ খাচ্ছে নাকি ? তুই অত অবাক হচ্ছিস কেন ? সবাই তো খায় রে। নইলে আজকালকার বাপ-মা'দের মেয়ের খরচ যোগানো সোজা নাকি ? ক'টা বাপ-মায়ের সে-ক্ষমতা আছে শুনি ?

অরবিন্দ তখনও সামলে উঠতে পারেনি।

দিলীপদা বললে—যা যা, তিনটে বাজলো, ভাত টাত খেয়ে নিগে যা—

সারাদিন অরবিন্দ ডালহৌসী স্কোয়ারে টো-টো করে ঘুরেছে। সকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয়নি। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো তার। তারপর আর কোনও কথা না বলে সোজা একেবারে হারান নস্কর লেনের দিকে পা বাড়ালো। সুসী মদ ধরেছে···সুসী মদ ধরেছে···সুসী মদ ধরেছে···

♧ ♧ ♧

লম্বা মিছিলটা কলকাতা লক্ষ্য করেই চলেছে। সেই তারই মাঝখানে একমনে নিজের কথা ভাবতে ভাবতেই আজ স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়েছে অরবিন্দ। চলো, কলকাতা চলো। অনেক দূর থেকে আমরা সবাই কলকাতায় চলেছি। সেখানে গেলেই আমরা আমাদের পাওনা পেয়ে যাবো। চলো ভাই, কলকাতা চলো ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

সবাই মিলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো—চলো চলো কলকাতা চলো—

আর শুধু কি একলা অরবিন্দ ? অনাদিকাল ধরে সবারই তো একই লক্ষ্য। সবাই কলকাতায় যায়। কলকাতাই তো বাঙালীর স্বর্গ। ভিখিরি হতে গেলেও কলকাতায় যেতে হবে, আমীর হতে গেলেও কলকাতায় যেতে হবে। লেখাপড়া

শিখতে চাও ? কলকাতায় চলে এসো। লেখাপড়া ভুলতে চাও, কলকাতায় চলে এসো। সাধু হতে গেলে এখানে আসতে হয়, চোর হতে গেলেও এখানেই আসতে হয়। সেই আদিকাল থেকে দলে দলে সব দেশের লোক এখানেই এসেছে। এই কলকাতায়। তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও একদিন যেমন এসেছেন, তেমনি এসেছিলেন নন্দকুমার। এসেছে মাড়োয়ারী, গুজরাটি, পার্শি, শিখ, হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ সবাই। সেই আদিকাল থেকে কলকাতা লক্ষ্য করেই সবার গতি, কলকাতায় এলেই সকলের মুক্তি।

জুডি হবসন জন্মেছে কোন্ এক দেশে, তারও যেন এই কলকাতায় না এসে মুক্তি ছিল না। হাজার হাজার পাউন্ড খরচ করে এখানে ঠিক এই সময়ে তার না এলে কী এমন ক্ষতি হতো ?

কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধানে যেমন বুধবারিকে সেই জয়চণ্ডীপুরের কুঁড়েঘরটা ছেড়ে এই কলকাতাতে আসতে হয়েছে, জুডি হবসন আর ক্লারা ডেনহ্যামকেও তাই।

রাত্রে ডিনার খেতে খেতে 'ডাইনিং হলে' চারদিকের আবহাওয়া দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল জুডি হবসন।

সকাল থেকেই হোটেলের ওয়েটারগুলো ছেঁকে ধরেছে। এক টিন সিগারেট আনতে দিলে তারা পাঁচবার সেলাম করে। অথচ আনকেল হবসন যখন এখানকার বেঙ্গল গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারি ছিল তখন এদের কতলোককে গুলী করে মেরেছে। নিজের হাতে রাইফেল নিয়ে কতলোককে গুলী করেছে এই কলকাতার রাস্তায়।

—রাস্তার ওপর গুলী করেছে ?

সমস্ত কলকাতাটা ছিল একটা কেল্লা। ওদিকে শ্যামবাজারের মোড় থেকে সুরু করে ওদিকে সাউথে টালিগঞ্জের শেষ পর্যন্ত সমস্ত এরিয়াতে পুলিশ লোক খুঁজে বেড়িয়েছে খুন করবার জন্যে। নেটিভ দেখলেই খুন। কিন্তু পুলিশের গাড়ি দেখলেই নেটিভরা গলি-ঘুঁজির মধ্যে ঢুকে পড়তো। তখন আর তাদের পাত্তা পাওয়া যেত না। মেশিনগান নিয়ে আমরা তাড়া করেছি নেটিভদের পেছনে-পেছনে। তারা বাড়ির ভেতর থেকে ঢিল মেরেছে। ভাঙা ইঁটের টুকরো। তাই দিয়ে আমার আর্মির সোলজাররাও কতক মরেছে, কতকের চোখ কানা হয়েছে।

ক্লারা বললে—তা তোমরা নেটিভদের ভয়েই ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে গেলে নাকি ?

সে-সব পুরোন ইতিহাস। আনকেল হবসন যখন গল্প করতো তখন কথা বলতে বলতে আবেগে তার গলা বুজে আসতো। সে এখন ইতিহাসে পুরোন চ্যাপটার হয়ে গেছে। সে-সব দিন আর নেই।

ভাইপো জুডি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু ইন্ডিয়া ছেড়ে তোমরা চলে

এলে কেন আনকেল ?

কেন যে চলে এলুম তা জিজ্ঞেস করো তোমাদের ইংলন্ডের প্রাইম-মিনিস্টারকে। ইতিহাসের গতি তখন বদলে গিয়েছে। আমরাই নেটিভদের এক-দিন ইংরিজি ভাষা শিখিয়েছি। আমাদের বই বিক্রি হবে বলে আমরা কোটি-কোটি বই ছাপিয়ে ইন্ডিয়াতে পাঠিয়েছি। তাতে কোটি কোটি পাউন্ড লাভও করেছি। কিন্তু সেই সব বই পড়েই নেটিভদের একদিন চোখ খুলে গেল। তারা ভাবতে শিখলে তারাও মানুষ। নেটিভদের মধ্যেও একটা-একটা করে গজিয়ে উঠতে লাগলো ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডী, আর উইলিয়ম দ্য কন্‌কারার।

—উইলিয়ম দি কন্‌কারার ?

জুডি হবসন সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল আনকেলের কথা শুনে। কে সে ? হু ইজ হি ?

আনকেল বলেছিল—সে-ই তো আমাদের আসল শত্রু রে। আমাদের ডেড্‌লিয়েস্ট এনিমি—দ্যাট্‌ সুভাষ বোস। দে কল্‌ হিম নেতাজী। আমরা নেহেরুকে ভয় করিনি, গান্ধীকে ভয় করিনি, কিন্তু সুভাষ বোসকে ভয় করেছি, নেটিভদের মধ্যে সে ছিল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার—

সেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেশেই তাই হনিমুন করতে এসেছে জুডি আর ক্লারা। তাই এখানে যা কিছু চোখে পড়ছে সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। এই-ই হচ্ছে সেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেশ। এই কলকাতা! কিন্তু কই, চেহারা দেখলে মনে হয় না এরাই সেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বংশধর। লোক-গুলোর চোখ বসা, রোগা-রোগা চেহারা, কাটির মতন হাত-পা। এ-রকম মরণ-দশা কেন হলো এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বংশধরদের ? এই হোটেলের ভেতরে বসে বসে তারাই কল্‌গার্ল সঙ্গে করে নিয়ে এসে মদ খাচ্ছে, মাতলামি করছে, আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে ?

—কেন এমন হলো জুডি ?

জুডি বললে—ওই যে তোমায় বললুম, আমরা এখান থেকে চলে গিয়েছি বটে, কিন্তু একটা জিনিস রেখে গিয়েছি—

—কী ? কী সেটা ?

—ওই কামানটা। ওই ওয়ান-আইড ক্যাননটা। একচক্ষু কামানটা আমরা রেখে গিয়েছি গভর্নরস্‌-হাউসে। সামনে রাস্তার দিকে তাগ্‌ করে বসানো আছে। ওটা চাইনিজ কামান। ওর নিচেয় একটা ড্রাগন আছে। ড্রাগনের পিঠের ওপর বসানো আছে কামানটা। একদিন ওই কামান দিয়ে আমরা কত লোককে গুলী করে মেরেছি, এখন নেটিভদের গভর্নমেন্ট হয়েছে, এখন এরাও গুলী করছে—রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বংশধরদের এরাও আমাদের মত গুলী করে মারছে—

—কেন, মারছে কেন ?

—সেইটেই তো ভাগ্যের পরিহাস। আয়রনি অব ফেট।

ওয়েটারটা সিগারেটের টিন কিনে নিয়ে এসে লম্বা একটা সেলাম করলো।—সেলাম সরকার।

জুডি হবসন একটা টাকা বখশিস্ দিতেই লোকটা আরো নিচু হয়ে আরো লম্বা একটা সেলাম করলে। সেলাম সরকার, সেলাম!

বয়টা খুব খুশী হয়েই চলে যাচ্ছিল।

জুডি বললে—এবার একটা মজা দেখাই তোমায় ক্লারা—

বলে ওয়াটারটাকে ডাকলে—বয়, ইধার শুনো—

ওয়েটার আবার ফিরে এসে সেলাম করলে।

জুডি বললে—বয়, পোট্যাটো কত করে কিলো কলকাতায়?

—সরকার, এক টাকা।

—তোমরা পেট ভরে খেতে পাও? আর ইউ হ্যাপি? ডু ইউ গেট্ এনাফ টু ইট?

হঠাৎ এই প্রশ্নে উড়িষ্যা দেশের ইউনিফর্ম পরা ওয়েটার গুণধর যেন খুশীতে বিগলিত হয়ে গেল একেবারে। কাঁদো কাঁদো গলায় ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে ওয়েটারটা নিজের দুঃখ-দুর্দশার সবিস্তার কাহিনী বলে যেতে লাগলো। ক'টা ছেলে-মেয়ে তার, কত টাকা মাইনে পায়, কত টাকা বাড়ি ভাড়া দেয়, সমস্ত··· সমস্ত···

জুডি হবসন থামিয়ে দিলে তাকে। বললে—তোমাদের এই নেটিভ গভর্মেন্ট ভালো, না ইংরেজ সরকার ভালো ছিল?

—হুজুর, ও-জমানাতে আমরা পেট ভরে খেতে পেতাম, আপনারা আবার আসুন হুজুর, আবার ফিরে আসুন। আপনারা এলে আমরা খেয়ে-পরে বাঁচবো—

লোকটাকে যেতে বলে জুডি হবসন একটা টাটকা সিগারেট ধরালো। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলতে লাগলো—দেখলে তো? তুমি তো নিজের কানেই শুনলে সব? দিস ইজ ইন্ডিয়া, দিস ইজ বেঙ্গল। দিস ইজ ক্যালকাটা, এই হলো আসল কলকাতার খবর, এ-খবর এদের এখানকার খবরের কাগজে বেরোয় না, আমাদের এম্পায়ার গেছে বটে, কিন্তু এরা এখনও আমাদের চায়। এই ইন্ডিয়া, আফ্রিকা, বার্মা, সিলোন, পাকিস্তান, সব জায়গার এই একই চিৎকার। দে ওয়ান্ট দ্য ব্রিটিশ টু কাম ব্যাক্—সবাই চায় আমরা আবার ফিরে আসি—

ঌ ঌ ঌ

মনে আছে সেদিন অরবিন্দ অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছিল। হারান নস্কর লেন সন্ধ্যেবেলাই নিরিবিলি হয়ে যায়। ব্লাইন্ড লেনের মধ্যে তো আরো বেশি

নিরিবিলি। বুড়ী-মা অন্ধ-চোখ নিয়ে একলা দরজা আগলে বসে থাকতে পারে না। আফিমের নেশায় সন্ধ্যে থেকেই ঢোলে।

বলে—তুই শুতে যা খোকা, আমি দরজা খুলে দেব—

—তুমি দরজা খুলে দেবে মানে? তুমি কি চোখে দেখতে পাও যে দরজা খুলবে? শেষে যদি পড়ে যাও তো তখন তো সেই আমাকেই দেখতে হবে। আমারই হয়েছে যত ঝামেলা। ওষুধ-ডাক্তার করতে তো সেই আমাকেই ছুটতে হবে। না কি, তোমার আদরের মেয়ে যাবে ডাক্তার ডাকতে?

বুড়ী বলে—তুই যে কী বলিস, সে হলো মেয়েমানুষ, আর তুই বেটাছেলে, তার সঙ্গে তোর তুলনা? সে লেখাপড়া করবে না সংসার করবে?

—তা এত রাত্তির পর্যন্ত তার কীসের লেখাপড়া শুনি? রাত্তিরেও কি তার কলেজ?

—ওমা, রাত্তির বেলা কলেজ হবে কেন? কলেজ থেকে মেয়ে-পড়াতে যায়, তা জানিস না?

—মেয়ে পড়ায়? তোমাকে সুসী তাই বলেছে বুঝি?

—মেয়ে যদি না-পড়ায় তো নিজের খরচ নিজে চালায় কী করে? তুই কি ওর শাড়ি কিনে দিস, না ওর জুতো কিনে দিস?

অরবিন্দ বললে—মেয়ে পড়িয়ে ওই সিল্কের দামী দামী শাড়ি আসে তুমি মনে করো? ওর শাড়ি তুমি দেখেছ? ওর এক-একটা শাড়ির কত দাম তুমি জানো? যদি না জানো তো তোমার বৌমাকে জিজ্ঞেস করো।

—তা নিজের টাকায় ও শাড়ি কিনছে তাতে তোর কী?

—নিজের টাকায় শাড়ি কিনছে বেশ করছে, কিন্তু সংসারে কিছু দিলে তো আমার সাশ্রয় হয়। আমি কোত্থেকে কেমন করে সংসার চালাচ্ছি তা তো আর তুমি টের পাচ্ছো না, তাই বলছো। তোমার বৌমাকে ডাক্তার মাংস খাওয়াতে বলছে, আমি মাংস খাওয়াতে পারছি? এই যে তোমার চোখ খারাপ হয়েছে, একটা চশমা করে দিতে পারছি? এই যে রান্না করতে করতে আর বাসন মাজতে মাজতে তোমার বৌমার শরীর কালি হয়ে যাচ্ছে, তা একটা রান্নার লোক রাখতে পারছি? আর, তা ছাড়া তোমাকে এত বলেই বা কী লাভ। তুমি তো আর তোমার মেয়ের কোনও দোষ দেখতে পাবে না। মেয়ে বলতে তুমি অজ্ঞান। এইটে জেনে রেখো মা, ওই মেয়েই তোমার স্বগ্যে বাতি দেবে, হ্যাঁ! তখন বুঝবে ঠ্যালা—

মা কথাগুলো শুনতে লাগলো। কিছু উত্তর দিলে না। বললে—আমারই কপাল বাবা, আমার যদি চোখ থাকতো তো কাউকেই খাটতে হতো না সংসারের জন্যে, আমি নিজেই রান্না করতুম, আমি নিজেই বাসন মাজতুম। আমার যে গতর গেছে, গতর আর চোখ গিয়েই যে আমি মরেছি—

হঠাৎ মনে হলো বাইরে হারান নস্কর লেনের ব্লাইন্ড-গলিতে কার পায়ের আওয়াজ হলো।

অরবিন্দ বললে—ওই আসছেন রাজরানী—

মা বললেন—তুই অমন করে বলিসনে খোকা, দু'দিন বাদে বিয়ে হয়ে যাবে, পরের ঘরে চলে যাবে, যে-ক'টা দিন কপালে আরাম আছে করে নিক, তারপর পরের বাড়ির বউ হলে কষ্ট তো আছেই—

কটা-কট্-কট্-কট্-কট্—

খুব জোরে জোরে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

—দেখছ মা, এত রাত করে বাড়ি আসছে তার ওপর আবার কড়া নাড়বার তাড়া দেখ, যেন আমার দশটা চাকর আছে রাজরানীকে দরজা খুলে দেবার জন্যে—

দরজার দিকে যেতে যেতে অরবিন্দ আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলে না। চিৎকার করে বললে—দাঁড়া রে বাবা দাঁড়া, তোর দরজা খুলে দেবার জন্যে দশটা বাঁদী নেই বাড়িতে। হ্যাঁ—এই এতক্ষণে মেয়ের কলেজ বন্ধ হলো, খুব লেখা-পড়া হয়েছে, লেখাপড়া আমরা করিনি বলে যেন ইস্কুল-কলেজের খবর রাখি না—দাঁড়া—

কিন্তু দরজা খুলতেই অরবিন্দ আকাশ থেকে পড়লো। সামনেই মোটা একটা রেগুলেশন লাঠি নিয়ে একটা পুলিশ কনস্টেবল্ দাঁড়িয়ে আছে—

অরবিন্দ পুলিশ দেখেই এক-পা পেছু হঠে এসেছে! পুলিশের সঙ্গে অরবিন্দর জীবনে কখনও মুলাকাত হয়নি আগে। পুলিশ রাস্তায় থাকে, তারা রাস্তার বাহার। কিন্তু বাড়ির মধ্যে এসেছে কেন? আমি তো মদ চোলাই করি না, আমি তো ব্ল্যাক-মার্কেট করি না, সোনার ইঁট কিনেও লুকিয়ে রাখি না! আমাকে ধরতে এসেছ কেন?

অন্ধকার ঝাপসা গলির পটভূমিকায় পুলিশটার মূর্তিটা যেন বড় ভয়ংকর ঠেকলো অরবিন্দর কাছে।

পেছন থেকে অন্ধবুড়ী তখন চেঁচিয়ে বলছে—হ্যাঁলা সুসী, এত রাত্তির করিস কেন বাছা, আর এট্টু বেলাবেলি ফিরতে পারিস নে—

পুলিশটা বললে—ম্যয় থানাসে আয়া, বড়বাবু আপ্‌কো বোলায়া—চলিয়ে—

অরবিন্দর গলাটা তখন ভয়ে বুঁজে এসেছে। বললে—আমাকে? আমি কী করিচি?

—কেয়া মালুম! লেকন্ আব্‌ভি চলিয়ে—

অরবিন্দ সেইখানে দাঁড়িয়েই থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

এর সুরু সেই ১৯৪৩ সাল থেকেই। ১৯৪৩ সালেই সুরু হয়েছিল কলকাতায় আসা। তখন শিরীষবাবুরা ছিল মিলিটারি কন্‌ট্র্যাকটার। মানুষের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে সাউথ-ইস্ট-এশিয়া কম্যান্ডের সোলজারদের জন্যে তা জমিয়ে রাখা হয়েছিল সরকারি গুদামে। তখন থেকেই দু'মুঠো ভাতের জন্যে লোক আসতে সুরু হয়েছিল এই কলকাতায়। সে সব দৃশ্য অরবিন্দরা দ্যাখেনি। দেখেছিল অরবিন্দর বুড়ী মা। দেখেছিল ওই বুধবারির মা, আর দেখেছিল ওই স্ট্র্যান্ড হোটেলের বয়-বাবুর্চি-খানসামারা। তারপর আঠারো-উনিশ বছর কেটে গেছে। এই এত বছরের মধ্যেও কলকাতায় চলা থামেনি। কোথায় মুর্শিদাবাদ, কোথায় জলপাইগুড়ি, কোথায় হুগলি, চুঁচুড়া, বর্ধমান থেকে হেঁটে হেঁটে মানুষের মিছিল এসেছে কলকাতা লক্ষ্য করে।

সবাই চিৎকার করে গলা ফাটিয়েছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

সে-চিৎকারে দিল্লীর কর্তাদের টনক নড়েনি। ইন্দ্রপ্রস্থের প্রেসিডেন্টের এয়ার-কনডিশনড্ ঘরে সে-শব্দ বার বার শুধু মাথা কুটে ব্যর্থ প্রচেষ্টায় প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে। ইন্দ্রপ্রস্থের ফাইনান্স মিনিস্টারের পোর্টফোলিওতে তারা একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি।

কিন্তু আমেরিকার 'হোয়াইট-হাউসে' বসে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের টনক নড়লো প্রথম। এত বড় একটা আন্ডার-ডেভেলপ্‌ড্ কান্ট্রি হয়ে ইন্ডিয়া কমিউনিস্ট ব্লকে চলে যাবে এতে ক্ষতি তো ইন্ডিয়ার নয়—ক্ষতি হবে আমেরিকার। ব্রিটিশ গভর্মেন্ট ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে এসেছে। আর শুধু ইন্ডিয়া নয়—আফ্রিকা, মালয়, বার্মা, সিলোন সব ফাঁকা। জায়গা ফাঁকা রাখলে কেউ-না-কেউ গিয়ে ওদের ছোঁ মারবে। ওদের বাজার কেড়ে নেবে। সুতরাং একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

সুতরাং কন্‌ফিডেনশিয়াল ডেসপ্যাচ্ পাঠানো হলো সব এমব্যাসিতে। হাল-চাল জানাও। ওখানকার সাধারণ মানুষের মতিগতির খবর পাঠাও। তারা কী চায়, তারা কী ভাবে, তারা কী আলোচনা করে তার খবরদারি করো। জরুরী ব্যাপার। ইন্দ্রপ্রস্থের কর্তাদের হালচাল সম্বন্ধে স্পাইং করো।

ফিরতি ডেসপ্যাচে খবর গেল।

খবর সবই ভাল ইওর এক্সেলেন্সি। কোনও কিছু ভয় করবার নেই। এভরি-থিং ইজ অলরাইট ইন্ দি স্টেট অব ডেনমার্ক এ্যান্ড্ গড্ ইজ্ ইন্ হেভেন্। মাটির পৃথিবীতে সবই কুশল আর মাথার ওপর ভগবান। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা-ধিরাজ নিশ্চিন্ত। ভেরি হ্যাপি সবাই। সবাই পিস চাইছে। বড় বড় ড্যাম বানাচ্ছে, আর হেভি-ইনডাসট্রি তৈরি করছে। তারা ভাবছে একদিন হেভি-

ইনডাসট্রি দিয়েই তারা রেলওয়ে ইলেকট্রিফাই করবে, ঘরে ঘরে বিজলীবাতি পেঁাছিয়ে দেবে হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার দিয়ে। বান্দুং কনফারেন্সের পঞ্চশীল নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। আর ভয় নেই ওদের। সব ঠিক হো যায়েগা। বড় বড় চাকরি পাচ্ছে মিনিস্টারদের রিলেটিভরা। তাদের ছেলেরা ফরেন-এক্সচেঞ্জ খরচ করছে দু'হাতে। তারা ইংলন্ড যাচ্ছে, আমেরিকা যাচ্ছে, ডিনার খাচ্ছে, পার্টি দিচ্ছে। আগে যারা খদ্দর পরতো এখন তারা পুরোদমে টেরিলিন টেরিকটের সুট-টাই সার্ট ধরেছে। কিন্তু···

—কিন্তু কী?

—কিন্তু স্যার, বড় মুশকিল হয়েছে ক্যালকাটা নিয়ে।

—ক্যালকাটা? সে কী? ক্যালকাটাই তো হলো ইন্ডিয়ার ব্রেন। ইন্ডিয়ার ব্রেন-সেন্টার। সেই মাথাতেই মুশকিল বাধলো?

এখান থেকে আবার লম্বা চওড়া ডেসপ্যাচ গেল। ইয়েস স্যার। ক্যালকাটা—ব্রিটিশ এম্পায়ারের সেই সেকেন্ড সিটিতে এখন ঘুণ ধরেছে। এখানকার মানুষ এই স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়েছে একদিন, টেররিস্ট-পার্টিতে ঢুকে লাটসাহেবদের গুলী করেছে। এখানকার মানুষই একদিন ব্রিটিশ ইম্পিরিয়্যাল সার্ভিসকে ভয়ে থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এই ক্যালকাটাতেই এখন সবচেয়ে বেশি ফ্রাসট্রেশান। এ-শহরে জল নেই, হাওয়া নেই, জমি নেই। ছেলেদের খেলবার একটা পার্ক পর্যন্ত নেই। এখানে ধোঁয়ার জন্যে মানুষের টিবি রোগ হচ্ছে। এ-শহরের ফুটপাথ এখন মানব-শাবকের আঁতুড়-ঘর। এখানকার মেয়েরা এখন কলেজে যাবার নাম করে 'কল্‌গার্লে'র ব্যবসা সুরু করেছে। এখানে যারা বাড়িতে-বাড়িতে ভ্যাকসিনেশন দিয়ে বেড়ায় তারা এখন আড়কাটি হচ্ছে! তারা মেয়েমানুষ যোগাড় করে দেবার ব্যবসা সুরু করেছে। এখানকার গৃহস্থরা এক ঠিকানায় শোয়, আর এক ঠিকানায় রান্না করতে যায়। নিজের স্ত্রীকে ভাড়া খাটিয়ে এরা সংসার চালাবার প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় বিভ্রান্ত। এখানে যারা বাড়ির বুড়ী বিধবা মা তাদের একটা চশমা কেনবার পয়সা জোটে না, কিন্তু সেই বাড়ির মেয়ের পায়ে তিরিশ টাকা জোড়া দামের চটি থাকে। এরা কী করবে তা বুঝতে না পেরে অন্য কোনও উপায় না পেয়ে প্রোসেশান করে, মিছিল করে, ময়দানের দিকে দল বেঁধে যায়, আর যখন ময়দানের মীটিং ভেঙে যায় তখন বেঙ্গলের গভর্নরের বাড়ির সামনে রাস্তায় বসে পড়ে চিৎকার করে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

বলে—মজুতদারের শাস্তি চাই।
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
আরো বলে—মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও
নইলে গদী ছেড়ে দাও—

রিপোর্ট পড়ে 'হোয়াইট-হাউসে' মীটিং বসলো। বড় কনফিডেনশিয়াল মীটিং। এই-ই সুযোগ। সারা সাউথ-ইস্ট-এশিয়ায় এখন ভ্যাকুম রয়েছে। একেবারে ফাঁকা এরিয়া। এ সুযোগ আমরা ছাড়বো না। তিনদিন ধরে মীটিং চললো। অনেক ডেসপ্যাচ এল গেল। পরামর্শ যখন শেষ হলো তখন এক নতুন ফাইল খোলা হলো ওয়াশিংটনের হোয়াইট-হাউসে। নতুন ফাইল, নতুন দাওয়াই। এ দাওয়াই-এর নাম আগে কেউ শোনেনি! একেবারে নতুন নাম।

ঠিক হলো ক্যালকাটাতে আমরা মিল্ক-পাউডার পাঠাবো, গম পাঠাবো, চাল পাঠাবো, ওষুধ পাঠাবো, টোব্যাকো পাঠাবো। ক্যালকাটার মানুষের যা-যা নিত্য আবশ্যক সব পাঠাবো। বই পাঠাবো। এক্সপার্ট পাঠাবো। তার জন্যে কোনও দাম দিতে হবে না ইন্ডিয়াকে। তার বদলে যে-দাম ন্যায্য পাওনা হয়, সেইসব টাকা খরচ করতে হবে ক্যালকাটার মানুষের সুখ সুবিধের জন্যে। তারা যেন খাবার জল পায়, নিশ্বাস নেবার জন্যে তারা যেন ফ্রেশ এআর পায়, ভদ্রভাবে মাথা গোঁজবার জন্যে তারা যেন আশ্রয় পায়। ব্যস, তাহলেই আর তারা কম্যুনিস্ট হতে চাইবে না। সবাই গুণগান করবে আমেরিকার। বলবে—জয়, জয়, জর্জ ওয়াশিংটনের জয়, জয় আব্রাহাম লিংকনের জয়, জয় জেনারেল আইসেনহাওয়ারের জয়! বলবে—জয় ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার জয়!

সেই দাওয়াই-এর নামই হলো—পাবলিক ল'জ ফোর-এইট্টি। এক কথায় পি এল ৪৮০।

এ হলো ১০ই জুলাই ১৯৫৪ সালের কাহিনী।

—তারপর?

এখান থেকে লোক চলে গেছে আমেরিকায়। আমেরিকা থেকে লোক এখানে চলে এসেছে। কলকাতাকে বাঁচাতেই হবে। এখানকার মানুষের খাবার জন্যে জল দিতে হবে, বাঁচবার জন্যে হাওয়া দিতে হবে। নইলে কলকাতার ফুটপাথের আঁতুড়ঘরে নতুন জাতক শিশু-ইন্ডিয়ার অপঘাত-মৃত্যু হবে।

আর এক-একদিকে এখান থেকে লোক চলে গেছে চেংগাইল, বাউড়িয়া, উলুবেড়িয়া। হুগলী, বর্ধমান, চুঁচুড়ায়। শিবপুর, বজবজ, হাওড়ায়। আজ জুটমিলের কাজ ছেড়ে চলো ভাই কলকাতায় যাই। কলকাতার ময়দানে মীটিং আছে আমাদের। আমরা আমাদের দাবী জানাবো গভর্মেন্টের কাছে। আমরা সরকারকে বলবো যে-মাইনে আমরা পাচ্ছি, সে মাইনে আমাদের বাড়াতে হবে। ডিআরনেস্ এ্যালাউনস্ ইন্‌ক্রিজ্ করতে হবে। আমাদের সস্তা দরে চাল দিতে হবে, গম দিতে হবে। বাঁচার মত বাঁচতে দিতে হবে। চলো ভাই, কলকাতা চলো ·

পিল-পিল করে লোক আসতে সুরু করলো কলকাতায়। ওদিকে শেয়ালদা, বসিরহাট, বারাসত, নারকেলডাঙ্গা, এদিকে হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, হাওড়া,

আর দক্ষিণে যাদবপুর, ক্যানিং, সুন্দরবন। চারদিক থেকে মানুষের মিছিল সার বেঁধে ঢুকে পড়লো শহরে।

আর সেই সমস্ত মিছিলের ভগ্নাংশ হয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে চলতে লাগলো আমাদের অরবিন্দ। পাশেই ছিল কেলো-ফটিক। চেঁচাতে চেঁচাতে তার গলা ভেঙে এসেছে। তবু তার চেঁচানোর কামাই নেই।

অরবিন্দর দিকে নজর পড়তেই বললে—কী অরবিন্দবাবু, কী ভাবছেন, চেঁচান—

কিন্তু কীসের জন্যে চেঁচাবে, কার জন্যে চেঁচাবে, কার কানে গিয়ে সে-চিৎকার পেঁছাবে? কে সে? কোথায় তার বাড়ি? কে তার কাছে পেঁছোতে পারবে?

দিলীপদা বললে—তারপর?

অরবিন্দর চোখের সামনে থেকে আর সবকিছু মুছে এল। শুধু সামনে ভেসে উঠলো দিলীপদার মুখখানা। দিলীপ বেরা। যাদবপুরের 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র মালিক।

অথচ দিলীপদা না থাকলে সেদিন কে তাকে বাঁচাতো! ভেতরে যে এত কাণ্ড চলেছে তা কে জানতো!

আসলে সমস্ত কিছুর মূলে হচ্ছে ভূধরবাবু। ভূধরবাবু নাকি বড় করিত-কর্মা লোক। বাইরে বড় পরোপকারী, বড় অমায়িক। ভূধরবাবুর বাড়িতে যদি কেউ যায় তো তিনি বড় আপ্যায়িত হন।

বলেন—আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি, বলুন?

কলকাতার মানুষের সমস্যার তো শেষ নেই। তাদের সে সমস্যা-সম্ভার যদি কেউ দূর করতে পারে তো তিনি ভূধরবাবু। দ্বাপরের পতিতপাবন শ্রীমধুসূদনই বোধহয় এ-জন্মে ভূধর বিশ্বাস হয়ে কলিতে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন!

তিনি কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। বলেন—ঠিক আছে, আমি সব ঠিক করে দেব—

কারোর সিমেন্টের অভাবে বাড়ি তৈরি হচ্ছে না, কারো করপোরেশনের কাউন্সিলারকে ধরে ট্যাক্স কমাতে হবে, কাউকে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে ফ্রি বেড পাইয়ে দিতে হবে, কারো আড়াই কাঠা জমি দরকার নিউ আলিপুরে, কারো থার্ড ডিভিসনে পাস-করা ছেলেকে মেডিকেল-কলেজে ভর্তি করিয়ে দিতে হবে, কাউকে আমেরিকা যাবার ভিসা যোগাড় করে দিতে হবে—এই সব হাজারো সমস্যা কলকাতার মানুষের। এ-সব কাজ সাধারণ মানুষকে দিয়ে হবার উপায় নেই। এর প্রত্যেকটা কাজই দুরূহ। এর থেকে মাউন্ট এভারেস্টের চূড়োয় ওঠাও বোধহয় সোজা কাজ।

এমনি অগতির গতির কাছেই একদিন শিরীষবাবুকে টেলিফোন করতে হলো।

ভূধরবাবু বললেন—সে কী, আপনি কেন আসবেন, আমিই তো আপনার কাছে যেতে পারি—কী কাজ বলুন না—

—সাক্ষাতেই সব বলবো। কবে আসছেন ?

—কবে আপনার সময় হবে বলুন ?

—আপনার সময় হলেই আমার সময় হবে !

শেষ পর্যন্ত একটা দিন স্থির হলো ! সেই নির্দিষ্ট দিনে দেখা হলো ভূধরবাবুর সঙ্গে শিরীষবাবুর। এই মিলনটা বড় শুভ মিলন। বাংলার গ্লাস্-ইনডাসট্রির পক্ষে বড় শুভদায়ক। কাচ তো অনেক রকমই আছে। তাতে কোনও লাভ নেই কারো। বাজার ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। বাংলার তৈরি গ্লাস এককালে বোম্বাইতে বিক্রি হতো, ম্যাড্রাসে বিক্রি হতো, দিল্লিতেও বিক্রি হতো। বাংলার মিলের কাপড়ও তাই। তারপর সেখানেও গ্লাস-ফ্যাক্টরি হলো, সেখানেও কটন-মিল হলো। মার্কেট ছোট হয়ে এল। আস্তে আস্তে ক্রমেই আরো ছোট হয়ে এল বাজার। তখন এইটুকু বাজারের মধ্যে গুঁতোগুঁতি চলতে লাগলো সকলের। কে কার মাল কাটাতে পারে ! তারপর এখন এমন অবস্থা যে বাংলাদেশের বাইরে আর আমাদের মার্কেটই নেই।

ভূধরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে ?

শিরীষবাবু বললেন—তাহলে অন্য রাস্তার কথা ভাবতে হবে।

—সেই অন্য রাস্তার কথা কিছু ভেবেছেন ?

—ভেবেছি বৈকি। দিনরাত আমরা ওই কথাই তো ভাবি। ভেবে ভেবে একটা রাস্তা বের করেছি। চীফ মিনিস্টারকে দিয়ে আপনি তো লেক-টাউনে জমি যোগাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু আর একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে—

—বলুন, কী কাজ ?

শিরীষবাবু তাঁর সব প্ল্যানটা খুলে বললেন। 'কিপলেক্স' গ্লাসের নাম শুনেছেন ? যাকে বলে আন-ব্রেকেবল গ্লাস। যে-কাচ ভাঙে না আর কী ! সেই কাচ ম্যানুফ্যাকচার করতে গেলে একটা সলিউশন লাগে। সে এক রকমের আঠা। সেটা ইন্ডিয়াতে তৈরি হয় না। ফরেন-মাল। সেটা বিদেশ থেকে আমদানি করতে গেলে ইমপোর্ট-লাইসেন্স লাগে।

—আপনার ইমপোর্ট-লাইসেন্স দরকার, সেই কথাটাই সোজা করে বলুন না !

শিরীষবাবু বললেন—না, তার মধ্যে একটা কথা আছে—

—কী ?

—সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকেছি ভূধরবাবু। নইলে তো আমি নিজেই সব কাজ হাসিল করতে পারতুম। আসলে হয়েছে কি, এক গুজরাটি ফার্ম মানুভাই দয়াভাই, তারা একচেটিয়া লাইসেন্স পেয়ে বসে আছে। তারা একলা মনোপলি কারবার চালিয়ে সমস্ত ইন্ডিয়ার মার্কেটটা একেবারে ক্যাপচার করে বসে

আছে, আর কাউকে সেখানে নাক গলাতে দিচ্ছে না !

—আপনি কি ইমপোর্ট-লাইসেন্সের দরখাস্ত করেছেন ?

শিরীষবাবু বললেন—আরে, দরখাস্ত করলে কি আর লাইসেন্স পাওয়া যায় ? ইন্ডিয়া গভর্মেন্টের অফিসাররা কি অত সোজা চিজ ? কিছু কাঠ-খড় না পোড়ালে সোজা পথে কিছু করবার জো আছে এখানে ? নেহাত আপনার মত দু'একজন লোক আছেন তাই তবু দু'মুঠো খেতে পাচ্ছি, দশজনকে খাওয়াতেও পারছি—

তারপর একটু থেমে বললেন—হ্যাঁ একটা কথা, টাকা যদি কিছু লাগে আপনি মুখ ফুটে বলতে যেন লজ্জা করবেন না ভূধরবাবু, এটা এখন থেকে বলে রাখছি—

ভূধরবাবু ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন—আপনি গোড়াতেই টাকার কথা তুলছেন। এ-সব কাজ কি শুধু টাকাতে হয় ? কলকাতায় তো হাজার হাজার লাখপতি কোটিপতি আছে, দেখি ক'জন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটা রেশনের দোকানের লাইসেন্স বার করতে পারে ? ক'জন কাল সন্ধ্যেবেলার মধ্যে একটা নতুন ট্যাক্সির পারমিট বার করে আনতে পারে ? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি কোনও ব্যাটার সে মুরোদ নেই—

শিরীষবাবু একটু যেন আশা পেলেন। বললেন—তাহলে আপনি ভরসা দিচ্ছেন, পারবেন ?

ভূধরবাবু বললেন—পারবো তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ক'দিনের মধ্যে চাই আপনার, তাই বলুন ?

শিরীষবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আপনি সত্যিই বলছেন পারবেন ?

—অত কথার দরকার কী ? আপনার ইমপোর্ট-লাইসেন্সটা পেলেই তো হলো মশাই—

—কিন্তু এ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্মেন্টের ব্যাপার নয়, একেবারে সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের ব্যাপার। ফাইন্যান্স মিনিস্টারের নিজের পোর্টফোলিও। ফরেন-এক্সচেঞ্জ এখন কাউকে দিচ্ছে না। ভয়ানক কড়াকড়ি করেছে।

—ওই তো বললুম, আপনার যেমন করে হোক পেলেই তো হলো। ভূধর বিশ্বাস সামান্য লোক বটে, কিন্তু তার খেলটা তো আর দ্যাখেননি। এবার দেখে নিন !

—তাহলে বলছেন হবে ?

ভূধরবাবু বললেন—জমির ব্যাপারেও আপনি বলেছিলেন হবে না। শেষে তো হলো ? ষাট হাজার টাকার মধ্যেই তো সব করে দিলুম।

—সে অবিশ্যি আপনার জন্যেই হয়েছে, তা আমি হাজার বার স্বীকার

করবো।

ভূধরবাবু বললেন—আর এ ব্যাপারে খুব বেশি লাগে তো লাখ পাঁচেক খরচা হবে সব জড়িয়ে।

শিরীষবাবু আশান্বিত হলেন। বললেন—লাখ পাঁচেক কেন, যদি ইমপোর্ট-লাইসেন্সটা পাই তো আমি লাখ আষ্টেক পর্যন্ত খরচা করতে রেডি—

ভূধরবাবু বললেন—তা তো বটেই, আমাদের নতুন ফাইন্যান্স মিনিস্টার মশাই এসে তো আরো সুবিধে করে দিয়েছেন আপনাদের, এক্সপেনডিচার-ট্যাক্সই তুলে দিয়েছেন। সব টাকাটা আপনি ক্যাপিটালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন, কোনও ঝঞ্ঝাট নেই—

শিরীষবাবু বললেন—তাহলে কবে আপনি আমাকে খবর দেবেন?

ভূধরবাবু বললেন—আমাকে দু'উইক টাইম দিন। আমি একবার দিল্লি ঘুরে আসি। তারপর আপনাকে সঠিক খবর দেব—

এ-সব গোড়ার দিকের কথা। শিরীষবাবুর জুয়েলারি আর ঘড়ির কারবার তখন আছে বটে, কিন্তু তার বাজার তখন ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। ক্রমে ক্রমে দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজে তখন আরো কয়েকটা কোম্পানী গড়ে উঠছে। তারাই শিরীষবাবুর বাজার ছোট করে দিচ্ছিল। শিরীষবাবু তখন ভেবে ভেবে এই মতলবটাই বার করলেন।

ভাবলেন—এবার বোম্বাই-এর মনোপলি ব্যবসা করা আমি দেখে নেব।

ভূধরবাবু তাঁর কথা রাখলেন। শিরীষবাবু টাকা দিলেন ভূধরবাবুর দিল্লি যাবার। সেখানকার খাওয়া-থাকা আর তদবির করবার বাবদ মোটা খরচাও তাঁর পকেটে পুরে দিলেন।

দমদম থেকে একদিন ভূধরবাবু ক্যারাভ্যাল-প্লেনে চড়ে বসলেন।

কলকাতায় যাদের গাড়ি আছে তারা খবর রাখে না তাদের গাড়ির কাচ কোথায় তৈরি হয়। বোম্বাইতে না দিল্লিতে না কলকাতায়। তাদের গাড়ি হলেই হলো। গাড়ির কাচ ভেঙে গেলে তারা কারখানায় গাড়ি ফেলে দিয়েই খালাস। বিল করলেই চেক পাঠিয়ে দেয়!

কিন্তু শিরীষবাবুর বহুদিন আগেই মাথায় এসেছে আইডিয়াটা। টাকা উপায় করার নানান রকম আইডিয়া শিরীষবাবুর মাথায় দিনরাত আসে। দেশের আর্থিক অবস্থা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে পয়সা উপায় করবার আইডিয়াও বদলাতে হয়। তার নামই হলো বিজনেস।

ভূধরবাবু সাতদিন পরেই চলে এলেন। ভারি খুশী-খুশী ভাবটা।

বললেন—সব ব্যবস্থা করে এসেছি—

—লাইসেন্স পেয়ে গেছেন?

—দিল্লি থেকে লাইসেন্স দেবে কি মশাই? এনকোয়ারি হবে ক্যালকাটা

থেকে, তবে তো! আপনার ফ্যাক্টরি দেখতে আসবে এখানকার অফিসের একজন ইনসপেক্টর, সে রিপোর্ট দিলে তবে লাইসেন্স আসবে দিল্লি থেকে।

—সে যদি খারাপ রিপোর্ট দেয়?

—তা যাতে না দেয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিরীষবাবু বললেন—সে ব্যবস্থা কে করবে? আমার ফ্যাক্টরি দেখলে তো রিপোর্ট খারাপই দেবে। আমার তো তেমন আপ্-টু-ডেট্ ফ্যাক্টরিই নেই—

ভূধরবাবু বললেন—খারাপ রিপোর্ট দেবে কেন? আপনি তো বলেছেন আপনি টাকা খরচ করতে রাজী।

—তা তো রাজী। কিন্তু দেব কী করে?

ভূধরবাবু বললেন—সে-সব ব্যবস্থাও আমি করে এসেছি, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমাকে এখন লাখখানেক টাকা দিয়ে দিন, যাকে যা দেবার আমি দিয়ে দেব। আপনি এখন শুধু একজন মোসাহেব গোছের লোকের ব্যবস্থা করুন, যে কেবল ইনসপেক্টরের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তার তোয়াজ করবে, তার তদবির করবে—

—সে আমার লোক আছে। তার জন্যে ভাবতে হবে না।

তা অদ্ভুত করিতকর্মা লোক বটে ভূধর বিশ্বাস। পৃথিবীর লোক জানতে পারলো না অন্ধকারের কোন্ সুড়ঙ্গ-পথে কার সঙ্গে কী ব্যবস্থা করে কী বন্দোবস্ত সমাধা হয়ে গেল। দিল্লির ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্ট্রির ফাইলে কোন্ কারসাজিতে কোন্ কারচুপির জাল বিছোন হলো তাও কেউ জানতে পারলো না।

শুধু কলকাতার অফিসে সিল-করা চিঠি এল বড়সাহেবের নামে। লিখেছে দিল্লি অফিসের সেক্রেটারি। জরুরী চিঠি। মেসার্স সো-অ্যান্ড-সো'র ফ্যাক্টরিতে গিয়ে যেন ইনসপেকশান করা হয়। করে রিপোর্ট দেওয়া হয় অবিলম্বে।

ভূধরবাবু হঠাৎ টেলিফোন করলেন শিরীষবাবুকে।

—হ্যাঁ আমি, চিঠি এসে গেছে। আপনার লোক রেডি?

শিরীষবাবু এদিক থেকে বললেন—হ্যাঁ, রেডি।

—তাহলে বুধবার সকালবেলা ইনসপেক্টর আপনার ওখানে যাচ্ছে। আপনি গাড়ি আর লোক রেডি রাখবেন। তারপর যা করবার আমি করবো।

ফোন রেখে দিয়ে শিরীষবাবু ডাকলেন—গোস্বামী—

শিরীষবাবুর অফিসের বড় কনিষ্ঠ স্টাফ গোস্বামী। কনিষ্ঠ হলেও গোস্বামী শিরীষবাবুর বিশ্বস্ত কর্মচারী। গোস্বামীর তিন-পুরুষে কেউ কখনও স্কুল-কলেজে যায়নি। স্কুল-কলেজে যাবার তাদের দরকারও হয়নি। স্কুল-কলেজে না গিয়ে যদি চলে তো সেখানে গিয়ে পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখে লাভটা কী? গোস্বামী বংশ কলকাতা শহরে বেঁচে-বর্তে আছে, খেতে-

পয়তে পাচ্ছে, এইটেই তো চরম প্রমাণ যে, লেখাপড়ার কোনও দরকার নেই এ-যুগে। যদি বলো বড়লোক কেন হলুম না? যদি বলো কেন তাহলে পরের দাসত্ব করছি? তাহলে চেয়ে দ্যাখ শিরীষবাবুর দিকে। শিরীষবাবুই বা কী এমন লেখা-পড়াটা শিখেছেন! আসলে ভাগ্য হে, ভাগ্য! কপাল যদি তোমার ফাটা হয় তো হাজার লেখাপড়া শিখেও আমার মত মোসাহেবী করতে হবে!

ডাক পেয়েই গোস্বামী কর্তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। একটা নমস্কার করে দাঁড়ালো।

শিরীষবাবু বললেন—গোস্বামী, তোর মনে আছে তো যা-যা বলেছি?

—আজ্ঞে, মনে আছে!

—বুধবার, মানে আসছে পনেরো তারিখে কিন্তু ইনসপেক্টর আসছে। সেদিন একটু ফরসা জামা-কাপড় পরে আসবি। বুঝলি, না, বুঝলি না? বুধবার, মনে থাকবে তো?

কী কী করতে হবে ইনসপেক্টর এলে সব বুঝে নিয়ে গোস্বামী আবার নিজের সেকশানে গিয়ে বসলো। এ-রকম আগেও অনেকবার অনেক অদ্ভুত কাজের ভার পড়েছে গোস্বামীর ওপর। আগেও অনেকবার ইনসপেক্টর এসেছে। আগেও কর্তা ঠেকিয়ে দিয়েছেন এই গোস্বামীকেই। শিরীষবাবুর ফ্যাক্টরিতে এই গোস্বামীরা ছোট-খাটো এক-একটা নাট-বলটু ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এদের কৃপাতেই ফ্যাক্টরিগুলো নির্বিঘ্নে চলছে। এদের কৃপাতেই কলকাতার রাস্তার আলো, কলের জল, ইলেকট্রিক আলো চালু রয়েছে। এদের দাক্ষিণ্যেই ভদ্রলোকরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবার নিয়ে কলকাতা শহরে নিরাপদে বাস করছে। এরাই অন্ধকার, এরাই আবার আলো। এদের চাকরি না দিলে শিরীষবাবুর গাড়ির চাকা অচল হয়ে যায়। আসলে এরা নিজেরা হলো এই শহরের ডাস্টবিন।

ডাস্টবিন নিজের সেকশানে এসে জুত করে বসে একটা বিড়ি ধরালো। তারপর বুধবারের কথাটা কল্পনা করে একবার ধোঁয়া ছাড়লো। তারপর 'ধেঁৎ' বলে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চাপরাশিটাকে ডাকলে।

চাপরাশিটা আসতেই বললে—এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয় তো শক্তি, শালা বিড়ি খেতে আর ভাল্লাগে না—

শক্তিপদ জিজ্ঞেস করলে—কী সিগারেট—

—খুব ভালো সিগারেট, মানে খুব দামী! যা—

ঌ ঌ ঌ

বুধবারিরা চলেছে চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে। ডান দিকে মাঠ, আর বাঁ দিকে রাস্তা। চওড়া পিচ-ঢালা রাস্তা।

—উ ক্যা মোকান্ রে বুধবারি ?

বুধবারি মোকানটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিলে।

—দফতর, সাহাব লোগকা দফতর।

মুখ ঘোরাতেই দেখলে এক জোড়া সাহেব-মেম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে দেখছে। হাতে আবার একটা কী রয়েছে। তাদের দিকেই তাগ করছে সাহেবটা।

—ও কেয়া কর্ রহা হ্যায় বুধবারি।

—ফটো খিঁচ রহা হ্যায় !

বুধবারি জয়চন্ডীপুরে ফোটো-তোলা দেখেছে ! কোলিয়ারির সাহেবরা গাড়িতে করে জয়চণ্ডীপুরে যেতে যেতে যা দেখতে পায় তার ফোটো তুলে নেয়। কতবার বুধবারিকে আধ-ন্যাংটো হয়ে চুপ করে দাঁড়াতে বলেছে সাহেবরা। বুধবারি কোমরের কাপড়টা একেবারে জঙ্ঘা পর্যন্ত তুলে কাঁধে কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়েছে, আর লালমুখ সাহেবরা তার ছবি তুলে নিয়েছে।

—পয়সা ?

বুধবারি জানতো তার ছবি তুললে সে পয়সা পাবে। বলতো—হুজুর, —পয়সা ?

ঝনাৎ করে একটা আধুলি কি সিকি ফেলে দিয়ে সাহেবরা হুল্লোড় করতে করতে চলে যেত !

পাঁঠাটা কাঁধে নিয়ে বুধবারি হাসি-হাসি মুখ করে ক্যামেরার দিকে চেয়ে রইল। ফোটো তোলার ব্যাপার এক মিনিটের ব্যাপার। সেটা জানতো বুধবারি। ফোটো তোলা হয়ে গেলে বুধবারি হাতটা সামনের দিকে পেতে বাড়িয়ে দিলে—পয়সা ?

সাহেব আর মেমসাহেব হাসতে লাগলো। জুডি হবসন জানে এরা ভিখিরির জাত। এ রেস অব বেগারস্। আমেরিকার কাছে, ব্রিটেনের কাছে, রাশিয়ার কাছে ভিক্ষে করে এদের পেট চলছে। দিস ইজ ইন্ডিয়া, দিস ইজ বেঙ্গল, দিস ইজ ক্যালকাটা।

হঠাৎ ওদিক থেকে একটা চিৎকার কানে আসতেই জুডি চেয়ে দেখলে।

—লুক, লুক ক্লারা—ওই একটা প্রোসেশান আসছে—

মিছিলের সামনে লাল ফেস্টুন। ফেস্টুনের ওপরে ভার্নাকুলারে বড় বড় অক্ষরে কী সব লেখা রয়েছে। হৈ হৈ করে চিৎকার করছে। শ্লোগান দিচ্ছে—

—বয়, ওরা কী বলছে ? হোয়াট ডু দে সে ?

পেছনে দাঁড়ানো বয়টা বুঝিয়ে দিলে মানেগুলো। বললে—ওরা বলছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—।

মিছিল তখন সার বেঁধে এগিয়ে আসছে।

মজুতদারের শাস্তি চাই।
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও।
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

জুডি হবসন তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটা বাগিয়ে নিলে। ঠিক ফোকাস করে নিয়ে ফোটো তুলে নিতে লাগলো একটার পর একটা। খুব লম্বা মিছিল। সাউথ থেকে নর্থের দিকে যাচ্ছে।

ক্লারা জিজ্ঞেস করলে—ওরা কোথায় যাচ্ছে জুডি? কোথায় যাচ্ছে ওরা?

জুডি ফোটো তুলতে তুলতে বললে—ওরা সবাই গভর্নরস-হাউসের দিকে যাচ্ছে।

—গভর্নরস-হাউসে গিয়ে কী করবে?

—দে উইল স্কোয়াট দেয়ার। ওখানে রাস্তায় বসে পড়বে।

—তারপর?

—তারপর পুলিশ ওদের বাধা দেবে। লাঠি মারবে। টিয়ার-গ্যাস ছুঁড়বে। তারপর ফাইটিং সুরু হবে—

—তারপর?

—তারপর বাস—ট্রাম পুড়িয়ে দেবে, আগুন জ্বলবে শহরে—ক্যালকাটা-সিটি তখন একটা ব্যাটল-ফিল্ড হয়ে উঠবে।

ক্লারা বললে—তুমি এত জিনিস জানলে কী করে জুডি? হাউ ডু ইউ নো? আগে কখনও ক্যালকাটায় এসেছিলে নাকি?

—না, আমার আনকেল যে সব বলেছে আমাকে। আনকেল ছিল বেঙ্গল গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারি। আমার আনকেলের সময় কংগ্রেস-পার্টি ঠিক এইরকম করেছে, এখন কংগ্রেস এখানে রুলিং পার্টি, অন্য পার্টিরা আবার এখন সেই একই ট্যাকটিক্স ধরেছে—

নিচের রাস্তার ওপর তখন তুমুল শোরগোল। হাজার-হাজার মানুষের গলার শব্দে তখন স্ট্র্যান্ড হোটেলের ব্যালকনি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

✿ ✿ ✿

গ্লাস-ফ্যাক্টরির গোস্বামীকে মাঝে মাঝে স্ট্র্যান্ড হোটেলে আসতে হয়। সেদিন তার পোশাক-পরিচ্ছদ অন্যরকম থাকে। সেদিন সেলুনে গিয়ে দাড়িটা কামিয়ে মুখে স্নো-ক্রীম মাখতে হয়। সেদিন আর পাড়ার লোক চিনতে পারে না তাকে।

বলে—কী গোস্বামীদা, আর যে তোমাকে চিনতে পারা যাচ্ছে না?

গোস্বামী বলে—বড়বাবুর হুকুম, আর কী করবো বলো ?

—তা সাহেবেরই গাড়ি বুঝি ?

গাড়ি যে সাহেবের তা গাড়ির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। শুধু গাড়ির চেহারাই নয়, ড্রাইভারের চেহারা-পোশাকও সেই রকম। এই গোস্বামীকেই পাড়ার লোক একদিন খালি পায়ে খালি গায়ে ঘুরতে দেখেছে। এমন একদিন গেছে যেদিন সামান্য চুল কাটবার পয়সাও ছিল না। ভাত খেতে পাক আর না-পাক বিড়িটা খেত ফুঁক ফুঁক করে। তখন এ-বাড়ির বৌদি, ও-বাড়ির মাসিমা লুকিয়ে লুকিয়ে গোস্বামীকে পয়সা দিয়েছে এটা-ওটা কিনে আনতে। কারো সিনেমার টিকিট কিনতে হলে গোস্বামীকে টাকা দিত। গোস্বামী গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনে এনে বৌদি-মাসিমাদের দিত। দুপুরবেলা সেই টিকিট নিয়ে তারা সিনেমায় যেত। তার বদলে সিকিটা-পয়সাটা যখন যা দরকার হতো গোস্বামীর, তা তারা দিত।

কেন্তু সেই গোস্বামীরই একদিন কোন্ এক ফ্যাক্টরিতে চাকরি হলো। তখন বিয়ে করলো গোস্বামী। ছেলেমেয়ে হলো। তারপর পায়ে ভালো জুতো উঠলো, গায়ে ভালো সার্ট উঠলো। মাঝে মাঝে বিড়ি ছেড়ে দিয়ে আবার দামী সিগারেট খেতেও দেখা গেল তাকে।

গোস্বামী বলতো—ভাই, সাহেবের কাজে বড় বড় জায়গায় যেতে হয়, সাজ-পোশাক ভালো না হলে আর চলে না—

—কোথায় যেতে হয় তোমাকে গোস্বামীদা ?

—তা কি বলা যায় ভাই ? যখন যেখানে হুকুম হয় সেখানেই যেতে হয়। হয়ত রাজভবনেও যেতে হয়—

রাজভবনে যেতে হয় শুনে সবাই অবাক হয়ে যেত। বলতো—রাজভবনে কী করতে যেতে হয় রে বাবা ?

গোস্বামী বলতো—তা বড় বড় হোমরা-চোমরা লোকদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে রাজভবনে যেতে হবে না ? তোমরা কোথায় আছো ?

—আর কোথায় যেতে হয় ?

—স্ট্র্যান্ড-হোটেল দেখেছ ? অন্তত নাম শুনেছ ? চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট, কত জায়গার নাম বলবো ?

লোকেরা আরো অবাক হয়ে যেত। বলতো—স্ট্র্যান্ড-হোটেলের ভেতরেও তুমি ঢুকেছ গোস্বামীদা ?

—আরে, ভেতরে না গেলে কি শুধু শুধু বলছি ?

—ওখানে তো সবাই মদ খায়। তুমি মদ খাও ?

গোস্বামী বলতো—আরে, তোরা সবাই এক-একটা আস্ত গাড়োল। মদ না খেলে ওখানে ঢুকতেই দেবে না তোদের। বলবে মদ না খেলে তুমি ভদ্দরলোকই

নও—

লোকেরা সাহস পায়। তারাও মদটা-আশটা খায়। খালাসীটোলায় কি ময়ূরভঞ্জ রোডের দিশি মদের দোকানে ভাঁটিখানায় লুকিয়ে লুকিয়ে মাটির ভাঁড়ে চুক করে চুমুক দিয়েই তেলেভাজা চিবোতে চিবোতে ছাতার আড়াল দিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু প্রকাশ্যে সকলের সামনে আলোর তলায় টেবিলে মদ খাওয়া কারোর কপালে নেই। সে আলাদা আরাম।

গোস্বামী বলতো—আমি কি আর একলা খাই রে, বড় বড় গভর্মেন্টের অফিসার, খাস বিলিতি সাহেব-সুবোদের সঙ্গে বসে খাই।

—অনেক দাম বুঝি বিলিতি মদের?

গোস্বামী বলতো—আরে দূর, আমার পয়সায় খাই নাকি। আমার বড়-সাহেব খাওয়ায়, যার এই গাড়ি, যার গাড়ি চড়ে বেড়াই, সেই সাহেবই তো আমাকে খেতে শিখিয়েছে রে। সাহেব বলে—খাও গোস্বামী, আর একটু খাও—

—সাহেব তোমার খুব ভালো লোক তো গোস্বামী!

—আরে, লোক নয়, দেবতা, দেবতা—

গোস্বামীর কথা কারো অবিশ্বাস হবার মত নয়। নইলে গোস্বামীদা অত বড় গাড়ি চড়ে বেড়ায়ই বা কী করে! সিগারেট বা খায় কী করে। সিগারেটের কি কম দাম? অথচ এই কিছুদিন আগেও গোস্বামীদা ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতো, গোস্বামীদের পৈতৃক বাড়িটা তো ভেঙে ভেঙে পড়তো। তিন-চার পুরুষ আগে কে একজন পূর্বপুরুষ ওই দালানটা করে গিয়েছিল বলে মাথা গোঁজবার যা-হোক কিছু একটা ছিল। নইলে কী করতো গোস্বামী?

হবিতকী বাগান লেনটা যেখানে বেঁকে গিয়ে বিডন স্ট্রীটে মিশেছে, তার পাশেই একখানা বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে গাড়িটা থামলো।

পাশের জানালা দিয়ে সুরমা গাড়িটা দেখতে পেয়েছে। ডাকলে—ও ঠাকুরপো, ঠাকুরপো—

গোস্বামীরও বৌদিকে দেখতে পেয়ে একগাল হাসি। বললে—কী বৌদি, দাদা কোথায়? লেখাপড়া করছে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সুরমা বললে—তোমাকে আর চেনাই যায় না যে ঠাকুরপো, বেশ আরাম করে গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছো—

—আর বোল না বৌদি, আমি না হলে যেমন সাহেবের চলে না, আবার সাহেব না হলে তেমনি আমারও চলে না। এই যেতে হবে এখন বরানগরে।

—কেন, বরানগরে কেন?

—আর বলো কেন, সাহেব যেমন মোটা মাইনে দেয়, তেমনি খাটিয়েও নেবে তো! আমি না হলে তো ফ্যাক্টরি চলবে না। আমিই তো সব কিনা। ফ্যাক্টরি তো সাহেবের, কিন্তু চাবি-কাঠি তো সব আমার হাতে!

সুরমা পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে। কত বছর হলো কলকাতায় এসেছে। এই গলি-টার ভেতর সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটা বলিষ্ঠ আশায় বুক বেঁধে বাস করে আসছে। ছোট একখানা ঘরের ভাড়াটে, সুখের মুখ দেখে তার তৃপ্তি হয় না। বড় রাস্তার হৈ-চৈ-আওয়াজ শুধু কানে আসে। রাস্তা থেকে মিছিলের শব্দ শুনে জানালাটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করে। খুব যদি সাহস হয় তো দু'পা বাড়িয়ে মোড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়ায়! আড়াল থেকে দেখে হাজার-হাজার লোকের মিছিল চলেছে। ছেলে-মেয়ে সব একাকার—

সবাই চিৎকার করছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

সুরমার বেশ লাগে। কথাটার মানে কেউ জানে না। আশেপাশের বাড়ি থেকে অন্দরমহলের বৌ-ঝি-ঝিউড়ি সবাই ঝুঁকে পড়ে মজা দেখতে বেরিয়েছে।

মজুতদারের শাস্তি চাই
সস্তা দরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও।
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

আগে আগে বিয়ের বর-কনে দেখতে যেমন ভিড় করতো এ-পাড়ার ছেলে-মেয়েরা, এখন এই মিছিল দেখতেও ঠিক সেই রকম। ওমা, ছেলে-মেয়ে সব এক সঙ্গে যাচ্ছে যে গো! এও এক অভিজ্ঞতা সুরমার। শহরে এসে এও এক রকম নতুন ধরনের মজা দেখতে পাওয়া। নিরঞ্জন এক গাদা খাতা-বই-পত্র নিয়ে ঘামতে ঘামতে যখন বাড়ি এসে হাজির হয় তখন রাস্তায় গ্যাসের বাতি জেবলে দিয়েছে।

এসেই বলে—জানো, আজকে কী কাণ্ড?

কাণ্ড যে এ-পাড়াতেও হয়েছে তা শোনবার আগেই নিরঞ্জন নিজের কাণ্ডটার কথা বলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে—আজকে হঠাৎ একখানা ভালো বই পেয়ে গিয়েছি—জানো সুরমা—

—ভালো বই? সিনেমা? সুরমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—না না, সিনেমা দেখবো আমি? তুমি যে কী বলো। সিনেমা দেখবার সময় আমার আছে? বলে খাতাপত্তোর টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে আবার বলে—আজকে একটা নতুন বই-এর সন্ধান পেয়েছি, বুঝলে, নতুন ম্যানাস্-ক্রিপ্ট! একজন ভদ্দরলোকের কাছে রয়েছে।

—কী, জিনিসটা কী?

নিরঞ্জন বললে—মানে পুরনো একটা তালপাতার পুঁথি।

—তালপাতা? তালপাতা নিয়ে কী করবে?

—সে তুমি ঠিক বুঝবে না। আমার তো মনে হলো পুঁথিখানা বৌদ্ধযুগের, যদি খাঁটি জিনিস হয় তো একটা শোরগোল পড়ে যাবে বাজারে—বুঝতে পারলে না?

সুরমা কিছুই বুঝতে পারছিল না। তালপাতার পুঁথির সঙ্গে বাজারে শোরগোল পড়ে যাওয়ার কী সম্পর্ক তা তার মাথায় ঢুকছিল না।

জিজ্ঞেস করলে—সবাই বুঝি কিনতে চাইবে সেখানা ?

নিরঞ্জন বললে—নিশ্চয়ই, এখনি যদি কেউ জানতে পারে পুঁথিখানার কথা তো সবাই তা কেনবার জন্যে হুড়োহুড়ি করবে! সেইজন্যেই তো কাউকে জিনিসটা বলছি না।

—তা পুঁথিখানা কিনে কী করবে তারা ?

—ধরো, আমি যদি পাই পুঁথিখানা তো প্রমাণ করে দেব যে বাঙলা ভাষা দু'হাজার বছরের পুরনো ভাষা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করে প্রমাণ করেছিলেন আমাদের এই বাঙলা ভাষা আজ থেকে এক হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল। পুঁথিটা পেলে রিসার্চ করে তখন আমি আবার প্রমাণ করে দেব, না তাও নয়। শাস্ত্রী মশাই-এর চর্যাপদের আগে আফগানিস্থানে দু'হাজার বছর আগে আদি বাঙলা ভাষার অস্তিত্ব ছিল—

—তাতে কী হবে ?

—তাতে কী হবে বুঝতে পারছো না ? তখন প্রমাণ হবে আমার গবেষণাই খাঁটি, শাস্ত্রী মশাই-এর গবেষণার চাইতেও খাঁটি। এখন মুশকিল হচ্ছে টাকা নিয়ে—

—টাকা ?

নিরঞ্জন বললে—টাকা হলে ম্যানাস্‌ক্রিপ্টটা কিনে নিতাম!

সুরমা বললে—ও সব পুরনো কাগজ কিনে কী লাভ ? তাতে তোমার কলেজে মাইনে বাড়বে ?

নিরঞ্জন হাসলো। বললে—মাইনে বাড়াটাই কি সব ?

—সব নয় ? তুমি যে কি বলো ? মাইনে হলে একটা ভালো শাড়ি কিনতুম, অনেক দিন থেকে আমার একটা কাঞ্চিভরমের শাড়ি কেনবার সাধ. টাকার জন্যেই তো হচ্ছে না—পাশের বাড়ির মাসিমার মেয়ে একটা কিনেছে সেদিন, বড় সুন্দর দেখতে—

নিরঞ্জন বললে—এই তো সেদিন তোমাকে যে একটা শাড়ি কিনে দিলুম—

—বারে, সে তো ধনেখালি। কাঞ্চিভরম আমি কিনেছি কখনও ?

—তা ধনেখালিও তো খারাপ নয়।

সুরমা বললে—তুমি যে কী বলো, ধনেখালি পরে আমি কোথাও বেড়াতে যেতে পারি ? এই যে সেদিন ও-পাড়ায় ভাদুড়ীদের বিয়ের নেমন্তন্ন হলো, আমি সেই বিয়ের সময়কার মান্ধাতার বেনারসী-শাড়িটা পরে গেলুম। আমার এমন লজ্জা করছিল যে কী বলবো। আমি যদি খারাপ শাড়ি পরি তো তাতে তোমারই তো বদনাম, লোকে তো তোমাকেই দুষবে, তোমাকেই লোকে গরীব বলবে।

আমার আর কী!

নিরঞ্জন বললে—তা বলুক গরীব, গরীব বললে আমার কিচ্ছু লজ্জা নেই—

সুরমা রেগে গেল। বললে—তোমার লজ্জা না করতে পারে বটে, কিন্তু আমার লজ্জা করে। কেউ যদি আমাকে বলে টাকার অভাবে আমি শাড়ি কিনতে পারি না, তাতে আমার খুব গায়ে লাগে—

—কেন? গরীব কি তুমি কলকাতায় একলা? আর কোনও গরীব লোক নেই পাড়ায়?

সুরমা বললে—আমাদের মত গরীব কে আছে শুনি? সকলের কত শাড়ি আছে জানো? ওই তো মাসিমার মেয়ে, ওই তো এক ফোঁটা বয়েস, ওর আলমারিতে সেদিন বত্রিশটা শাড়ি দেখালে।

এর আর উত্তর দিতে পারে না নিরঞ্জন। সামান্য শাড়ি-টাকা-গয়না নিয়ে কেন যে মানুষ মাথা ঘামায় তাও বুঝতে পারে না সে। আস্তে আস্তে গায়ের জামাটা খুলে আলনায় রেখে দেয়। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার বইখানা নিয়ে বসে। দু'হাজার বছর আগেকার বাঙলা ভাষার নমুনা খুঁজে চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করে। ক্রিয়াপদের রকমফের নিয়ে তুলনা করে। ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে ডুবে যায়। কারক-বিভক্তি আর সন্ধি।

রাত্রে শুতে এসে সুরমা বলে—তুমি এখন আলো জেলে লেখা-পড়া করবে নাকি?

তা নিরঞ্জনের রাত জাগতেও ক্লান্তি নেই। ওই কারক-বিভক্তি আর সন্ধির মধ্যেই নিরঞ্জন দিন-রাত ডুবে থাকতে ভালবাসে। তারপর কখন সে ঘুমোয় তা আর সুরমা টের পায় না। ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে সুরমা উনুনে আগুন দেয়। তখন আর কথা বলবারও সময় থাকে না নিরঞ্জনের। তাড়াতাড়ি গরম-গরম ভাত নাকে-মুখে গুঁজে নিরঞ্জন গোবরডাঙ্গায় চলে যায়। সেখানেই তার কলেজ। তখন আর কোনও কাজ থাকে না সুরমার। তখন যে সে কী করবে তার ঠিক পায় না। খানিক গড়িয়ে নেয় বিছানায়, খানিক পাশের বাড়ির মাসিমার কাছে গিয়ে গল্প করে। শাড়ির গল্প, গয়নার গল্প, রান্নার গল্প। তাতেও যখন ক্লান্তি আসে, তখন গলির ধারে জানালাটার কাছে এসে বসে। ক্বচিৎ কদাচিৎ দু'একটা লোক হেঁটে যায় রাস্তা দিয়ে। তাতেই বৈচিত্র্য আসে। আর নয়তো এক-একদিন মিছিল বেরোয়। সেই শব্দগুলো কানে এলেই বেশ লাগে—

মজুতদারের শাস্তি চাই,
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও—
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

আর হঠাৎ এক-একদিন বিরাট একটা গাড়িতে চড়ে গোস্বামী ঠাকুরপো এসে

নামে। তখন জিজ্ঞেস করে—কী ঠাকুরপো, আজকে আবার কোথায় ?

গোস্বামী বলে—আজকে একবার হোটেলে যেতে হবে, বৌদি—

—হোটেলে ? হোটেলে কী করতে ঠাকুরপো ? বাড়িতে রান্না হয়নি নাকি ?

—দূর, বাড়িতে তো সেই শাক চচ্চড়ি রান্না হয়েছেই, কিন্তু হোটেলে খেতে যাবো না, খাওয়াতে যাবো। বড় বড় সব লোক আসবে শিরীষবাবুর।

—তুমি বেশ আছো ঠাকুরপো, সত্যিই বেশ আছো !

গোস্বামী বললে—কী যে বলো বৌদি তুমি, চাকরির জন্যে আমাকে সব করতে হয়। যে মনিব খাওয়ায় পরায়, সে যা বলবে তাই তো করতে হবে !

সুরমা বললে—তা তোমার তো আর সে-জন্যে নিজের পয়সা খরচ হচ্ছে না ঠাকুরপো ?

—না, তা হয় না। উল্টে মনিব আমার জন্যেই পয়সা খরচ করবে। এই যে এখন হোটেলে যাচ্ছি, এখন আমায় পাঁচশো টাকা দিয়ে দিয়েছে, এই দেখ না—

বলে পকেট থেকে পাঁচটা একশো টাকার নোট বার করে দেখালে।

তারপর নোটগুলো আবার পকেটে রেখে দিয়ে বললে—এই সবগুলো টাকাও যদি খরচ করে ফেলি তো কেউ তার জন্যে জবাবদিহি চাইতে আসবে না। আমার যেমন খুশী তেমনি খরচ করবো।

—সত্যি তুমি বেশ আছো ঠাকুরপো। তোমার মত যদি পুরুষ মানুষ হতুম আর তোমার মতন অমনি চাকরি করতুম তো বেশ হতো। বেশ হতো। তা না, কেবল একখানা ঘরের মধ্যে বাঁধা থাকতে আর ভাল্লাগে না আমার, সত্যি বলছি—

গোস্বামী হাসে। বলে—তা তুমি যদি যাও একদিন তো তোমাকে নিয়ে যেতে পারি বৌদি—

—ওমা, তোমার মনিব কিছু বলবে না তাতে ?

গোস্বামী বলে—বলবে আবার কী ? জানতে পারলে তবে তো ! তোমাকে নিয়ে অনেক দূর ঘুরে আসবো। চলো, চন্দননগর চলো, রাঁচি চলো, হাজারিবাগ চলো—যেখানে খুশী তোমার চলো না—যাবে ?

সুরমা বললে—এই ধরো তোমার দাদা কলেজে চলে যাবার পর যদি যাই ?

—হ্যাঁ, তাও যেতে পারো।

—আর তারপর তোমার দাদার ফিরতে তো সেই রাত আটটা ন'টা। তার আগে ফিরে এলেই চলবে।

গোস্বামী বললে—তাহলে কবে তুমি যাবে বলো বৌদি ?

সুরমা বললে—যেদিন তোমার খুশী ঠাকুরপো—

তারপর একটু গলাটা নিচু করে বললে—কিন্তু দেখো ঠাকুরপো, কেউ যেন জানতে না পারে !

গোস্বামী শিরীষবাবুর গ্লাস-ফ্যাক্টরিতে বহুদিন কাজ করছে। এ-সব কথা

যে কাউকে বলতে নেই তা সে ভালো করেই জানে। তবু ভদ্র গেরস্থঘরের মেয়েদের প্রথম-প্রথম একটু ভয় করে বৈকি। ভয় করা ভালো। ভয়-করা মেয়েদেরই তো চায় মানুষ। একেবারে হা-হা করা মেয়ে সাপ্পাই করলে শিরীষবাবুর কাজ হাঁসিল হয় না।

গোস্বামীর তখন দেরী হয়ে যাচ্ছিল। সুরমাকে কথা দিয়ে সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

আগে, অনেক আগে ইন্ডিয়াকে ওরা বলতো ব্যাকওয়ার্ড কান্ট্রি। তাতে ইন্ডিয়ার মনে ঘা লাগতো। অপমান বোধ করতো ইন্ডিয়া! পরে তাকে বদলে বলতে লাগলো আন্ডার-ডেভেলপ্‌ড্‌ কান্ট্রি। কিন্তু তাতেও যুত হলো না। ইন্ডিয়ানদের ইজ্জতে আঘাত লাগতে লাগলো। তারা বললে—না হুজুর, আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি, আমরা এখন রোলস্‌-রয়েস চড়ছি, আমাদের অ্যামব্যাসাডাররা এখন সব দেশে গিয়ে সমানে সমানে তাল রেখে চলেছে, এখনও তোমরা কেন আমাদের নিচু চোখে দেখছো। ও-নাম বদলে দাও।

তারপর নতুন নাম হলো ডেভলপিং কান্ট্রি। অর্থাৎ অগ্রসরমান। অগ্রসর ধাতুর সঙ্গে সানচ প্রত্যয় করে একটু ইজ্জৎ বাড়িয়ে দিলুম তোমাদের। কিন্তু টাকা তোমাদের ধার নিতেই হবে। তোমরা যে রাতারাতি আমাদের ব্লক ছেড়ে আবার রাশিয়ার কাছে হাত পাতবে তা হতে পারবে না।

এরা বললে—আজ্ঞে হুজুর, তাহলে আমরা আর স্বাধীন হলুম কোথায়?

হোয়াইট-হাউস বললে—ঠিক আছে, তাহলে এক কাজ করো। আমরা যে পাউডার-মিল্ক দেবো, গম দেবো, চাল দেবো, তার জন্যে তোমাদের চড়া হারে সুদ দিতে হবে—

—আজ্ঞে তা কী করে দিতে পারবো। আমরা যে বড় গরীব।

—তা হলে বেশ তো মজা। ধারও নেবে সুদও দেবে না, তা তো হয় না। এসো এক কাজ করি। তোমাদের ফাইন্যান্স-মিনিস্টারকে আমাদের এখানে একবার পাঠিয়ে দাও, তার সঙ্গে একবার পরামর্শ করি। তিনি এখানে আসবেন, এখানে আমাদের স্টেট-গেস্ট হয়ে থাকবেন। তারপরে আলোচনা হলে যা ফয়সালা হবে তাতে সই করে দেবে তোমাদের ফাইন্যান্স-মিনিস্টার—

তা এই-ই হলো সূত্রপাত। সেই হোয়াইট-হাউসের তৎকালীন ভাগ্যবিধাতা আইসেনহাওয়ারের সময়েই ইন্ডিয়া থেকে মোরারজী দেশাই সাহেব গেলেন কনফারেন্স করতে। বড় গোপন, বড় অন্তরঙ্গ সে কনফারেন্স। এত অন্তরঙ্গ যে বাইরের লোকের কানে তা যাওয়া বিপজ্জনক। ও-সব ডিপ্লোমেটিক সলা-

পরামর্শ বড় গোপনেই হয়ে থাকে বরাবর। শুধু ইন্টারন্যাশন্যাল পরামর্শ ই নয়, কলকাতার যত রকমের যত কিছু পরামর্শ সবই গোপনীয়। 'ইন্টারন্যাশনাল গ্লাস ফ্যাক্টরি'র মালিক শিরীষবাবুও যে 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপ বেরার সঙ্গে পরামর্শ করে তাও কনফিডেনসিয়াল।

দিলীপ বেরা জিজ্ঞেস করেছিল—হারান নস্কর লেনে গিয়েছিলেন নাকি শিরীষবাবু ?

শিরীষবাবু বললে—আরে না হে দিলীপ, তুমি আমাকে পাঠালে বটে আমিও ভেবেছিলুম শাঁসালো পার্টি, কিন্তু নাঃ—

—না মানে ?

—না মানে একেবারে টাকাটাই জলে গেল। জিনিসটা বড় রোগা, একেবারে হাড় বেরনো। আমি গেছি ফুর্তি করতে। গিয়ে দেখি একটা কেলে-কুচ্ছিৎ হাড়-জিরজিরে মেয়ে বসে বসে ঠাকুর-দেবতার বই পড়ছে—

দিলীপ বেরা অবাক হয়ে গেল—ঠাকুরদেবতার বই ? বলেন কী ?

—আরে হ্যাঁ হে, জিজ্ঞেস করলাম কী বই ? মেয়েটা বললে—শ্রীকান্ত, ঠাকুরের জীবনী। অর্থাৎ ধর্মের উপদেশ-টুপদেশ আর কী! দেখেই তো রক্ত জমে বরফ হয়ে গেল।

দিলীপ বললে—কেন, ওর একটা ধাড়ি বোন ছিল যে, বোনটা আসেনি ? বোনটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না ?

—আরে না হে, আমি কতবার বললাম আপনার সিসটারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন। তা বলে কী জানো ? বলে আমার সিসটার কলেজে গেছে—

—রাত্তির বেলা কলেজে ?

—তাই বলে কে ? অথচ তুমি যা বলেছিলে আমি তা-ই করেছি। রাবড়ি পাওয়া যায় না, আমি তোমাকে অর্ডার দিয়ে স্পেশাল রাবড়ি করিয়ে নিয়ে গেলুম ওর অন্ধ মা'র জন্যে, সব বরবাদ হয়ে গেল।

দিলীপ বললে—তা তারপর কী হলো তাই বলুন—

—তারপর আর কী করবো, বাড়ি চলে এলুম। তোমার কথা শুনেই ওখানে গিয়েছিলুম, নইলে ওসব বাজে জায়গায় আমি কখনও যাই ? তুমিই বললে গরীব গেরস্থ লোক, টাকার অভাবে সংসার চালাতে পারে না, বোনটার বিয়ে দিতে পারছে না ; তুমিই তো রেকমেন্ড করলে—

দিলীপ বেরা বললে—তারপর আপনি চলে এলেন ?

—না, আমি অমনি ছাড়িনি। আমি তক্কে তক্কে থাকতে লাগলুম। আমার ওখানে গোস্বামী আছে, চেনো তো ? সেই গোস্বামীকে একদিন কাজে লাগালুম। বললুম, তুমি খবর নাও তো গোস্বামী, ও মেয়েটা কোথায় যায়, কোন্ কলেজে পড়ে, কার সঙ্গে ঘোরে, অত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকে···

—তারপর ?

—তারপর সব খবর পেলাম হে। কলেজ-ফলেজ সব বাজে কথা। আসলে ভাড়া খাটে হে !

—কী রকম ? কী রকম ?

—হ্যাঁ হে, একদিন স্ট্র্যান্ড-হোটেলের মধ্যে দেখা। আগে একটুখানি মুখটা দেখা ছিল, তাই তখ্খুনি চিনে ফেললুম। বললুম—আপনার নাম সুসী না ? বলতেই তেড়ে এল আমার দিকে। বুঝলে হে, একেবারে তেড়ে এল আমার দিকে—

—তাই নাকি ? আপনি কী করলেন ?

শিরীষবাবু বললেন—ব্যাপারটা বুঝলাম।

—কী ব্যাপার ?

—সঙ্গে একজন ইয়ং-ম্যান রয়েছে, বুঝলাম ভাড়া খাটছে। বুঝে আর কিছু বললাম না, চুপ করে রইলুম। তারপর নিজের সম্মান নিজেই রেখে চলে এলুম ভাই। শেষকালে হোটেলের ভেতরে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে যাবে, তাই আর কিছু বললুম না।

দিলীপ বেরা বললে—আপনি কিছু মনে করবেন না, শিরীষবাবু, আমি সব ঠিক করে দেব। কল-কাঠি তো আমার হাতে। সংসার-খরচের টাকায় টান পড়লে তো সেই আমার কাছে এসেই হাত পাততে হবে—তখন দেখে নেব, আপনি কিছু ভাববেন না—

তা ভাববার লোক নয়, শিরীষবাবু। শিরীষবাবু কলকাতার বুকের ওপর বসে দিল্লী মাদ্রাজ বোম্বাইতে ব্যবসা চালাচ্ছে। এখানকার 'ইন্টারন্যাশন্যাল গ্লাস ফ্যাক্টরি'র গেলাসে মদ ঢেলে দিল্লীর গুজরাটি ব্যবসাদার তামাম দুনিয়াকে মাতাল করে দেবার মতলব আঁটছে। সেই শিরীষবাবু বাঙালী-সন্তান হলে কী হবে, মিছিমিছি ভাবনা করে রাতের ঘুম নষ্ট করবার মানুষ নন। গোস্বামীকে একটু টিপে দিলেই হলো। সে ঠিক তার কাজ করে যাবে।

সেদিন আবার সিনেমা থেকে বেরিয়েছে সুসী। ঘণ্টায় দশ টাকা কড়ারে যে-মেয়েরা কলকাতা শহরে ভাড়া খাটে তারা আর যা-ই হোক অত সস্তা আদরে ভোলে না।

সেদিন একজন পাঞ্জাবী ছেলে জুটিয়ে দিয়েছিল বেণুদি। চেহারা দেখে সুসীরা বুঝতে পারে কা'র টাকা আছে, আর কা'র টাকা নেই।

বেণুদি বলে দিয়েছিল—বেশি বেয়াড়াপনা করিস নে যেন মা। ছেলেটা নতুন এসেছে এ-লাইনে, এখনই যদি চার গুলিয়ে দিস তো আর কখনও তোর পুকুরে ছিপ ফেলবে না।

সুসী বলেছিল—কী করবো তুমি বলে দাও—

বেণুদি বলেছিল—আমি আবার কী বলবো মা, তোমার বয়েস হয়েছে তুমি জানো না পুরুষ মানুষ কীসে বশ হয় ?

সুসী বলেছিল—কিন্তু তুমি তো জানো বেণুদি, আমি কারো সঙ্গে শুই না—

—তা শুতে তোকে কে বলছে বাছা ? পুরুষ মানুষ একটু আদর-খাতির চায়। পয়সা খরচ করবে, তার বদলে একটু শুকনো খাতিরও করবি নে ?

সুসী জিজ্ঞেস করেছিল—কী করতে হবে বলে দাও না তুমি ?

বেণুদি বলেছিল—পারিনে বাপু তোর সঙ্গে তক্ক করতে, এ ধারাপাত নাকি যে শিখিয়ে পড়িয়ে মুখস্ত করিয়ে ছেড়ে দেব ? ছোকরার নিজের গাড়ি আছে, গাড়ি করে যদি লেকের ধারে কি গঙ্গার ধারে নিয়েই যায় তো যাবি, তখন যেন দোনা-মোনা করিস নে। অন্ধকার দেখে পার্কিং করে দু'জনে বসে বসে গল্প করবি, একটু গা-ঘেঁষে বসবি, এই আর কী। এটুকুও পারবি নে ? নইলে তোর জমি-বাড়ি হবে কী করে ?

তা সেই প্রস্তাবেই শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিল সুসী। বেশ সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ছেলে সন্তোখ অরোরা। পাঞ্জাবী সন্তান। চণ্ডীগড়ে লেখাপড়া শিখেছে। কলকাতায় এসেছে বাবার মোটর-পার্টস্-এর দোকান দেখা-শোনা করতে। মাসে হাজার-হাজার টাকার কারবার। সন্তোখ অরোরা ইচ্ছে করলে সুসীর সারাজীবনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। শুধু ভরণ-পোষণ নয়, আরো অনেক কিছু।—ওই যে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর পাশে এই জমিটা দেখছো, এটা আমাদের। এ রকম আরো অনেক জমি আছে কলকাতায় ছড়ানো। ইচ্ছে করলে তোমায় দিতে পারি।

—তুমি দিতে পারো ?

সন্তোখ অরোরা বললে—তোমার জন্যে সব দিতে পারি মিস ! আর কী চাও, বলো ?

সুসী একেবারে গলে গিয়েছিল সন্তোখের কথায়। বলেছিল—আর কিছু চাই না, আমি অনেকদিন থেকে টাকা জমাচ্ছি শুধু কলকাতায় একটা বাড়ি করবো বলে।

—বাড়িতে তোমার আর কে আছে ?

এ প্রশ্নে প্রথমটায় একটু সন্দেহ হয়েছিল সুসীর। সাধারণত এ-ধরনের কথা জিজ্ঞেস করার নিয়ম নেই এ-লাইনে। কিন্তু এ এত জমির মালিক, একে হঠাৎ চটাতে ইচ্ছে হলো না।

বললে—আমার এক বুড়ি মা আছে, সে অন্ধ, বেশি দিন বাঁচবেও না।

—আর কেউ নেই ?

—না।

সামনে বাস আর ট্রাম, মানুষ আর দোকান। গাড়ি আর রিক্শা। সবই রাস্তা দিয়ে চলেছে ওই এক উদ্দেশ্য নিয়ে। একটা আশ্রয় চাই, একটা মাথা গোঁজবার পাকাপাকি ঠাঁই। সেটা হয়ে গেলে আর কী চাই! তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা বিয়ে করবে সুসী। একটা গাড়ি কিনবে, আর এই রকম করে গাড়ি চালিয়ে বেড়াবে দু'জনে। কোথাও কোনও ভাবনা থাকবে না। চলো শাড়ি কিনে আসি, সিনেমা দেখি, হোটেলে ঢুকি। কিংবা কোনওদিন যাই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা হাজারিবাগ কি রাঁচি কি নেতারহাট! তারপর সারা আকাশ আমাদের মুঠোর মধ্যে, সারা জীবন আমাদের পকেটে।

—সত্যি বলো না, এ-জমিটা তোমাদের?

—সত্যি না তো কি মিছে কথা বলছি?

—কত দাম নেবে? একটু সস্তা দরে দিও কিন্তু—

সন্তোখ অরোরা বললে—তোমার কাছে আবার দাম নেব কী?

—যাঃ, তুমি মিছে কথা বলছো আমার সঙ্গে। তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছো—

গাড়ি ঘুরে গিয়ে তখন ডান দিকে অন্ধকারে ঢুকলো।

—আমাকে অমনি-অমনি দিলে তোমার বাবা কিছু বলবে না?

—বাবা?

সন্তোখ অরোরা হেসে উঠলো হো-হো করে। বাবা বেঁচে থাকলে কি এই রকম করে খুশীমত ফুর্তি করতে পারি নাকি? তুমি কি মনে করছো আমার বাবা বেঁচে আছে? এখন সমস্ত প্রপার্টির তো আমিই মালিক! এই জমি, এই বাড়ি, এই বিজনেস সবকিছুর মালিক এখন আমিই। আমি ইচ্ছে করলে সব কিছু এখন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি, আবার রাতারাতি দুনিয়াটাকে কিনে ফেলতে পারি।

সন্তোখ এক হাতে স্টিয়ারিংটা ধরলো। আর একটা হাত বাড়িয়ে সুসীকে ধরলো।

—ডারলিং, মাই সুইট ডারলিং—

সুসী চড়াই পাখীর মত সন্তোখের বুকের ভেতরে লেপ্‌টে রইল। যদি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকা যেত তো ভালো হতো। আরো কাছাকাছি। লাখ লাখ টাকার মালিকের কাছাকাছি থাকা ভাল। তাতে বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাতে মনে হয় কোনও ভয় নেই কোথাও, কোথাও কোনও ভাবনা নেই। লাখ লাখ টাকার একটা উত্তাপ আছে। মাথার ওপরে ছাদ থাকার উত্তাপ, ব্যাঙ্কের পাশ বইতে মোটা টাকা থাকার উত্তাপ, চারপাশে চারটে দেয়াল আর সামনে একটা ছোট্ট বাগান থাকার উত্তাপ। সেই উত্তাপের আরামে ঘুম আসে। যেমন পালকের লেপের ভেতরে আরামে ঘুমিয়ে থাকে টাকাওয়ালা লোকেরা। সেই ঘুমের পরে থাকে ভোরের চা। বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে আধা-ঘুমের ঘোরে চা খেতে

পাওয়ার বিলাস!

তারপর আরো অন্ধকার হয়ে এল কলকাতা। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল পৃথিবী। আরো নিচু হয়ে এল আকাশ। আর তারপর লেকের জলের ধারে আরো নির্জন হয়ে এল শহর, আরো নিস্তব্ধ হয়ে এল জীবন, আরো উদ্দাম হয়ে এল যৌবন।

—কে?

হঠাৎ একটা টর্চের আলো এসে পড়লো।

যেন কে একজন এক নিমেষের মধ্যে সুসীকে একেবারে আকাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচের মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। একেবারে আরামের লেপের তলা থেকে বাইরে শীতের ঠাণ্ডা বরফের মধ্যে। কাপড়টা এক মুহূর্তে সামলে নিয়েছে সুসী।

তাড়াতাড়ি সরে এসেছে সন্তোখের কাছ থেকে।

—থানায় যেতে হবে আপনাদের।

সাদা পোশাকপরা একজন পুলিশ ইনসপেক্টর, সঙ্গে একটা কনস্টেবল। একেবারে অন্ধকারের বুক জুড়ে ভুঁইফোড় হয়ে উদয় হয়েছে। সুসী সন্তোখের কানে-কানে ফিস ফিস করে বললে—ওদের কিছু টাকা দিয়ে দাও—

সন্তোখ পাঞ্জাবী বাচ্চা। বেশি ভয় পায়নি কিন্তু। বললে—কেন, আমরা কী করেছি যে ঘুষ দিতে যাবো? কী করেছি আমরা যে আমাদের ধরতে এসেছে?

—চলুন, থানায় চলুন।

সন্তোখ রুখে উঠলো। বললে—কেন, কী করেছি আমরা?

—পাবলিক নুইসেন্স করেছেন, ইম্‌মর‍্যাল ট্রাফিক অ্যাক্টে আমরা অ্যারেস্ট করছি—

—চলুন, থানাতেই যাবো। সন্তোখ বুক ফুলিয়ে আরো রুখে দাঁড়ালো।

সুসীর তখন শুধু কাঁদতে বাকি! বললে—তুমি ওদের পাঁচটা টাকা দিয়ে দাও না তোমার কাছে কি টাকা নেই?

—কেন টাকা দেব মিছিমিছি? পুলিশ যা বলবে তাই-ই শুনতে হবে নাকি?

সুসী বললে—আমাদের যে থানায় ধরে নিয়ে যাবে। সব যে জানাজানি হয়ে যাবে—

ততক্ষণে ইনসপেক্টর আর কনস্টেবল গাড়ির ভেতরে উঠে পড়েছে। গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললে—চলুন, গাড়ি স্টার্ট দিন—

গাড়ি চালিয়ে দিলে সন্তোখ। সুসী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সুরু করে দিয়েছে তখন। সুসীর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার রাত্রির অন্ধকারও যেন কাঁদতে লাগলো। ওগো, তোমরা কেউ কিছু বলছো না কেন? কেউ প্রতিবাদ করছো না কেন? আমি মুখ দেখাবো কেমন করে? সমস্ত

পৃথিবী যে জেনে ফেলবে আমি নিজেকে ভাড়া খাটাই! সবাই যে আমার মুখে চুণ কালি লেপে দেবে! আমার যে সর্বনাশ হবে! ওগো

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

মিছিলটা তখন আরো এগিয়ে গেছে। যাদবপুর ছাড়িয়ে গড়িয়াহাট। গড়িয়াহাট ছাড়িয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। দু'পাশের বাড়ি থেকে মানুষরা জানলা দিয়ে দেখছে। টা-টা করছে দুপুর। অরবিন্দর বড় জল তেষ্টা পেতে লাগলো। কেলো-ফটিকের দিকে চেয়ে দেখলে অরবিন্দ। কেলো ফটিকের কিন্তু ক্লান্তি নেই। এমনিতে কেলো ফটিকরা পাড়ার চায়ের দোকানে বসে দিন রাত গুলতানি করে। বাইরের রাস্তার মেয়েদের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। আজ আর সে বেকার নয়। আজ একটা কাজের মত কাজ পেয়েছে। কাজ পেয়ে বর্তে গেছে। তাই প্রাণপণে সমানে চেঁচিয়ে চলে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

সেদিন রাত্রে বাড়িতে পুলিশ দেখে অরবিন্দ যতটা না ভয় পেয়েছিল তার চেয়ে বেশী ভয় পেয়েছিল মা।

মা বললে—তা সুসীকে পুলিশে ধরলে কেন বাছা? কী করেছিল সে? সে মেয়ে তো আমার কোনও দোষ করতে পাবে না বাবা—

অরবিন্দর মনে আছে, সেই অত রাত্রে সে পুলিশের সঙ্গে থানায় গিয়েছিল সেদিন। সুসী মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদছিল তখন। বোধহয় লজ্জা হচ্ছিল কাউকে পোড়া মুখ দেখাতে!

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু আমার বোন কী করেছে স্যার?

দারোগা বলেছিল—কী করেছিল আপনার বোনকেই জিজ্ঞেস করুন না, সামনেই তো রয়েছে। ভদ্দরলোকের মেয়েরা আজকাল বেশ্যাদের হার মানিয়ে দিয়েছে মশাই!

অরবিন্দ বলেছিল—কিন্তু আমরা তো কিছুই জানতুম না—

—যখন কোর্টে কেস হবে তখন জানবেন!

—কোর্টে কেস হবে নাকি?

—তা হবে না? আমরা তবে আছি কী করতে? ভদ্দরলোকের ছেলেমেয়েরা লেকে বেড়াতে যায়, আর সেখানে কিনা এই কেলেঙ্কারি! এখন আপনার বোনের জামিনের ব্যবস্থা করুন, নইলে সারা রাত আপনার বোনকে এই থানার হাজতে আটকে রাখবো—

তা জামিনের ব্যবস্থা আর কে করবে? সেইজন্যে সেই অত রাত্রে আবার দিলীপদার বাড়িতেই যেতে হলো। দিলীপদা টাকাওয়ালা লোক। খুব বকুনি

দিলে খানিক। বললে—আমি তখুনি বলেছিলুম তোর বোনটার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়, তা তখন তুই বুঝিসনি, এখন ঠ্যালা বোঝ!

অরবিন্দ বললে—তুমি ছাড়া আমার কে আছে দিলীপদা,—তুমি আমাকে এবারের মত বাঁচাও—

আর ওদিকে তখন গোস্বামীও গিয়ে হাজির হয়েছে শিরীষবাবুর বাড়িতে।

—কী গোস্বামী, কী খবর?

গোস্বামী এইসব কাজের জন্যেই 'ইন্টারন্যাশনাল গ্লাস ফ্যাক্টরি'তে কাজ পেয়েছে। কখন কর্তার কী দরকার পড়ে তার জন্যেই ডেসপ্যাচ সেকশানে চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। যখন কাজ কর্ম থাকে না গোস্বামীর, তখন বড় মন-মরা হয়ে যায়। কিন্তু যখন শিরীষবাবুর ডাক পড়ে তখন হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। বলে—শক্তি, এক প্যাকেট সিগ্রেট নিয়ে আয়—

এমনি একদিন একটা কাজ দিয়েছিল শিরীষবাবু।

বলেছিল—গাড়ি নিয়ে একবার এক জায়গায় যেতে পারবি গোস্বামী?

গোস্বামী বলেছিল—কেন যেতে পারবো না স্যার, বলুন কোথায় যেতে হবে?

—হারান নস্কর লেন চিনিস?

—না-চিনলেও চিনে বার করতে দোষ কী?

—সেখানে গিয়ে দেখবি সাত নম্বর বাড়ি থেকে একটা মেয়ে রোজ দুপুর-বেলা হাতে বই-খাতা নিয়ে বেরোয়, তার পিছু নিবি—দেখবি কোথায় যায়, কী করে,—

—তারপর কী করতে হবে বলুন? তাকে হোটেলে তুলে নিয়ে আসতে হবে?

—দূর গাধা। তাকে ধরিয়ে দিতে হবে।

—তার মানে?

শিরীষবাবু রেগে গিয়েছিল। মনিব রাগ করলে গোস্বামীর বড় মন খারাপ হয়ে যায়।

শিরীষবাবু বললে—তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে হবে—স্ট্র্যান্ড হোটেলে একদিন বড় অপমান করে আমাকে কথা শুনিয়েছিল—

এর বেশি বলতে হয়নি শিরীষবাবুকে। তারপর চুপি-চুপি কখন হারান নস্কর লেনে গেছে, কখন সুসীকে দেখেছে, কখন তার পেছনে-পেছনে ঘুরেছে তা কেউই টের পায়নি। তারই মধ্যে এক-একবার খেতে এসেছে হরিতকী বাগান লেনে, নিজের বাড়িতে। দেখেছে, বৌদি ঠিক জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরমা বললে—কী গো ঠাকুরপো, খুব যে ক'দিন ঘোরাঘুরি করছো গাড়ি

নিয়ে, অফিসের ব্যাপারে বুঝি ?

—হ্যাঁ বৌদি, খুব কাজ—

—হোটেলে নাকি ?

—নাঃ, এবার হারান নস্কর লেন থেকে আসছি, সেখান থেকে ভবানীপুরে বেলতলা রোড, সেখান থেকে থানায়—

—থানায় ? পুলিশের থানায় ? থানাতেও তোমার কাজ থাকে নাকি ?

গোস্বামীর অত কথা বলবার সময় ছিল না সে-ক'দিন। বাড়িতে আসতো একটু খেতে, আবার তখুনি বেরিয়ে যেত। তারপরেই পাওয়া গেল একটা ছেলেকে। পাঞ্জাবী জাতে। বেশ চটকদার চেহারা। নাম সন্তোখ অরোরা। বেকার মানুষ। তাকেই পাঠানো গেল বেণুদির বাড়িতে। টেলিফোনেই সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। নিজে গাড়ি চালিয়ে যাবে, বলবে, বিরাট টাকার মালিক। বাবা মারা গেছে শুনলে সুসী খুশী হবে। তারপর থানার সঙ্গেও কথাবার্তা বলে রাখা হয়েছে। সিনেমা দেখে যখন বেরোবে দু'জনে, তখন গোস্বামী থাকবে পেছনের আর একটা গাড়িতে। পুলিশের দলও তৈরি থাকবে। সন্তোখ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়ে একবারে লেকের ধারে একটা নিরিবিলি কোণে গাড়ি থামাবে। তারপর একটু পরেই পুলিশ গিয়ে হাজির হয়ে গাড়ির মধ্যে টর্চ ফেলবে।

টর্চের আলো দেখেই চমকে উঠে সন্তোখ বলবে—কে ?

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গিয়ে অ্যারেস্ট করে দুজ'নকে নিয়ে থানায় আসবে। তখন জব্দ !

শিরীষবাবু সব শুনলেন। বললেন—কেউ জামিন দিয়েছে নাকি মেয়েটাকে—?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার !

—কে ? কোত্থেকে জামিন পেলে ?

—আজ্ঞে, 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র মালিক দিলীপচন্দ্র বেরা মেয়েটার জামিন হয়ে তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

শিরীষবাবু আর শুনলেন না। বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি যাও এখন—

বলে টেলিফোন তুললেন—কে, দিলীপ ?

ওপাশ থেকে দিলীপ বেরা বললে—কে ? শিরীষবাবু নাকি ?

—হ্যাঁ, বলছিলুম, শেষকালে তুমিই জামিন দিলে ?

দিলীপ বললে—দিলুম স্যার, বড় কান্নাকাটি করছিল অরবিন্দ, খুব শিক্ষা হয়ে গেছে ওর, এবারকার মত ওকে ক্ষমা করুন আপনি। আমি সব খুলে বলেছি ওকে, বলেছি তোমার বোনের হালচাল ভাল নয়, একটু সমঝে চলতে বোল এবার থেকে—

—শুনে কী বললে ?

দিলীপ বললে—কী আর বলবে ও, ওর বোন তো ওর বশ নয়! আজকাল যে দুনিয়া বদলে গেছে, নইলে আপনার মত লোককে কেউ অপমান করতে পারে?

শিরীষবাবু বললেন—ওকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও তো হে, আমি দু'একটা কথা বলবো ওকে—

দিলীপ বললে—ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, এই তো অরবিন্দ আমার সামনে এখানেই দাঁড়িয়ে আছে, আমি কালই আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিচ্ছি ওকে—

শিরীষবাবু টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু অরবিন্দ স্বপ্নেও ভাবেনি যে সেই শিরীষবাবু পরের দিন অমন করে অরবিন্দর সঙ্গে কথা বলবেন।

তিনি বললেন—আপনি আসলে কী করেন অরবিন্দবাবু?

একদিন এই অরবিন্দই শিরীষবাবুকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিজের শোবার ঘরে বসিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। এই শিরীষবাবুই সেদিন মাকে এক কিলো রাবড়ি কিনে নিয়ে গিয়ে দিয়েছিল। সেদিন আর এদিনে অনেক তফাৎ। তখন যেন ছিল প্রায় সমানে সমানে।

মনে আছে, গোপার খুব মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিল শিরীষবাবু চলে যাবার পর। রাত্রিবেলা সাত নম্বর থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে আট নম্বরে এসে বালিশে মুখ গুঁজে পড়েছিল অরবিন্দ।

গোপার বোধহয় খুব দুঃখ হয়েছিল অরবিন্দকে দেখে।

বলেছিল—তুমি আমার ওপর রাগ করলে তো?

অরবিন্দর দিক থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে গোপা অরবিন্দর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে জিজ্ঞেস করেছিল—সত্যি বলো না, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?

অরবিন্দ তবু কিছু উত্তর দেয়নি।

গোপা বলেছিল—কিন্তু আমি কী করবো বলো? আমাকে যদি কেউ পছন্দ না করে তো আমার কী অপরাধ? আমার চেহারা ভাল নয় সেও কি আমার দোষ?

তবু অরবিন্দ উত্তর দেয়নি সে-কথার।

—আমার চেয়ে সুন্দরী বউ হলে তোমার আজকে ভাবতে হতো না। তারই দৌলতে তোমার বাড়ি হতো, গাড়ি হতো, সব কিছু হতো! কিন্তু আমি এখন কী করবো তাই বলে দাও। আমাকে যে ভগবান রোগা-রোগা কাঠির মত হাত দিয়েছে, গায়ে মাংস দেয়নি, রং দেয়নি। আমাকে দেখে যে লোকের পছন্দ হয় না। আমি কী করবো, বলো না—

অরবিন্দ তখনও কিছু উত্তর দেয়নি।

গোপা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো তখন। সংসারের কোনও কাজেই

যে মেয়ে এল না, যাকে দিয়ে স্বামীর কোনও সাশ্রয়ই হলো না, তার পক্ষে কান্না ছাড়া আর গতি কী ? সেই রকম কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগলো—ওগো, তুমি বলো, তুমি বলে দাও, আমার কী দোষ ? বলো, কথা বলো, উত্তর দাও—

অরবিন্দ আর থাকতে পারলে না।

হঠাৎ রেগে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে বিছানা থেকে টেনে তুললে—বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে, বেরিয়ে যাও—যাও বেরিয়ে—

সেদিন বড় রাগ হয়ে গিয়েছিল গোপার ওপর। কানের কাছে অমন ঘ্যানোর-ঘ্যানোর করলে যে-কোনও মানুষের মাথায় খুন চেপে যায়। তার ওপর হাতে টাকা নেই ক'দিন ধরে। দু'মাস বাড়ি-ভাড়া দিতে পারেনি। তখন সত্যিই আর জ্ঞান ছিল না। মা'র রাবড়ি জোগাতে হবে, আফিমও জোগাতে হবে, সুসী তো একটা পয়সা উপুড়-হাত করবে না। পুরুষ-মানুষ হয়ে জন্মেছে বলে যেন অরবিন্দই যত দোষ করেছে। তার ওপর শিরীষবাবু একটু আগে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে চলে গেছে।

মাথায় খুন চেপে গেলে যে মানুষ কতদূর নীচ হতে পারে অরবিন্দই সেদিন তার প্রমাণ দিয়েছিল। সত্যিই সেদিন গোপাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল সে।

বলেছিল—যত বলি একটু ঘুমোবো, তা ঘুমোতে দেবে না, কানের কাছে তখন থেকে ঘ্যানোর ঘ্যানোর করছে—যাও, বেরিয়ে যাও—

আহা ! বেচারি সেই অন্ধকার গলির মধ্যে দাঁড়িয়েই চাপা গলায় কেঁদেছিল। গলা ছেড়ে ভালো করেও কাঁদতে পারেনি।

আর অরবিন্দ গোপাকে রাস্তায় বার করে দিয়ে নিজে চোখ-কান-নাক-বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হাজার হোক, অরবিন্দও তো মানুষ। তার সেদিন রাত্রে ঘুম আসেনি। অনেকক্ষণ ঘুমোবার চেষ্টা করেও যখন ঘুম এল না তখন কী-জানি-কী-মনে-করে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখে গোপা নেই।

শিরীষবাবু গল্প শুনছিল। বললে—সে কী ? নেই ? কোথায় গেল ?

অরবিন্দ বললে—তা জানি না স্যার, হারান নস্কর লেনের ভেতরটা সব দেখে এলুম, কোথাও পেলুম না তাকে—

—তারপর ? শেষ পর্যন্ত কোথায় পেলেন ?

অরবিন্দ বললে—পরের দিন সকাল বেলা এল। পাশের বাড়ির লালচাঁদ-বাবুর স্ত্রীর কাছে রাত্তিরে শুয়েছিল।

—তা তারা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি ?

অরবিন্দ বললে—তারা জানে আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে ও-রকম ঝগড়া হয় মাঝে-মাঝে—

শিরীষবাবু সবটুকু মন দিয়ে শুনলেন। তারপর পকেটে যে-ক'টা টাকা

তখন ছিল সব বার করলেন। একটা দুটো করে করে দশখানা দশটাকার নোট বার করে অরবিন্দকে দিলেন। বললেন—এই ক'টা রাখুন, পরিবারের সঙ্গে কি ঝগড়া করতে আছে? পরিবার হলো লক্ষ্মী—যান, এই জন্যেই আপনাকে ডেকেছিলুম—

একসঙ্গে এতগুলো টাকা পেয়ে অরবিন্দ যেন অভিভূত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি টেবিলের তলায় মাথা ঢুকিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলে।

—আহা হা করেন কী, করেন কী—বলে শিরীষবাবু পা টেনে নিলেন। কিন্তু অরবিন্দ ছাড়লে না।

বললে—তা হোক স্যার, আমাকে আপনি মনে রাখবেন—

শিরীষবাবু বললেন—মনে তো রাখবো, কিন্তু আপনার স্ত্রীকে একটু-একটু মাংস খেতে দেবেন, ঘি খেতে দেবেন, দুধ খেতে দেবেন। টাকাটা সেই জন্যেই দিলাম—

অরবিন্দ বললে—কিন্তু জিনিসপত্তোরের যা দাম বাড়ছে তাতে চাল-ডাল কিনতেই সব ফুরিয়ে যায় স্যার, বাড়তি টাকা থাকে না আর—

—আপনার বোনও তো কলেজে পড়ে? তারও তো খরচ আছে?

—হ্যাঁ, সে খরচও আমাকে যোগাতে হয়। আমি অত টাকা কোত্থেকে পাই বলুন তো?

শিরীষবাবু হঠাৎ বললেন—কিন্তু তার নিজেরও তো রোজগার আছে—

অরবিন্দ কী বলবে বুঝতে পারলে না। থমকে রইল এক মিনিট। তারপর বললে—আপনি যদি আর একবার আমাদের বাড়িতে আসেন তো খুব খুশী হই স্যার, আমার মা আপনার কথা বলছিলেন,—

—মা'র জন্যে রাবড়ি পাচ্ছেন আপনি?

—না।

—তা দিলীপ বেরা আছে কী করতে? রাবড়ি যোগাড় করে দিতে পারে না আপনার মা'র জন্যে? ওর তো দোকান রয়েছে 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'—

অরবিন্দ বললে—আপনি যদি আর একবার অনুগ্রহ করে পায়ের ধুলো দেন, তাহলেই মা খুশী হবে—

—কিন্তু রাবড়ি? রাবড়ি দেয় না কেন দিলীপ?

অরবিন্দ বললে—রাবড়ি তৈরি করা তো আজকাল বে-আইনী ব্যাপার স্যার, কী করে দেবে দিলীপদা?

—কেন, কোন্‌টা আইনী কাজ চলছে? ক'কিলো রাবড়ি চাই আপনার মা'র জন্যে বলুন না। দিলীপ না পারে আমি যোগাড় করে দেব। ছিঃ ছিঃ, এ কী কথা! বুড়ো মানুষ, চোখে দেখতে পান না। একটু আফিম খাবার নেশা আছে, রাবড়ি পাবেন না মানে? তাহলে আমরা রয়েছি কী করতে?…ঠিক

আছে, আমি একেবারে রাবড়ি নিয়ে যাবো আপনার বাড়িতে—

—কবে যাবেন, তাহলে বলুন, আমি হাজির থাকবো। সুসীকেও বাড়িতে থাকতে বলবো।

শিরীষবাবু বললেন—সে আমি আপনাকে ঠিক সময়ে আগে থেকে খবর দেব—

সেদিন বাড়িতে এসেই অরবিন্দ সোজা মা'র কাছে চলে গেছে। পায়ের শব্দ পেয়েই মা বলে উঠেছে—কে রে? খোকা এলি?

—মা, এবার তোমার রাবড়ির দুঃখ আমি ঘোচাবোই।

মা বললে—দরকার নেই বাছা আমার রাবড়ি খেয়ে, আপিমও এবার ছেড়ে দেব। চোখই যখন গেল, এখন পোড়া নেশার জন্যে তোকে আর টাকা নষ্ট করতে হবে না।

অরবিন্দ বললে—আমার টাকা নাকি যে আমি নষ্ট করবো। সেই শিরীষ-বাবু গো, শিরীষবাবুর কথা মনে আছে?

—কে শিরীষবাবু আবার?

—আরে, সেই যে আমার বন্ধু, বিরাট বড়লোক, তিনখানা গাড়ি, সেদিন তোমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে এক কিলো রাবড়ি দিয়ে গিয়েছিল? তোমার মনে নেই? সেই শিরীষবাবুই তুমি রাবড়ি খেতে পাচ্ছো না শুনে হায়-হায় করতে লাগলেন। বললেন—ছি ছি, আপনার মা নেশার রাবড়ি পাচ্ছেন না তা আমাকে বলেননি কেন আপনি? বললেন—কত রাবড়ি আপনার চাই, ক' কিলো?

মা শুনে দুঃখ করলেন—আহা রে, বেঁচে থাক বাছা—বেঁচে বর্তে থাক, আমারও মরণ নেই, আমারও মরণ হয় না···

অরবিন্দ বললে—তোমার কেবল ওই এক কথা, মরা আর মরা। কেন, আমি আছি কী করতে?

মা বললে—আমার কথা আর তোকে অত ভাবতে হবে না, আমার চশমারও দরকার নেই, রাবড়িরও দরকার নেই, তুই বরং সুসীর একটা বিয়ে দিয়ে দে বাবা, ওর বিয়েটা হয়ে গেলে আমি তবু শান্তিতে মরতে পারি—

মা কেবল নিজের কপাল চাপড়ায় আর আফসোস করে।

নিজের ঘরে গিয়ে অরবিন্দ গোপাকে জিজ্ঞেস করলে—সুসী কোথায়?

গোপা বললে—ঠাকুরঝি বেরিয়েছে—

—আবার বেরিয়েছে?

অরবিন্দর রাগ হয়ে গেল। এই সেদিন থানা থেকে খালাস করে নিয়ে এল, আর দু'দিন যেতে না যেতে আবার সেখানে গেছে? কখন গেল?

গোপা বললে—কখন গেছে তা আমাকে বলে গেছে নাকি যে আমি জানবো!

কোনও দিন সেকি আমাকে বলেছে যে আজ আমাকে জিজ্ঞেস করছো ?

—তা তোমার মেজাজ এত চড়া কেন ? অত চটছো কেন ?

গোপা বললে—আমার মেজাজেরই দোষ হয়ে গেল, আমি সারা দিন খেটে মরবো আর মেজাজ একটু চড়লেই দোষ ! কেন, তোমার বোনকে তো কিছু বলতে পারো না ? তোমাকে বিয়ে করে আমি যত দোষ করেছি, না ? আমি আর পারবো না ভাত রাঁধতে, এই তোমাকে আমি বলে রাখছি। আমি এই ভূতের সংসার দেখতে আর পারবো না। সে নাগর নিয়ে লেকের ভেতর অন্ধকারে লীলে খেলা করবে আর আমি তার জন্যে সাত-সকালে উঠে ভাত রাঁধতে বসবো, না ? আমি পারবো না অত ! এই আমি তোমাকে বলে রাখছি, আমি অত পারবো না।

অরবিন্দরও মাথায় রক্ত চড়ে উঠলো। বললে—পারবে না মানে ?

—পারবো না মানে পারবো না।

অরবিন্দ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো। বললে—হ্যাঁ, পারতে হবে।

—না, পারবো না।

—আবার !

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার বলবো পারবো না, পারবো না···

দড়াম করে একটা চড় পড়লো গিয়ে গোপার গালে ; আর গোপার মুখে একটা অস্ফুট 'মা গো' শব্দ বেরিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটা চিৎকার এল—ওরে ও খোকা, কী হলো ? কাকে বকছিসরে, কাকে কী বলছিস, খোকা ও খোকা···

অরবিন্দ তখন নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হারান নস্কর লেন পেরিয়ে সদর-রাস্তার ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে বেঁচেছে।

জুডি হবসনের আনকেল বেঙ্গল গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারির আমল থেকেই কলকাতার সমাজে ঘুণ ধরেছিল। শুধু মানুষের সমাজেই নয়, গোটা দেশটাতেই ঘুণ ধরেছিল। সেই থেকেই সুরু হয়েছিল ভেজাল। চালে ভেজাল ডালে ভেজাল থেকে সুরু করে ভেজাল একেবারে মনুষ্যত্বের মেরুদণ্ডে গিয়ে ঠেকেছিল।

সেদিন সকাল থেকেই আর সুসীকে বাড়িতে পাওয়া গেল না।

মা বললে—হ্যাঁ রে খোকা, সুসী কোথায় গেল ? এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি ?

কিন্তু না, অরবিন্দও দেখে এল বিছানা। গোপাও দেখে এল। কোথাও নেই। জিনিসপত্র সবই রয়েছে। তাহলে পালালো নাকি সে ? জামিনের

আসামী কি শেষ পর্যন্ত উধাও হয়ে গেল? তাহলে জামিনদার হয়েছে দিলীপদা, দিলীপদা কী বলবে? দিলীপদা যে নিজে থানায় গিয়ে জামিন দিয়ে তাকে খালাস করে নিয়ে এসেছে!

মা বললে—গেল কোথায় সে?

অরবিন্দর মাথা তখন বিগড়ে গেছে। আগের দিন বউকে মেরেছে। মেজাজ বিগড়ে ছিল, তার ওপর এই কাণ্ড।

সকাল হলো। উনুনে আঁচ পড়লো। অরবিন্দ নিজেই চা করে নিয়েছে নিজের। মা'কে দিয়েছে। অন্যদিন এ-সময়ে অরবিন্দ সংসারের কিছু কাজ-কর্ম করে। বউকে রেহাই দেবার জন্যে উঠোনটা ঝাঁট দেয়, চৌবাচ্চাটা ঝ্যাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে, বাসি কাপড়গুলো কাচে। নিজের জামা-কাপড়ে সাবান দেয়। তারপর সেগুলো রোদে শুকোতে দেয়। রোদে শুকোবার পর পাট-পাট করে ইস্ত্রী করতে বসে। সেই করতে করতেই এগারোটা-বারোটা বেজে যায়। তারপর বাজারের থলিটা নিয়ে সেই অত বেলায় বাজারে যায়।

অত বেলায় বাজার তখন ফাঁকা হয়ে এসেছে। কিন্তু তখন দর একটু কমে। ঝড়তি-পড়তি জিনিস একটু দর-দস্তুর করে নিতে পারলে সুবিধের দরে সওদা হয়। যারা ব্যাপারি, তাদের তখন চলে যাবার তাড়া।

আধ কিলো ঝিঙে, কি এক কিলো পটল দিয়েই থলি ভর্তি হয়ে যায়। বাজারের থলি নিয়ে গিয়ে হাজির হয় দিলীপদা'র ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে।

কিন্তু সেদিন আর কোনও কাজেই মন বসলো না।

মা বললে—কই রে খোকা, কোথায় গেলি? করছিস কী তুই?

কারো শব্দ নেই।

—ও খোকা, খোকা, বউমা অ বউমা—কোথায় গেল সব—

বলতে বলতে মা নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকার যেন আরো গাঢ় হয়ে নেমে এল বুড়ীর চোখে। সকালবেলাই সারা বাড়ি এমন করে অন্ধকার হয়ে যায় না বুড়ীর চোখে। চলতে চলতে একটা কীসে ধাক্কা লেগে আছাড় খেয়ে পড়লো।

—মা গো—

একটা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর দিয়ে সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে এল। কেউ দেখতে পেলে না, কেউ শুনতে পেলে না, কেউ প্রতিকার করতেও এলো না। একদিন সধবা থাকার সময় এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল অরবিন্দর বাবা। তখন চোখ ছিল, সামর্থ্য ছিল, তখন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ছেলেমেয়ে দু'জনকে মানুষ করেছে। নিজের হাতে রান্না, নিজের হাতে সংসার, নিজের হাতে টাকা। তারপর একদিন অরবিন্দর বাবা মারা গেছে। অরবিন্দ তখন ছোট, সুসী আরো ছোট। সেই ছোট দুটো ছেলে-মেয়ে নিয়ে

সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভেবেছিল ছেলে রয়েছে, সে-ই সব দেখবে। সে-ই আবার সংসার গড়ে তুলবে। কিন্তু কোথায় গেল কী! তখন থেকে চোখ যেতে আরম্ভ করেছে। ছেলে-মেয়ে দু'জনেই বড় হয়েছে। বিয়ে দিয়েছে অরবিন্দর। এক একটা চাকরি নিয়েছে ছেলে, আর চাকরি তার গেছে। প্রত্যেক-বার ভয় পেয়েছে মা। কিন্তু আবার কোত্থেকে একঠা চাকরি যোগাড় করে নিয়েছে। কিন্তু তারপর? একদিন আর আপিস যায়নি। কিন্তু কোত্থেকে এই সংসার চলছে তাও মা জানে না। এক এক দিন কে কোত্থেকে এসে এক হাঁড়ি রাবড়ি দিয়ে যায়। কোত্থেকে কে একদিন এসে বুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। কাউকেও চিনতে পারে না মা। কাউকেই জিজ্ঞেস করে না কোত্থেকে কেমন করে এই সংসার চলছে। কিংবা এই সংসার চলছে কিনা তা জানবার কৌতূহলও যেন ফুরিয়ে গেছে মা'র।

—দিলীপদা?

—কী রে, তুই এত সকালে?

অরবিন্দর মুখের চেহারা দেখেই দিলীপ বেরার কেমন ভয় লেগেছিল। এত সকালে তো কখনও আসে না অরবিন্দ। যখনই আসে, ধোপ-দুরস্ত দাড়ি-কামানো চেহারাখানা জ্বল-জ্বল করে।

—আজকে রেস খেলতে যাবে না দিলীপদা?

—রেস? কেন? তুই রেস খেলবি নাকি?

অরবিন্দ বললে—না, রেস খেলবো না আমি। শুধু তোমার সঙ্গে রেস খেলা দেখতে যাবো।

—তা সে এখন কী? সে তো দুপুরে।

—তা হোক, এখন থেকেই আমি বসে থাকবো, তারপর তোমার সঙ্গে মাঠে যাবো।

দিলীপদা হঠাৎ অবাক হয়ে গেল অরবিন্দর কাণ্ড দেখে। বললে—কী হয়েছে তোর বল তো? তোর বউ-এর অসুখ? মা'র বাতের ব্যথা বেড়েছে? কিছু টাকা দরকার?

অরবিন্দ বললে—না—

—তাহলে কী হয়েছে তোর, বল তো?

অরবিন্দ বললে—রেস খেলার পর তুমি তো বারে যাবে?

—যদি যাই তো তোর কী?

অরবিন্দ বললে—আমাকে আজকে একটু মদ খাওয়াবে দিলীপদা? আমার

আজকে খুব মদ খেতে ইচ্ছে করছে—

দিলীপদা সোজা হয়ে বসলো এবার। বললে—কেন, তোর কী হয়েছে বল দিকিনি?

—খুব মদ খেতে ইচ্ছে করছে দিলীপদা, আমাকে আজকে একটু মদ খাওয়াবে? টাকা থাকলে আমি নিজেই অবশ্য কিনে খেতুম। কিন্তু মদের দাম যে খুব। মদ খেয়ে আমার একেবারে বুঁদ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। এমন বুঁদ হয়ে থাকবো যেন আর কখনও নেশা না কাটে। যেন সমস্ত দিনরাত সেই নেশার ঘোরে একেবারে সব ভুলে থাকি—

দিলীপদা ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—ন্যাকামি রাখ, কী হয়েছে তোর, সত্যি করে বল তো?

অরবিন্দ বললে—সুসী পালিয়ে গেছে—

—পালিয়ে গেছে মানে? বলছিস কী তুই? আমি যে তাকে থানা থেকে জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এলুম!

—তা আমি কী করবো? তুমি ছাড়িয়ে নিয়ে এলে কেন? কেন তুমি জামিন দিলে দিলীপদা? তুমি তাকে কেন আটকে রাখতে বললে না? কেন তুমি তার ফাঁসি দিলে না? এখন কী করবে তাই বলো? আমি থানায় যাবো? আমি থানায় গিয়ে ইনসপেক্টারকে বলবো যে আমার বোন পালিয়ে গেছে? বলবো যে তার বদলে আমাকে ধরে রাখো, আমাকে জেলে পোর? আমাকে ফাঁসি দিতে বলবো?

দিলীপদা খানিকক্ষণ অরবিন্দর দিকে চেয়ে দেখলে।

তারপর বললে—তুই চা খেয়েছিস?

অরবিন্দ বললে—চা খাবো কি? ঘুম থেকে উঠেই সোজা চলে এসেছি তোমার কাছে। বউটাকেও কাল খুব মেরেছি, জানো? বেচারি আমার মুখের ওপর কথা বলেছিল। খুব মেরেছি, এমন মেরেছি যে গালে কালশিটে পড়ে গেছে।

—নে, চা খা।

সামনে চায়ের কাপ এগিয়ে দিলে দিলীপদা। অরবিন্দ গোগ্রাসে চা গিলতে লাগলো। বললে—আমি তো চা খাচ্ছি, কিন্তু গোপা যে কী খাচ্ছে তা ভগবান জানে—

—বাজারের থলি রয়েছে যে হাতে, বাজার করবি?

—ওটা অভ্যেস দিলীপদা! বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ওটা নিয়ে বেরোই—

—তাহলে, এই নে, টাকা নে, যা, ভাল আনাজ-পত্তোর কিনে নিয়ে বাড়ি যা, খেতে তো হবে, না কী? তোকে আরো বেশি টাকা দিতে পারতুম, কিন্তু শালা আমার কারবারেই যে হাত পড়েছে—যা, তুই যা—দেরি করিসনে—

—কিন্তু মদ ?

দিলীপদা ধমকে উঠলো আবার—খাওয়াবো, খাওয়াবো তোকে। আগে বাড়িতে বাজার করে নিয়ে যা তো, তারপর দেখা যাবে !

অরবিন্দ উঠলো এবার। বললে—তুমি ছিলে দিলীপদা, তাই তবু বেঁচে আছি, কিন্তু আর পারছি না। আচ্ছা দিলীপদা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি, এরকম করে আর কদ্দিন চলবে ?

—তো চাকরি-বাকরি কিছু করলি না, একটা ব্যবসা পর্যন্ত ধরলি না, তো সেটা কার দোষ ? আমার ?

অরবিন্দ বললে—তুমি সব জেনেও ও-কথা বলছো দিলীপদা ? তোমার বন্ধু শিরীষবাবু ইচ্ছে করলে একটা চাকরি করে দিতে পারতো না আমাকে ? শুধু শিরীষবাবু কেন, তোমার তো অনেক বন্ধু আছে, কেউ আমাকে চাকরি করে দিতে পারতো না ? সকলেই কি আমার বোনকে চাইবে ? আমার যদি বোন না থাকতো, তাহলে কি কেউ আমার মা'কে রাবড়ি কিনে দিত না ? আমার বোন না থাকলে কি আমি উপোস করে মরতুম ? এই যে সুসী আমাদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল, এরপর কি কেউ আমার বাড়ি আসবে না ?

তারপর একটু দম নিয়ে বললে—আর ব্যবসার কথা যে বলছো, ব্যবসা কি আমি করিনি ? ইনসিওরেন্সের দালালি করেছি, গেঞ্জির দোকান করেছি, ভদ্দর-লোকের ছেলে হলে যা যা করা সম্ভব নয় তাও করেছি, কিন্তু সবটাই কি আমার দোষ ? ব্যবসা যে চললো না সেও কি আমার দোষ দিলীপদা ? সবাই যে ধারে মাল নিয়ে শোধ দিলে না, তার জন্যেও কি আমি দায়ী ?

—তা পৃথিবীর সব লোক তো করে খাচ্ছে, তুই-ই বা কেন কিছু করতে পারছিস না ?

অরবিন্দ কথাটা শুনে খানিকক্ষণ থমকে রইল। তারপর বললে—তুমিও ওই কথা বলছো দিলীপদা ? সব লোকের কথা যে বলছো, তুমি জানো না ওই চায়ের দোকানে বসে কত লেখা-পড়া জানা বেকার ছেলে দিন-রাত শুধু চা খাচ্ছে আর বিড়ি ফুঁকছে ? তারাও কি আমার মতো নয় ? তাদের কথা কে ভাবে বল দিকিনি ?

দিলীপদা বললে—তুই কমিউনিস্টদের মতো কথা বলছিস দেখতে পাচ্ছি—

—দাদা, ওই জন্যেই তো বলছিলাম, আমাকে একদিন পেট ভরে মদ খাইয়ে দাও, এমন করে খাইয়ে দাও যাতে সব ভুলে যেতে পারি, সংসার বউ বোন মা সকলের কথা ভুলে একেবারে বেহেড্ হয়ে থাকি—

দিলীপদা এবার অরবিন্দকে ঠেলে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। বললে—যা, বাড়ি যা,—

—কিন্তু তুমি তো কিছু ভরসা দিলে না দিলীপদা ?

—কীসের ভরসা দেব আমি ?

—ওই যে বললাম, বোন চলে গেলে আমি খাবো কী ?

দিলীপদা অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন, বোন কি তোকে রোজগার করে খাওয়াতো ?

—না, তা নয়, কিন্তু আমি তো ওই বোনকে দেখিয়েই রোজগার করতুম।

দিলীপদা বললে—ও, তাহলে ওই জন্যেই তোর দুখ্যু। বোন চলে গেছে বলে নয়, বোন চলে গেলে কাকে ভাঙিয়ে রোজগার করবি, সেই জন্যে ?

অরবিন্দ বললে—তুমি তো সব জানো দিলীপদা, তোমার কাছে তো কিছু লুকোন নেই। আমার বউকে যদি ভালো দেখতে হতো তো আমার আজ ভাবনা!

—তুই যা দিকিনি, তুই যা—আর বাজে বকিসনে।

বলে জোর করে অরবিন্দকে ঠেলে বাইরে বার করে দিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দিলে দিলীপ বেরা। তারপরে আবার হিসেবের খাতা নিয়ে বসলো। হিসেবটা দিলীপ বেরা বাড়িতে বসেই করে। হিসেবের অনেক রকম কারচুপি করতে হয় তাকে। দুটো-তিনটে খাতা রাখতে হয়। ওটা নিজে না করলে হয় না। আজকাল অন্য কারোর ওপর হিসেবের ভার দেওয়া বিপদ। দিনকাল বড় খারাপ! দিলীপ বেরা নিজের মনে-মনেই একবার উচ্চারণ করলে—সত্যিই দিন-কাল বড় খারাপ।

তারপর ইন্ডিয়ার ফাইনান্স মিনিস্টার মোরারজী দেশাই সাহেব গিয়ে হাজির হলো আমেরিকার হোয়াইট-হাউসে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এর সঙ্গে পরামর্শ হলো অনেকক্ষণ!

—ক্যালকাটা ? কিন্তু পি-এল-ফোর এইট্রির কোটি-কোটি টাকা যদি ক্যাল-কাটার ওপর খরচ করা হয়, তাহলে যে ইনফ্লেশান হবে ইওর একসেলেন্সি ? বাংলাদেশে যে টাকার বন্যা বয়ে যাবে!

প্রেসিডেন্ট বললে—কিন্তু ক্যালকাটা যে বর্ডার স্টেট! পাশেই চায়না, সেখান থেকে যে সব দেশটা রেজিমেন্টেশন হয়ে যাবে। ক্যালকাটা যতদিন আন-হেলদি থাকবে, ক্যালকাটা যতদিন গরীব থাকবে, ক্যালকাটা যতদিন অসন্তুষ্ট থাকবে, ততদিন যে সে-সুযোগ নেবে চায়না!

ওদিকে হোয়াইট-হাউসে বসে এই শলা-পরামর্শ চলতে লাগলো। এ সেই আইসেনহাওয়ারের যুগের পরামর্শ। আর এদিকে বাংলায় তখন চিফ-মিনিস্টার ডাক্তার বি সি রায়। কেউ জানলো না, কোথায় কোন্ ফাইল খোলা হলো ক্যালকাটাকে কেন্দ্র করে। সাউথ-ইস্ট-এশিয়ার ফাঁক ভরাট করার জন্যে কী প্ল্যান

তৈরি হলো কোন্ চক্রান্তে। কলকাতায় তখন অরবিন্দরা এক কিলো মাংস কেনবার জন্যে দিলীপদাদের দরজায় ধর্না দিতে লাগলো। সুসীরা কল-গার্ল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো বেণুদির আস্তানায়। শিরীষবাবুরা গোস্বামীদের দিয়ে 'কিপলেক্স' প্লাসের 'ইমপোর্ট লাইসেন্স'-এর তদবির করতে লাগলো। আর জুডি আর ক্লারা হবসন এখানে এসে ইন্ডিপেনডেন্ট ইন্ডিয়ার ছবি দেখতে লাগলো স্ট্র্যান্ড হোটেলের আর্কেডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, আর সে ছবি আমেরিকায় তৈরি ক্যামেরা দিয়ে তুলে নিতে লাগলো চড়া দামে ইয়োরোপের কাগজে বিক্রি করবে বলে। আর বুধবারিরা আসতে লাগলো পাঁঠা কাঁধে করে কালিঘাটের মন্দিরে পুজো দিতে।

—জায়, কালী মাঈকী জায়।

আর তখন নর্থ আর সাউথ থেকে মিছিল আসতে লাগলো রাজভবন লক্ষ্য করে। তারা চিৎকার করতে লাগলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

তারা একসঙ্গে শ্লোগান দিতে লাগলো—

মজুতদারের শাস্তি চাই
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও।
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

প্রোসেসানের চাপে রাস্তার ট্রাম-বাস আটকে গেছে। সামনে যাবার পথ বন্ধ। রাস্তা জুড়ে নর্থের দিক থেকে প্রোসেসান আসছে। এক মাইল লম্বা গাড়ির সার। রিক্শা বাস ট্রাম সাইকেল সমস্ত কিছু।

—দু'দিন ট্রামে চড়ে নিন মশাই, এরপর ট্রাম-বাস কিচ্ছু চলবে না, তখন বুঝবেন ঠ্যালা।

ট্রামের আর বাসের লোকজন যেন ট্রামে-বাসে চড়ে মহা অপরাধ করেছে, এমনিভাবে চেয়ে দেখতে লাগলো মিছিলের মানুষের দিকে। ওরাই শরীর পাত করে যেন দেশ-উদ্ধার করতে নেমেছে, আর আমরা ট্রামে চড়ে আরাম করে যেন দেশদ্রোহিতা করছি।

—নেমে আসুন মশাই, আমাদের সঙ্গে হেঁটে চলুন, দেশ আমাদের একলার নয়। এ আপনাদেরও মাতৃভূমি।

আবার উপদেশও ছড়ায়! যারা হাঁটে, গাড়ি-চড়া লোকদের দিকে চেয়ে চেয়ে তারা উপদেশামৃত বর্ষণ করে।

ট্রামে এক বুড়ো ভদ্রলোক পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলেন—কীসের প্রোসেসান মশাই?

—আর কীসের মশাই, লাল-ঝান্ডাদের। ওদের জ্বালায় কাজ-কর্ম কি আর কিছু করা যাবে?

ওদিক থেকে কে একজন বলে উঠলো—মশাই, দেখবেন যদি কোনওদিন দেশের মুক্তি হয় তো ওদের দ্বারাই মুক্তি হবে। আপনার-আমার দ্বারা হবে না—

আলোচনাটা অন্য দিকে মোড় ঘুরছে দেখে এদিককার লোকরা চুপ করে গেল। বেশি তর্ক করলেই ট্রামের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি গালাগালি সুরু হয়ে যাবে। নিরঞ্জনের এতক্ষণ এসব খেয়াল ছিল না। গোবরডাঙ্গা থেকে শ্যাম-বাজারে নেমে ট্রামটা ধরেছিল। ট্রামে উঠেই নোটখাতাগুলো খুলে বসেছিল। পহ্লবদের আমলের কয়েকটা ভাষার নমুনা যোগাড় করেছিল পুরোনো পুঁথি থেকে। একবার যদি প্রমাণ করা যায় যে, ওগুলো বাংলা বিভক্তি-সন্ধি আর ধাতুরূপের সঙ্গে মেলে, তাহলেই কার্যসিদ্ধি। জীবনে অনেকদিন ধরে নিরঞ্জন পন্ডিতসমাজে খাতির পাবার জন্যে চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু করে গোবর-ডাঙ্গা কলেজে চাকরি, কে জানবে তাকে? একটা ডক্টরেট পর্যন্ত পেলে না এতদিনে।

হঠাৎ খেয়াল হলো যে ট্রামটা চলছে না। মাথা তুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে।

—কী হয়েছে মশাই ওদিকে?

কে আর তখন উত্তর দেবে তার কথার! সবাই তখন ওই একই প্রশ্নের আঘাতে বিব্রত। নিরঞ্জন ভালো করে চেয়ে দেখলে সামনে প্রোসেসান চলছে। বুঝতে পারলে ট্রাম চলতে দেরি হবে। হঠাৎ বলা-নেই কওয়া নেই সেখানেই নিরঞ্জন নেমে পড়লো। তারপর কাঁধের চাদরটা সামলে নিয়ে একটা গলির ভেতরে ঢুকে পড়লো। রাস্তাটা জানা ছিল নিরঞ্জনের। অনেকদিন আসতে হয়েছে এ-রাস্তায়।

তারপর একটা বাড়ির সামনে এসে সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।

—পঞ্চাননবাবু বাড়ি আছেন?

পঞ্চাননবাবু সাধারণত সমস্ত দিন বাড়িতেই থাকেন। প্রায় আশী বছর বয়েস বৃদ্ধের। পূর্বপুরুষরা বরাবর আফগানিস্তানে কাটিয়েছে চাকরি-সূত্রে। ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট যখন আফ্রিদিদের সঙ্গে মারামারি করেছে, তখন তাঁর আদি-পুরুষ সেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ক্যানটনমেন্টে চাকরি করতো। তারপর ছেলে-নাতি সবাই সেই অফিসেই চাকরি করেছে। কেউ ছোট চাকরি, কেউ আবার বড়। পঞ্চাননবাবু নিজেও সেখানে বিয়াল্লিশ বছর চাকরি করে রিটায়ার করেছেন। সেখানে থাকার সময়ই আফ্রিদিদের একটা মসজিদের ভেতর এই পান্ডুলিপিটা পান। আসবার সময় সেটা সঙ্গে করে এনেছেন। খবরটা এক বন্ধুর কাছেই পেয়েছিল নিরঞ্জন। তারপর থেকেই নিরঞ্জনের মাথায় ঢুকেছে যে ওটা আদি বাংলাভাষা!

ছোট একটা ছেলে নিরঞ্জনকে নিয়ে একেবারে ভেতরে দাদুর কাছে নিয়ে গেল।

পঞ্চাননবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী ঠিক করলেন মশাই ?

নিরঞ্জন বললে—দেখুন, এখনও টাকাটা যোগাড় করতে পারিনি, আমি ওটা কিনবোই, ঠিক করেছি—

পঞ্চাননবাবু বললেন—কিন্তু আর বেশি দেরি করবেন না—আরো দু'একজন খদ্দের আছে কিনা—

—কিন্তু আপনি আমাকে কথা দিয়ে রেখেছেন পঞ্চাননবাবু, আপনার কথার ভরসাতেই আমি টাকার যোগাড় দেখছি—

পঞ্চাননবাবু বৃদ্ধ মানুষ। ভোগের বয়েস তাঁর পেরিয়ে গেছে। তবু ভোগের বোধহয় কোনও বাঁধাধরা কাল-অকাল নেই। বললেন—আমি আর ক'দিন আছি মশাই, আমি মারা গেলেই তো নাতি-নাতনীরা এটা নষ্ট করে ফেলবে, তাই যাবার আগে সব বিলি-ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে চাই—তা সামান্য পাঁচশো টাকাও আপনি যোগাড় করতে পারছেন না ?

নিরঞ্জন বললে—পারলে তো আর আপনাকে বলতে হতো না, নিয়েই যেতাম। চেষ্টা করছি যাতে বেশি দেরি না হয়—

—তা পাঁচশোটা মাত্র টাকা, তাও যোগাড় করতে পারছেন না ? আজকাল তো শুনতে পাই মাস্টারদের অবস্থাই সবচেয়ে ভাল ?

নিরঞ্জন বললে—কে বললে আপনাকে ?

—বলবে আবার কে ? সবাই তো জানে। আমার নাতিরই তো দু'জন মাস্টার, দু'জনে মাসে দুশো টাকা মাইনে নেয়। টিউশানি করলে তো মাসে ছ'টা টিউশানি করা যায় !

—আপনি যে কী বলেন পঞ্চাননবাবু, ছ'টা টিউশানি কখনও করা যায় মাসে ?

—কেন ? করা যাবে না কেন ?

নিরঞ্জন বললে—রাত্রে তো মাত্র তিন ঘণ্টা টাইম, সাতটা থেকে ন'টা, সপ্তাহে দু'দিন পড়ালেও মাসে তিনটে টিউশানির বেশি তো করা যায় না—

—সে কি মশাই ? সবদিন যে পড়াতে হবে, তার কী মানে আছে ? না পড়ালেই হলো ! অ্যাবসেন্ট হলেই হলো ! এই তো আমার নাতির মাস্টাররা, তারা তো মাসে পাঁচ-ছ'দিন আসেই না। তারপর নোট ? আপনি নোটবই লেখেন না ?

নিরঞ্জন অপমানগুলো সব সহ্য করছিল মুখ বুঁজে। সহ্য করা ছাড়া গতি নেই।

বললে—না—

—নোটবই যদি না লেখেন তো 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' লেখেননি ?

নিরঞ্জন বললে—না।

—সে কী মশাই, আপনি তো মাস্টারি-লাইনের কলঙ্ক মশাই, বাংলা সাহিত্যের মাস্টারি করছেন আর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' লেখেননি? কেন, লেখেননি কেন? কে আপনাকে লিখতে বারণ করেছে?

—না, কেউই বারণ করেনি, এমনিই লিখিনি।

পঞ্চাননবাবু বললেন—লিখলেই পারতেন, সবাই-ই লিখছে আর আপনিই বা কেন বাকি রইলেন। সাপ ব্যাং আপনারা যা লিখবেন তা তো আমাদের নাতি-নাতনীদের কিনতেই হতো! আর আপনারও পকেটে দুটো ফালতু টাকা আসতো। তাহলে আর পাঁচশো টাকার জন্যে আপনাকে হা-পিত্যেশ করতে হতো না—

নিরঞ্জন সেই কোন্ সকালে দু'টি ঝোল-ভাত খেয়ে কলেজে গিয়েছে, আর এখন ফিরছে। অত কথা বলার ধৈর্য ছিল না। শুধু বললে—আমি চেষ্টা করছি টাকাটার জন্যে, দেখি, আর দু'একদিনের মধ্যে যোগাড় করতে পারবো বোধহয়। আপনি আর কিছুদিন ধরে রাখুন—

বলে আর বসলো না। চাদরটা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সোজা আবার রাস্তায় নেমে এল। বাইরে তখনও মিছিলের জের চলছে। ট্রাম-বাসগুলো আস্তে-আস্তে চলেছে। নিরঞ্জন একবার ভাবলে বাসে উঠবে। কিন্তু উঠবেই বা কী করে? সবাই ঝুলছে হ্যান্ডেল ধরে। তার চেয়ে বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে যাওয়াই ভালো। হাতে ব্যাগ কাঁধে চাদর নিয়ে উঠতে চেষ্টা করাও বিপজ্জনক।

নিরঞ্জন একবার মিছিলের লোকগুলোর দিকে চেয়ে দেখলে। লাল-লাল ফেস্টুন কাঁধে করে নিয়ে চলেছে সবাই। হৈ-হৈ করতে করতে চলেছে—

মজুতদারের শাস্তি চাই।
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও।
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

অথচ কেন যে ওরা অমন করে চেঁচাচ্ছে কে জানে! নিরঞ্জন ভয়ে ভয়ে রাস্তার একধারে সরে এল। ধাক্কা দিতে পারে। সরে আসাই ভাল। এমন চেঁচামেচি না করে এরা যদি একটু লেখাপড়া করে তো এগজামিনে ভাল নম্বর পায়। দরকার নেই ও-সব কথা বলে। শুনতে পেলে হয়তো সবাই মিলে নিরঞ্জনকে তেড়ে মারতে আসবে।

বিডন স্ট্রীটের কাছে আসতেই নিরঞ্জন বাঁ দিকে মোড় ঘুরলো। এবার নিরিবিলি রাস্তা। আর খানিকটা গেলেই হরিতকী বাগান লেন। পাঁচশো টাকা। অনেকদিন আগে সুরমা একজোড়া সোনার বালা গড়িয়েছিল। সে দুটো যদি দিত

সুরমা তো পাঁচশো টাকায় বাঁধা রেখে জিনিসটা নিতে পারা যেত। কিন্তু সুরমা তো ওর কদর বুঝবে না। আর কে-ই বা কদর বুঝবে? লেখাপড়ার কদর বোঝবার মতো লোকই বা কলকাতায় ক'জন আছে! পঞ্চাননবাবু বলে কি-না নোটবই লিখতে! বলে কি-না 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' লিখতে! কী যে বলে পঞ্চাননবাবু! এখন বুঝছে না কেউ। কিন্তু একদিন বুঝবে সবাই। সেদিন সবাই জিজ্ঞেস করবে—কে নিরঞ্জন হালদার? এতদিন নিঃশব্দে বসে বসে রিসার্চ করেছে অথচ আমরা তো কই জানতে পারিনি!

এমনিই হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ও'দের বেলাতেও তাই ঘটেছে। যখন লোকে টের পেয়েছে তখন হৈ-চৈ করেছে তাঁদের নিয়ে।

বাড়ির সামনে এসে আস্তে আস্তে কড়া নাড়তে লাগলো।

অন্য দিন কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে সুরমার গলার আওয়াজ আসে—যাচ্ছি—

তারপরেই দরজা খুলে দেয় সুরমা। বলে—এত দেরি হলো যে?

আবার কড়া নাড়তে লাগলো।

তবু কোনও উত্তর নেই।

কী হলো? অন্যদিন তো এমন হয় না? ঘুমিয়ে পড়লো নাকি ও?

আবার কড়া নাড়তে লাগলো নিরঞ্জন।

তবু কোনও সাড়া-শব্দ নেই। নিরঞ্জন ঘুরে বাড়িওয়ালার দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো। সুরমার মাসিমা বললে—ওমা, তুমি? সুরমা তো এখনও আসেনি! তুমি দাঁড়াও বাবা, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি—

মাসিমা আবার ওদিক দিয়ে দরজা খুলে দিয়ে গেল।

নিরঞ্জন বললে—কোথায় গেল সুরমা?

—তা তো জানি না, আমাকে বলে গেল কোথায় এক আত্মীয় আছে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে—সন্ধ্যের আগেই আসবে।

—কে আত্মীয়? কোথায় থাকে সে আত্মীয়? সুরমার আত্মীয় তো কেউ কোথাও আছে জানি না?

—কী জানি বাবা, তা তো আমি বলতে পারি নে। দেখলুম সেজেগুজে বেরোল।

—কার সঙ্গে বেরোল? একলা?

—হ্যাঁ, একলাই তো গেল মনে হলো!

একলা বেরোবে সুরমা! নিরঞ্জন বাড়িতে ঢুকেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু ঠিক করতে পারলে না। যে লোক এই ঘরখানার বাইরে কোথাও যায়নি, সে একলা-একলা সেজেগুজে রাস্তায় বেরোবে?

নিরঞ্জন সেই অবস্থাতেই তক্তপোশটার ওপর বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

ঌ ঌ ঌ

তারপর এল সেই দিন। ওয়াশিংটনের হোয়াইট-হাউসে এসে বসলো জন কেনেডি। কাগজপত্র-ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ নজরে পড়লো একখানা ফাইলের ওপর। পি এল ৪৮০। আফ্রিকা আর সাউথ-ইস্ট এশিয়ার সব জায়গায় চায়না আস্তে আস্তে তখন হাত বাড়াচ্ছে। কিন্তু ক্যালকাটা? ক্যালকাটা তো এখনও কম্যুনিজম-এর হট-বেড হয়ে রয়েছে। ডিপ্লোমেটিক চিঠি গেল দিল্লির এমব্যাসির কাছে। ক্যালকাটার কী অবস্থা লিখে পাঠাও।

ওদিক থেকে রিপোর্ট এল—মিঃ প্রেসিডেন্ট, ক্যালকাটার কোনও উন্নতি হয়নি। ক্যালকাটার মিউনিসিপ্যালিটি সেই যে কোন্ মান্ধাতার আমলে জলের কল বানিয়েছিল সে এখনও সেই রকমই আছে। আগে যেখানে পাঁচ লক্ষ লোক ছিল এখন সেখানে ষাট লক্ষ লোক হয়েছে। কিন্তু জল বাড়েনি, রাস্তা বড় হয়নি। হাজার হাজার লোক এখনও রাস্তার ফুটপাতে শুয়ে থাকে। স্কুলে কলেজে ছেলেদের বসবার জায়গা নেই। নতুন জেনারেশনের ছেলেরা শুধু হরতাল, হল্লা আর স্ট্রাইক করতে জানে। মেয়েরা কল-গার্লের পেশা পছন্দ করে, কিংবা থিয়েটারের দলে নাম লেখায়। ফুড-শর্টেজ, অস্বাস্থ্য, ধোঁয়া, বাসের ভিড়, সব মিলে অরাজক অবস্থা চলছে এখানে; প্রত্যেক কাজের জন্যে এখানে ইনফ্লুয়েন্স, প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যে এখানে ঘুষ। ইনফ্লুয়েন্স না করতে পারলে কিংবা ঘুষ না দিলে এখানে কোনও কার্যোদ্ধার হবার আশা নাস্তি। রোজ এখানে স্ট্রাইক চলছে, রোজ এখানে হরতাল, রোজ এখানে অ্যাকসিডেন্ট। এখানকার সব অফিস বোম্বাইতে চলে যাচ্ছে—

ফাইলে সবই লেখা ছিল। ইন্ডিয়ার ফাইনান্স মিনিস্টারের নোটও ছিল তাতে।

কেনেডি সাহেব আবার চিঠি লিখলেন ইন্ডিয়া গভর্মেন্টকে। ক্যালকাটার উন্নতি করতেই হবে। তাতে ইনফ্লেশন হোক আর যাই হোক।

কলকাতা থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের চীফ মিনিস্টার ডাঃ বি সি রায় ফাইলখানা বগল-দাবা করে ছুটলেন আমেরিকায়।

আর সেইদিনই ইন্ডিয়া গভর্মেন্টের ইন্টারন্যাশন্যাল ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মিনিস্ট্রির কলকাতা অফিস থেকে এক সুট-পরা স্মার্ট ছোকরা এসে হাজির হলো শিরীষবাবুর অফিসে। আগে থেকেই ভূধরবাবু টেলিফোনে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাই কোনও আয়োজনেরই ত্রুটি ছিল না কোথাও।

শিরীষবাবু নমস্কার করলেন। আসুন স্যার, আসুন—আপনার নামই তো মিস্টার এস-কে-বাগচী ?

এস-কে-বাগচী নতুন জেনারেশনের বাঙালী। বেশি কথা বলে না। যাতে বেশি কথা না বলতে হয় তার জন্যেই সিগারেট খায় ঘন-ঘন।

বললে—আপনার ফ্যাক্টরিটা দেখবো একবার, দেখে আমাকে ইনসপেকশান রিপোর্ট দিতে হবে—

সেটা অফিস, আর ফ্যাক্টরিটা কলকাতার বাইরে।

শিরীষবাবু বললেন—নিশ্চয়ই দেখবেন, কিন্তু তার আগে চা না কফি কী খাবেন তাই বলুন ?

—না না, আমি কিছুই খাবো না। আমি খেয়েই এসেছি—

শিরীষবাবু হেসে বললে—তা কি হয় স্যার, আপনি হলেন অতিথি, আপনাকে কি না-খাইয়ে ছাড়তে পারি ?

এস-কে-বাগচী হেসে বললে—না না, ও-সব ফর্ম্যালিটি থাক, আগে কাজ—

তা তাই ঠিক হলো। গোস্বামী তৈরিই ছিল। গোস্বামী সেজে-গুজে হাজির। শিরীষবাবু বললেন—আমার এই লোককে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি, এ আপনাকে আমার ফ্যাক্টরি দেখিয়ে দেবে—গাড়িও আপনার জন্যে রেডি রেখেছি—

এস-কে-বাগচি গাড়িতে উঠলো গিয়ে। উঠে পেছনের বিরাট সীটটায় বসলো। গোস্বামী বসলো সামনে ড্রাইভারের পাশে।

পেছন ফিরে বললে—স্যার, যদি অনুমতি দেন তো একটা সিগ্রেট খেতে পারি ?

সিগারেট ধরালো গোস্বামী। তারপর আর কথা নয়। একেবারে সোজা ফ্যাক্টরি। শিরীষবাবুর 'ইন্টারন্যাশন্যাল গ্লাস ফ্যাক্টরি'। এমন কিছু একটা ফ্যাক্টরি নয় যে দেখতে হাতি-ঘোড়া সময় লাগবে। বাইরে থেকে দেখেই এস-কে-বাগচী বুঝেছিল। ভেতরে ঢুকলো। তখন কাজ চলছে। কাচের গ্লাস, কাচের ডাক্তারি সরঞ্জাম। তাছাড়া আছে শিশি-বোতল ইত্যাদি। আগে যখন বাজার ছিল বড়, বোম্বাই মাদ্রাজে দিল্লিতে মাল যেত, তখন প্রোডাকশান ছিল বেশি, স্টাফ ছিল বেশি। আয়ও তাই বেশি হতো।

এস-কে-বাগচী চুপ করে সব দেখলে। একটাও কথা বললে না। ঘুরে ঘুরে শুধু একটার পর একটা সিগারেট খেতে লাগলো। তারপর বললে, চলুন এবার—

গোস্বামী বললে—আর কিছু দেখবেন না স্যার ?

—না।

গাড়ি যখন ফিরে এল, তখন শিরীষবাবুর অফিসে এস-কে-বাগচীর খাতিরের জন্যে সন্দেশ-রসগোল্লা পান্তুয়া-রাবড়ি সব থরে থরে সাজানো।

—কেমন দেখলেন আমার ফ্যাক্টরি, এবার বলুন !

—এসব কী যোগাড় করেছেন ?

এস-কে-বাগচী এমনভাবে মিষ্টিগুলোর দিকে দেখলে যেন সে হীরে মুক্তো কি পান্না দেখছে।

শিরীষবাবু বললেন—এ কিছু না, সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা, অতি সামান্য—

—কিন্তু এসব পেলেন কোথায় ? এসব তো আজকাল দুর্লভ জিনিস মশাই!

শিরীষবাবু হাসলেন। বললেন—না না, এমন আর কী দুর্লভ বস্তু, কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি আপনার জন্যে।

এস-কে-বাগচী সিগারেট ধরালো একটা। বললে—মিষ্টি আমার চলবে না—

শিরীষবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—কিন্তু এ তো চিনির ডেলা নয়। ছানার মিষ্টি—

—তা হোক, কুকুরের পেটে কি ঘি সহ্য হয়— ? আমরা হলুম সেই কুকুর!

—তা হলে তো বড় মুশকিল হলো, আপনাকে কিছু খাতির করতে পারলাম না—

—তাতে কী হয়েছে ? অন্য কোনওদিন খাতির করবেন। রিপোর্ট তো আমি এখনই পাঠাচ্ছি না। সে পাঠাতে আরো দিন পনেরো লাগবে।

শিরীষবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী রকম দেখলেন আমার ফ্যাক্টরি ?

এস-কে-বাগচী বললে—সত্যিকথা বলতে কি, আপনার ফ্যাক্টরি আসলে ফ্যাক্টরি ই নয়—

শিরীষবাবুর মুখটা চকিতে একটু কালো হয়ে এল। কিন্তু তখুনি সামলে নিয়ে বললেন—তাহলে কী হবে ?

—দেখি কী করতে পারি—বলে এস-কে-বাগচী উঠে চলতে লাগলো বাইরের রাস্তার দিকে। বাইরে গোস্বামী দাঁড়িয়ে ছিল। শিরীষবাবু তাকে চোখ টিপে দিলেন। গোস্বামী এস-কে-বাগচীকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলে। বললে—কোন্ দিকে যাবেন স্যার আপনি ?

এস-কে-বাগচী বললে—ভবানীপুর—

তা ভবানীপুরের দিকেই গাড়ি চললো। খানিক চলার পর গোস্বামী সামনের সীট থেকে পেছনের দিকে চেয়ে বললে—স্যার, যদি অনুমতি করেন তো একটা সিগারেট খেতে পারি ?

—তা খান না, আমাকে বার-বার জিজ্ঞেস করার কী দরকার!

গোস্বামী পেছন ফিরেই দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালে। বললে—ছি, স্যার, আপনি আর আমি ? কী যে বলেন ?

ভবানীপুরের পূর্ণ থিয়েটারের পাশের একটা রাস্তায় গাড়ি ঢুকলো। একটা

বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই গোস্বামী নেমে দরজা খুলে দাঁড়ালো। এস-কে-বাগচী দোতলার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওই আমার ফ্ল্যাট—

এস-কে-বাগচী বাড়ির ভেতরে চলে যাচ্ছিল। গোস্বামী বললে—স্যার, কিছু আদেশ করলেন না—

এস-কে-বাগচী এক সেকেণ্ড ভাবলে। তারপরে বললে—আচ্ছা, আপনি আসছে শনিবার আসুন—

—আসছে শনিবার কখন কোথায় ক'টার সময় ?

—হোটেলে আসতে পারবেন ?

গোস্বামী বললে—আদেশ করলেই আসতে পারবো। বলুন কোন্ হোটেলে ?

—গ্রীন গ্রোভে, সন্ধ্যে সাতটার সময়।

—ঠিক আছে স্যার, নমস্কার !

বলে গোস্বামী আবার গাড়িতে এসে উঠলো। তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার সদর রাস্তায় পড়তেই গোস্বামী আর একটা সিগারেট ধরালো। লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো রাস্তার দিকে মুখ করে। তারপর ড্রাইভারকে বললে —চলো, অফিস চলো—

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই বেণুদিকে করপোরেশনের কাজে এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরতে হয়। সকালবেলাটা বাড়ি-বাড়ি টিকে দিয়ে-দিয়ে বেড়াতে হয়। একেবারে ঢুকতে হয় গিয়ে গেরস্থ-বাড়ির অন্দরমহলে। ঘন্টা-দুয়েকের কাজ। কিন্তু তার মধ্যেই মা, দিদি, বোন, মেয়ে সম্পর্ক সকলের সঙ্গে। সকলের সঙ্গেই তাই একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর একবার যখন মেয়েরা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন একেবারে হাঁড়ির খবর ফাঁস করতে তাদের দেরি হয় না।

কোন্ বাড়িতে কে কী দিয়ে ভাত খায়, কোন্ বাড়ির বৌ পোয়াতি হলো, সে-খবরও শুনতে হয়। শুনতে শুনতে বেণুদি মুখে দুটো আহা-উহু করে। তখন টিকে দেওয়াটা হয়ে যায় উপলক্ষ। বেণুদি কারো বাড়িতে ঢুকলেই সবাই হাঁড়ি-কড়া রেখে ছুটে আসে।

এমনি করেই একদিন হারান নস্কর লেনের সুসীকে এ-লাইনে নিয়ে এসেছিল বেণুদি—

সেদিন অত ভোরে সুসীকে দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল বেণুদি। সাধারণত খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বেলা পড়লে তবে সব মেয়েরা আসে। কাউকে-কাউকে বা দরকার হলে খবর দিলেই এসে হাজির হয়।

—আমি এলুম বেণুদি।

—ওমা, তোর এ কী চেহারা হয়েছে মা ?

কাঁদতে লাগলো সুসী। আঁচল দিয়ে বেণুদি তার মুখ মুছিয়ে দিলে। বললে—কাঁদিসনে বাছা, সকালবেলা কাঁদলে অকল্যেণ হয়।

—কিন্তু তুমি কাল কার সঙ্গে আমায় জুটিয়ে দিয়েছিলে বেণুদি! একেবারে জোচ্চোরের একশেষ! তার জন্যে আমায় থানায় যেতে হলো! আমাকে রাত এগারোটা পর্যন্ত হাজতে থাকতে হলো।

—সে কী রে ? সেই পাঞ্জাবী ছেলেটা!

—হ্যাঁ, সেই সন্তোখ অরোরা। এদিকে কী মিষ্টি কথা বেণুদি। আমাকে জমি দেখালে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর ওপর পাঁচ কাঠা জমি দেখিয়ে ভুলিয়ে দিলে। বললে—আমার নামে ডীড লিখে দেবে, একটা পয়সা দাম নেবে না। আমিও গলে গেলাম। সিনেমা থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে গেলাম লেকের ধারে। অন্ধকার গাড়ির ভেতরে বসে আমাকে চুমু খেলে—

—কেন, তুই আপত্তি করলি না ?

সুসী কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমার তখন মরণ দশা হয়েছিল বেণুদি, আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, আমি জমির লোভে···

—তারপর!

—তারপর একেবারে থানায়। পুলিশ এসে আমাকে থানায় নিয়ে আটকে রেখে দিলে!

—কী সর্বনাশ!—তারপরে কী করে ছাড়া পেলি তুই ?

সুসী বললে—জামিনে!

—কে জামিন হলো ?

—আমার দাদার এক বন্ধু। আমাদের পাড়ার 'ভদ্রকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'র দিলীপ বেরা। লোকটাকে আমি দেখতে পারি না, তবু তাকেই কাল আমার পোড়া মুখ দেখাতে হলো—

বলে সুসী হাউ-হাউ করে সেইখানে বসেই কাঁদতে লাগলো।

বেণুদি বললে—ঠিক আছে, আমি ওই পাঞ্জাবী বেটাকে দেখাচ্ছি, আবার আমার কাছে আসতে হবে না ? তা সে যাক গে। তুই থাক এখানে, আমি একটু কাজ সেরে আসবো—

সুসী বললে—তোমার এখানে ছাড়া আমার আর কোনও যাবার জায়গা নেই বেণুদি—

—তা ভালোই তো, থাক না তুই! আমি কি তোকে থাকতে বারণ করছি ?

—কিন্তু আমি যে পুলিশের আসামী বেণুদি, আমাকে যে খুঁজবে তারা। আমি যে পালিয়ে এসেছি।

—তা সে-সব পরে ভাববো, আগে টিকে দিয়ে আসি, তারপর সব শুনবো।

তুই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দে—

বলে বেণুদি সেজেগুজে বেরিয়ে গেল। সুসী একলা কিছুক্ষণ বসে রইল ঘরের ভেতর। ভেতর থেকে ফ্ল্যাটের সদর দরজায় খিল দিয়ে দিয়েছে। বাইরে থেকে আর কারো আসবার উপায় নেই। এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হলো সুসী। মনে হলো এতদিনে যেন মুক্তি পেলে সে সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে, সমস্ত প্রলোভন, প্রয়োজন, প্ররোচনা থেকে। এতদিন কে যেন তাকে তাড়া করতো, পেছন থেকে অনুসরণ করতো। কে যেন বলতো—আরো টাকা চাই, আরো রূপ চাই, আরও শাড়ি, গয়না, জুতো চাই। তারপর আরো বলতো—একটা বাড়ি দাও, এক টুকরো বাগান দাও, একটা শান্তির সংসার। এমন সংসার দাও যেখানে ইচ্ছেমত খরচ করতে পারবো।

বুধবারিরাও এমনি করে কোন্ ধাবধাড়া গোবিন্দপুর থেকে মাইলের পর মাইল হাঁটতে-হাঁটতে এসেছে মন্দিরে মসজিদে আর গীর্জায়। কেবল বলেছে—আরো টাকা দাও, আরো রূপ দাও, আরো শাড়ি আরো গয়না, আরো জুতো দাও। তারপর যখন সেগুলো মিটতো তখন বলতো—একটা বাড়ি দাও ভগবান, এক টুকরো বাগান দাও, একটা শান্তির সংসার দাও। এমন সংসার দাও যেখানে খুশীমত খরচ করতে পারি।

বুধবারির মা'র তখনও কলকাতা দেখা যেন ফুরোয়নি।

সেই যে হাওড়া-ময়দানে নেমে দেখতে সুরু করেছে, সে-দেখা আর পুরোন হয় না কিছুতেই। কেবল দ্যাখে আর কেবল বলে—ইয়ে কেত্তা বড়া শহর হ্যায় বুধবারি!

বুধবারিও ধমক দেয় মাঝে মাঝে। বলে—চুপ রহো বুঢ়িয়া—

বউটা নিরীহ মানুষ। ডালহৌসী স্কোয়ারের সেই দেশোয়ালী আদমির বাড়িতে যা একটু চা খেয়ে নিয়েছে, তারপরেই আবার হাঁটা। আর তারপর শাড়ির গিঁটে বেঁধে যেখানে তাকে নিয়ে চলেছে, সেখানেই যেতে হচ্ছে। তার কোনও নিজস্ব ইচ্ছে নিজস্ব ইজ্জৎ নেই। তার মেয়ে হয়েছে, কিন্তু ছেলে তো হয়নি। ছেলে না-হওয়ার জন্যে একটা লজ্জা তার আছে। কিন্তু লজ্জার জন্যে কোনও দায়িত্ব তার থাকার কথা নয়। কালী-মাঈর যদি কিরপা হয় তো এবার তার ছেলে হবে। তাই বকরাটা নিয়ে চলেছে বুধবারি।

যদি তাকে কেউ বলে কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে সাত-দিন সাত-রাত না-খেয়ে উপোস করে কাটাতে হবে, তাও সে করবে। একটা লেড়কী দিয়েছ কালী-মাঈ, এবার একটা লেড়কা দাও। আমার আদমীর ইজ্জৎ রাখো।

কলকাতার কোনও ঈশ্বর আছে কি না কে জানে। থাকলে বোধ হয় তার কানে তালা ধরে যেত এতদিনে। সকলেরই সব কিছু চাই। কলকাতার মানুষের জন্যে খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, গৃহ চাই। সুসীর টাকা চাই, গোস্বামীর উন্নতি

চাই, অরবিন্দর সচ্ছলতা চাই, শিরীষবাবুর ইমপোর্ট লাইসেন্স চাই, দিলীপ বেরার ছানা পাওয়া চাই, বেণুদির পসার চাই, বুধবারির ছেলে চাই। চাই-চাই-এর কলরবে মুখর কলকাতার ভগবান কিন্তু দিব্যি নির্বাক হয়ে মিছিল দেখছে। নিচেয় ইনক্লাব জিন্দাবাদ আর ওপরে জুড়ি আর ক্লারা হবসন।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ !

বুধবারিদের মিছিলটা অরবিন্দদের মিছিলের একেবারে মুখোমুখি এসে পড়েছে।

বুধবারির বুড়ী মা তাজ্জব হয়ে গেছে—ও কেয়া হ্যায় রে বুধবারি ? উঁহা কেয়া হো রহা হ্যায় ?

বুধবারি আবার ধমক দিয়ে উঠলো—চুপ রহো বুঢ়িয়া, দিক্ মাত্ করো—

—লেকন হোতা হ্যায় কেয়া ?

বুধবারি বিজ্ঞের মতন বললে—উ লোক ভিখ্ মাঙ রহা হ্যায—

তবু যেন বুধবারির মা'র বিশ্বাস হলো না। ভিক্ষে করছে ? দল বেঁধে ভিক্ষে করে নাকি কেউ ?

—হাঁ হাঁ ভিখ্ মাঙ রহা হ্যায়।

—কেয়া ভিখ্ মাঙ রহা হ্যায় !

বুধবারি গম্ভীর গলায় বললে—কাম্ !

কাম ! বেকার নাকি সবাই ? হয়ত তাই হবে। সবাই কাম চায় ! জয়চণ্ডী পুরেও অনেকদিন কাম-কারবার থাকে না বুধবারির। তখন বড় কষ্ট হয় বুধবারির মা'র। খুচরো ফালতু কাজ বুধবারির। কাজ ফুরিয়ে গেলেই বুধবারি আবার কাজ খুঁজতে বেরোয়। তখন বাবু-মহাজনদের বাড়িতে যেতে হয় বুধবারিকে। দরজায় দরজায় তদবির-তাগাদা করতে হয়। এদেরও হয়ত তেমনি !

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

বুধবারি সাবধান করে দিলে—এ্যাই, এক কিনারে বরাবর চলো—

মিছিলের জায়গা রেখে দিয়ে বুধবারির দল চলতে লাগলো সোজা দক্ষিণ দিক বরাবর। আর অরবিন্দদের মিছিলটা চলতে লাগলো উত্তর দিক বরাবর !

—কালী মাঈকী জায় !

সুসীর কানেও আওয়াজটা গিয়েছিল। জানালা দিয়ে বাইরের ট্রাম-বাসের রাস্তাটা দেখা যায় না স্পষ্ট করে। কিন্তু তবু দেখবার চেষ্টা করলে।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। একবার মনে হলো, রিসিভারটা ধরবে কি না। তারপর সেটা তুলে নিয়ে বললে—হ্যালো—

—বেণুদি ?

সুসী বললে—বেণুদি বাড়িতে নেই—

—আপনি কে ?

সুসী কি উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না হঠাৎ। তারপর বুদ্ধি করে জিজ্ঞেস করলে—বেণুদিকে কিছু বলতে হবে ?

—আপনি কে বলুন ?

সুসী বললে—আপনি কে কথা বলছেন আগে বলুন !

ওপার থেকে উত্তর এল—আমি গোস্বামী। বেণুদিকে বলে দেবেন আমি গোস্বামী টেলিফোন করেছিলুম ! নিতাই এর লোক—

সুসী আস্তে আস্তে রিসিভারটা রেখে দিলে। রেখে দিয়ে যেন স্বস্তি পেলে। অন্তত পুলিশ নয় এইটুকু জেনে শান্তি পাওয়া গেল। বেণুদির কোনও স্টুডেন্ট্ ক্লায়েন্ট হবে হয়ত !

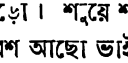

সুরমা জীবনে কখনও এত বড় গাড়িতে চড়েনি। যেমন বড় তেমনি বাহারে। গাড়ির ভেতর ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়ো। শুয়ে শুয়ে কলকাতায় ঘুরে বেড়াও।

—ঠাকুরপো, সত্যি তুমি বেশ আছো ভাই !

—কেন, বৌদি ? বেশ আছি কেন ?

—তুমি বেশ রোজ গাড়ি চড়ে বেড়াও ; কেউ তোমায় কিছু বলে না। আর আমি যদি এই রকম করে বেড়িয়ে বেড়াই তো তোমার দাদা আমায় বকে অস্থির করে দেবে ! কী চমৎকার শহর ঠাকুরপো, কত বড় বড় বাড়ি ! আর আমি সারা-দিন কী-রকম ঘরে থাকি দেখেছ তো ? আমার ঘরে বসে এসব কিচ্ছু দেখা যায় না।···আচ্ছা, ওটা কী ঠাকুরপো ?

—ওটা হলো কেল্লা ! একটু রাত্তিরবেলা যদি বেরোও তো আরো অনেক মজা দেখতে পাবে। কত ফরসা-ফরসা সাহেব-মেমসাহেব দেখতে পাবে। দাদার সঙ্গে একদিন দেখতে বেরোও না কেন ?

সুরমা বললে—তোমার দাদার জন্যে কি বেরোবার জো আছে ঠাকুরপো ! দিন-রাত কেবল বই আর খাতা,—

গোস্বামী বললে—দাদাটা বড় বেরসিক বৌদি ! অত রাত পর্যন্ত জেগে-জেগে কী পড়ে বলো তো ?

সুরমা বললে—কী জানি, কী সব ছাই-ভস্ম লেখে কেবল—

—অত লেখাপড়া করে কী হয় মিছিমিছি ! শুধু তো মাথার বোঝা বাড়ানো।

সুরমা বললে—আমি তো তাই বলি তোমার দাদাকে। বলি, তুমি কী সব ছাই-পাঁশ বই মুখে দিয়ে থাকো সারাদিন. অথচ গোস্বামী-ঠাকুরপোকে দ্যাখ তো, লেখাপড়ার ধার দিয়ে কখনও যায়নি, কিন্তু কেমন বড়-বড় গাড়ি চড়ে বেড়ায় !

—তা শুনে দাদা কী বলে ?

সুরমা বললে—বলবে আবার কী ! শুনে চুপ করে থাকে।

গোস্বামী বললে—এই যে আজকে তুমি আমার সঙ্গে এসেছ, তা দাদা জানে ? দাদাকে বলেছ ?

—না, না, শুনলে কখনও আসতে দেয় ! সে যা মানুষ ! তোমার দাদা বাড়ি আসবার আগেই আমাকে বাড়ি পেঁছে দিও কিন্তু ঠাকুরপো—

—নিশ্চয় পেঁছে দেব।

তারপর হঠাৎ একটা গলির সামনে এসেই গাড়ি থামাতে বললে ড্রাইভারকে।

—এখানে আবার কোথায় যাচ্ছো ঠাকুরপো ?

গোস্বামী বললে—তুমি একটু গাড়ির মধ্যে বোস বৌদি, এখানে আমার একটু কাজ আছে, আমি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে এক্ষুনি আসছি—

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বেশ লাগলো সুরমার। এমন করে গাড়ি চড়ে কলকাতা শহর ঘুরে বেড়ানো, এ যেন স্বপ্ন। এ যেন কল্পনার বাইরে। সুরমা চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। সবাই দেখুক তাকে। আশেপাশে যারা হেঁটে আসছে-যাচ্ছে তারা সবাই দেখুক যে সুরমা কত বড় গাড়ি চড়ে বেড়ায়।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ !

কত লোক প্রোসেশানের সঙ্গে দল বেঁধে চলেছে ! লাল-শালু দিয়ে আবার নিশেন বানিয়েছে। কত কথা লিখে দিয়েছে নিশেনের ওপর। সুরমার চোখের সামনে যেন আরব্য-উপন্যাসের খেলা চলতে লাগলো। কত বড় শহর কলকাতা। কত বড় জগৎ। তাদের হরতুকী বাগান লেনের তুলনায় এ যেন এক মহা পৃথিবী। এই পৃথিবীতে যেন একলা সুরমাই পরিক্রমা করতে বেরিয়েছে। দেখতে বেরিয়েছে তাদের বাড়ির গলিটার চেয়ে আরো কত বড় গলি আছে শহরে, সে-গলির বাড়িগুলোর ভেতরে কারা থাকে। তাদের ভাবনা-সমস্যাগুলো কী, কেমন তাদের চেহারা—

মিছিলটা আস্তে আস্তে চলে গেল উত্তর দিকে। সুরমা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগলো তাদের কথাগুলো—

মজুতদারের শাস্তি চাই।
সস্তাদরে খাদ্য চাই।
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও,
নইলে গদী ছেড়ে দাও।

এস-কে-বাগচী তখন ওপরে গোস্বামীকে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

—নমস্কার স্যার !

—কে ? কী চাই আপনার ?

—স্যার, আমি সেই গোস্বামী ! ইন্টারন্যাশনাল গ্লাস ফ্যাক্টরি দেখতে গিয়েছিলেন আপনি। মনে পড়ছে না ?

এস-কে-বাগচী কী করবে গোস্বামীকে নিয়ে, বুঝতে পারলে না। বললে—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—

তারপর বললে—আমার কাছে কিছু দরকার আছে আপনার ?

—স্যার, আপনি বলেছিলেন শনিবার আসতে !

—হ্যাঁ, শনিবার তো গ্রীন-গ্রোভে আসতে বলেছি, সন্ধ্যে সাতটার সময়।

—আজ এদিকে এসেছিলাম, তাই আর একবার জিজ্ঞেস করে গেলাম আর কি ! সঙ্গে আমার গাড়ি রয়েছে, আপনি যদি কোথাও যেতেন তো পেঁাছিয়ে দিতে পারতুম স্যার—

—গাড়ি রয়েছে ? জায়গা হবে ?

—হাঁ স্যার, কী যে বলেন আপনি, খুব জায়গা হবে, আপনার জন্যেই তো গাড়ি এনেছি—গাড়িতে কেউ নেই, চলুন না—

এস-কে বাগচীরা এসব সুবিধে নিতে অভ্যস্ত। বললে—দাঁড়ান, আমি একটু তৈরি হয়ে আসছি—বলে পাশের ঘরের ভেতরে চলে গেল। গোস্বামী বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। শিরীষবাবু তার ওপর যে কাজের ভার দিয়েছে সেটা সোজা কাজ নয়। শিরীষবাবুর এই ইমপোর্ট লাইসেন্স পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে অফিসের সমস্ত লোকের ভবিষ্যৎ। শুধু অফিসের সমস্ত লোকের নয়, শিরীষবাবুর নিজেরও ভবিষ্যৎ।

শিরীষবাবু বলতো—গোস্বামী, এই লাইসেন্সটা আমার পাওয়া চাই, নইলে শুধু ঘড়ি আর চোদ্দ-ক্যারেট সোনা বেচে আর চলবে না—উপোস করবো—

গোস্বামী জানতো, উপোস করার কথাটা শিরীষবাবুর সত্যি নয়। কিন্তু তবু একটা বাঁধা আয় হঠাৎ কমে গেলে পেটে হাত পড়ে বই কি। বিশেষ করে শিরীষবাবুর মতন লোকের পক্ষে। শিরীষবাবু খরচে লোক। এদিকে ওদিকে দান-ধ্যান আছে। দশ-বিশটা লোক মাসের পয়লা তারিখে হাত পেতে রাখে তাঁর সামনে। সে রকম লোকের উপকার হোক, এটা গোস্বামী চায়।

প্রথম প্রথম একটু ভেবেছিল গোস্বামী !

হরিতকী বাগান লেনের মানুষের চোখে গোস্বামী যেন দিন দিন স্বর্গের জগতের মানুষ হয়ে উঠছিল। তাই বাড়িতে ঢোকার পথেই জানালা থেকে সুরমা-বৌদি ডাকতো।

গোস্বামীর মনে হতো বৌদি যেন সুখী নয় ! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে স্বামী লেখা আর পড়া নিয়ে মশগুল থাকে, তার বৌ-এর সুখী হওয়া সম্ভবও

নয়। খাঁচার মধ্যে ধড়ফড় করা পাখীর মত মনে হতো সুরমাবৌদিকে। শনিবার দিন সন্ধ্যেয় পার্ক স্ট্রীটের হোটেলে এস-কে-বাগচীর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। কিন্তু দেখা কি শুধু-হাতে করবে?

ভূধরবাবু বলেছিল—না না, তাই কখনও হয়? ওরা তো দেবগুরু বৃহস্পতি নয়—ওসব যেন যোগাড় থাকে—

শিরীষবাবু বলেছিলেন—ভালো ভালো মিষ্টি এনেছিলাম মশাই বারাসত থেকে, এক টুকরো মুখে দিলে না—

—তাই কখনও মুখে দেয়? ওরা কি মিষ্টি খাবার লোক?

—তাহলে কী করা যায়? রিপোর্ট দেবার আগে একটু খাওয়ানো-দাওয়ানো তো ভালো। যাকে বলে নুন খাওয়ানো—নুন খাওয়ালেই ওরা গুণ গাইবে—

ভূধরবাবু বললে—তা গোস্বামী তো লেগে পড়ে আছে পেছনে?

—তা তো লেগে পড়ে আছে।

ভূধরবাবু বললে—তবে আর ভাবনা কী? ভেতরে ভেতরে তো আমার নৈবিদ্যি যাকে যা দেবার তা দেয়া আছে। শুধু ইন্সপেক্টরকে একটু খাতির করা, সেটা আপনার লোক করতে পারবে না?

—খুব পারবে, শুধু ভাবনা কী ভাবে খাতিরটা করবে!

—কেন, কী করে খাতির করতে হয় তা কি শেখাতে হয় কাউকে? কলকাতায় হোটেল-টোটেল নেই? বার নেই? একশো দুশো টাকার মদও তো খাইয়ে দিতে পারেন একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে—

—আর মেয়েমানুষ?

ভূধরবাবুরও ইচ্ছে ছিল কথাটা বলবে। বললে—মেয়েমানুষের প্রস্তাব দিয়েছে নাকি?

শিরীষবাবু বললেন—না না, সে রকম প্রস্তাব দেয়নি, কিন্তু আমি ভাবছিলুম যদি একেবারে মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে হাজির করা যায় তো কেমন হয়?

ভূধরবাবু বললে—দিল্লিতে তো ওসব হরবকত্ চলেছে। তা কলকাতাতে চালু হলেই বা দোষ কী! ছেলে ছোকরারা সব ইন্সপেক্টর হয়েছে আজকাল—

শিরীষবাবু বললেন—তাহলে দেওয়াই ভালো, কী বলেন?

ভূধরবাবু বললে—সে যদি কেউ চায় তো দিতে হবে বৈকি!

শিরীষবাবু বললেন—তা সে আর এমন কী দুষ্প্রাপ্য জিনিস। সে আমার লোক আছে, সেই যোগাড় করে দেবে—

জিনিস দুষ্প্রাপ্য না হলেও তার জন্যে তো কাঠখড় পোড়ানো দরকার। শিরীষবাবুর সেজন্যে ভাবনা ছিল। এস-কে-বাগচীকে বাড়িতে পেঁছে দিয়ে এসে গোস্বামী আবার এসে দাঁড়ালো শিরীষবাবুর সামনে। শিরীষবাবুর আশে-পাশে যারা হাজির ছিল তাদের তিনি সরিয়ে দিলেন। বললেন—তোমরা পরে

এসো—এখন যাও—

সবাই চলে যাবার পর গোস্বামী বললে – সব ঠিক হয়ে গেল স্যার, কোনও গোলমাল নেই—

শিরীষবাবু বুঝতে পারলেন না। বললেন—তার মানে ? কি ঠিক হয়ে গেল ?

—বাগচী সাহেবকে একেবারে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে এলাম।

—রাস্তায় কিছু বলছিল বাগচী সাহেব ?

—লোক খুব ভাল স্যার। আমাদের ফ্যাক্টরি দেখে খুব খুশী !

শিরীষবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তাই বললে নাকি ?

—আমার সঙ্গে আর ওসব কথা কী বলবে। তবু কথাবার্তায় মনে হলো আপনার ওপরে খুব খুশী !

—কীসে বুঝলি তুই যে খুশী ?

গোস্বামী বললে—আজ্ঞে, খুশী না হলে আসছে শনিবার দিন সন্ধ্যেবেলা দেখা করতে বলে কখনও ?

—দেখা করতে বলেছে ? কোথায় ?

—আজ্ঞে, পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলে। সন্ধ্যে সাতটার সময়।

—তাই নাকি ?

গোস্বামী বললে—হ্যাঁ স্যার ! বাগচী সাহেব বললেন, শিরীষবাবুর অফিসে গিয়ে মিষ্টি খেলুম না, উনি হয়ত কী মনে করলেন। কিন্তু কোনও কালে তো আমি মিষ্টি খাই না। যদি খেতে হয় তো এমন জিনিস খাই যে হোটেলে ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না— ! তখন আমি বললুম—হোটেলেই খাওয়াবো আপনাকে স্যার। কোন্ হোটেলে খাবেন বলুন ? তো বাগচী সাহেব বললেন—গ্রীন গ্রোভ—

শিরীষবাবু বললেন—ঠিক আছে, শনিবার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—কখন ? ক'টার সময় ?

—সন্ধ্যে সাতটার সময়।

—তা কতো টাকার দরকার ?

গোস্বামী বললে—দুশো টাকা হলেই চলে যাবে স্যার—

—না। ধমকে উঠলেন শিরীষবাবু।—দুশো টাকাতে কী করে হবে ?

গোস্বামী বললে—গাড়ি সঙ্গে রয়েছে, বড় জোর হোটেলে গিয়ে ড্রিংক করবে। একটা লোক আর কত খাবে ? একটা বোতল ? তার বেশি তো কেউ খেতে পারবে না।

—কিন্তু শুধু ড্রিংক হলেই চলবে ? দেবগুরু বৃহস্পতি তো কেউ নয়। সেটা খেয়াল রেখেছিস ?

গোস্বামী বললে—তা তো ভাবিনি স্যার,—

—ভাবিসনি তো এবার থেকে ভাব। বাড়িতে একদিন যা। ভাব-সাব কর, মেয়েমানুষের ঝোঁক আছে কিনা জেনে নে, তারপর তার ব্যবস্থা করবি—

কথাটা ভাল মনে হলো গোস্বামীর। সংসারে কোনও কাজ হাসিল করতে হলে একমন একপ্রাণ নিয়ে লেগে পড়ে থাকতে হয়, এটা তার জানা আছে।

—এই নে, যা—

বলে শিরীষবাবু এক তোড়া নোট এগিয়ে দিলেন গোস্বামীর দিকে। গোস্বামী সেগুলো নিয়ে পকেটে পুরলো। নোটগুলো শিরীষবাবুর সামনে গুনতে নেই। তাতে শিরীষবাবুর মেজাজ গরম হয়ে যায়।

—দেখবি যেন, যা বললুম, সব ঠিক মত হয়।

আর দাঁড়ালো না সেখানে গোস্বামী। মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো সমস্ত ব্যাপারটা। ইঙ্গিতটা শিরীষবাবুই দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়? যে-সে জিনিস নিলে তো চলবে না। ভদ্রঘরের জিনিস হওয়া চাই। বাজারের হলে বাগচী সাহেব বিগড়ে যাবে। কলকাতায় ও-জিনিসের অভাব নেই। গোস্বামী জানে সেসব। একবার ও-পাড়ার দালালদের খবর দিলেই তারা বাড়িতে এসে সাপ্লাই করে যাবে। কিন্তু তাতে তো বাগচী সাহেব তুষ্ট হবে না।

একদিন নিতাই-এর সঙ্গে দেখা হলো। নিতাই ও পাড়ার বহুদিনকার মার্কা-মারা দালাল। সে সব কথা মন দিয়ে শুনলে।

তারপর বললে—দাদা, এসব আমাদের কাজ নয়,—

—তাহলে কার কাজ?

—সে একজন আছে ভবানীপুরে।

—ভবানীপুরে?

—আজ্ঞে দাদা, হ্যাঁ। একজন মহিলা আছেন। টিকে দিয়ে বেড়ান। কিন্তু এই সব কাজে একেবারে পাকা, ঠিক যেমনটি চাইবেন, তেমনটি সাপ্লাই করবেন তিনি। কোনও গভর্নমেন্ট কনট্রাক্টের কাজ?

গোস্বামী বললে—হ্যাঁ, প্রায় সেই রকম—

—তাহলে আপনি সেখানেই যান। টাকা কী রকম খরচ করবেন? বাজেট কত আপনাদের?

গোস্বামী বললে—যা তিনি চান! টাকার জন্যে আটকাবে না।

নিতাই বললে—ঠিক আছে, আমি দাদা আপনাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি, চলুন—

সেই দিনই প্রথম গোস্বামী এসেছিল বেণুদির কাছে।

নিতাই-ই আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলে। মোটা বাজেট এদের। অনেক টাকার গভর্নমেন্ট কনট্রাক্ট! ভালো জিনিস সাপ্লাই করতে হবে। একেবারে

পিওর জিনিস।

—কবে চাই ?

বেণুদি বললে—অনেক রকম জিনিস আছে আমার কাছে, কিন্তু আপনারা ভালো জিনিস চান, আমি ভালো জিনিসই দেব, আপনি পরশু একবার টেলিফোন করবেন।

সেই বন্দোবস্ত অনুযায়ী ঠিক পরশু দিনই টেলিফোন করেছিল গোস্বামী।

এদিক থেকে একজন মেয়ের গলা এসেছিল।

—কে ? কাকে চাই ?

গোস্বামী বলেছিল—বেণুদি কথা বলছেন ?

—না। কী দরকার বলুন। তাঁকে কিছু বলতে হবে ?

গোস্বামী কী বলবে বুঝতে পারেনি। তারপর বলেছিল—তিনি কোথায় গেলেন ? কখন আসবেন ?

—আপনি কে কথা বলছেন ?

গোস্বামী বলেছিল—বলবেন আমি গোস্বামী ! নিতাই-এর লোক—

এর পরেই টেলিফোনটা রেখে দিয়েছিল। তারপর কী করবে, কেমন করে কাজ হাসিল হবে তা বুঝতে পারেনি গোস্বামী। চাকরিতে থাকতে হলে মন দিয়ে কাজ না করলে উপায় নেই। শুধু মন নয়, হয়ত দরকার পড়লে বিবেকও জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। যে তা দিতে পারে সে-ই প্রকৃত চাকর। প্রভুর জন্যে যারা তা করতে পেরেছে, দুনিয়াদারিতে তারাই আজও প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছে।

গোস্বামী প্রথমটায় একটু দ্বিধা-সঙ্কোচের মধ্যে ছিল।

তারপরে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বেলাবেলি সেদিন রান্না করে নিয়েছে সুরমা। নিরঞ্জন কলেজ চলে গেছে দুটি ঝোল ভাত খেয়ে নিয়ে। বলে গেছে—আজ আমার একটু দেরি হবে ফিরতে—

সুরমা রান্না সেরে খেয়ে-দেয়ে বাড়িওয়ালাদের মাসিমাকে গিয়ে বললে—আমি একটু আসছি মাসিমা—

মাসিমা বুড়ি মানুষ। বললে—ওমা, কোথায় যাচ্ছো বৌমা তুমি ?

—আমি একটু এক জ্ঞাতির বাড়ি থেকে আসছি, উনি আসার আগেই চলে আসবো। একটু দেখবেন মাসিমা—

সদর দরজায় পেছন থেকে খিল দিয়ে সেই যে অনেক দূর পর্যন্ত সুরমা হেঁটে এসেছিল তা আজও মনে আছে। গোস্বামী গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল

সেখানে। সরল-সাধারণ গ্রামের প্রাণলক্ষ্মী একদিন পি-এল-৪৮০র প্রলোভনে গৃহপ্রাঙ্গন ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালো। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে মানুষ গৃহস্থের দরজায় এসে ফ্যান চেয়েছে। দুমুঠো খিচুড়ি চেয়েছে। কিন্তু এমন করে আগে কখনও লজ্জা-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মহননের পথে মটর-গাড়ি চড়তে চায়নি।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

গোস্বামী বলেছিল—বলো, তুমি কোথায় যাবে বৌদি—

সুরমা কী করে বলবে কোথায় যাবে সে। এই বিরাট কলকাতা, এখানকার সব জায়গাই তো তার কাছে রহস্য। চলো ঠাকুরপো, কলকাতা চলো।

তারপর সেদিন গোস্বামীর মাথায় এক মতলব এল। গোস্বামী কলকাতাই দেখাবে বৌদিকে। দ্যাখো, কলকাতা দ্যাখো। ওই দ্যাখো কী বিরাট বাড়ি, আর ওই দ্যাখো কী বিরাট বস্তি। ওই দ্যাখো মিছিল চলেছে রাজভবনের দিকে, আর ওই দ্যাখো কত বড় কিউ হয়েছে সিনেমার সামনে!

দেখতে দেখতে সুরমার চোখের সামনে সমস্ত কলকাতা মিলিয়ে গেল। হঠাৎ খেয়াল হলো রাত হয়েছে। ঠাকুরপো কোথায় গেল!

—ঠাকুরপো, ঠাকুরপো—

সুরমা যেন পাগলের মত উন্মাদ হয়ে উঠলো। ঠাকুরপো, ঠাকুরপো—

সুরমার মনে হলো, তাকে এই এক গাড়ির ড্রাইভারের হেপাজতে রেখে সবাই যেন কোথায় পালিয়ে গেল। রাস্তায় মানুষের মিছিল। বাস-ট্রাম আটকে গেছে! কই, ঠাকুরপো কোথায় গেল তাকে এখানে বসিয়ে রেখে? কোথায় গেল ঠাকুরপো?

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

সুরমার এতক্ষণ ভয় করেনি। এতক্ষণ গাড়ি চড়ার আনন্দে সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। এবার আতঙ্ক হতে লাগলো যেন। আশেপাশের লোকগুলো যেন তাকে দেখছে মন দিয়ে। ঠাকুরপো তাকে গাড়ির মধ্যে রেখে কোথায় গিয়ে লুকিয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে না তাকে।

সুরমা এপাশ ওপাশ করতে লাগলো। কোথায় গেল ঠাকুরপো, গেল কোথায়?

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

হঠাৎ সাউথ ইস্ট এশিয়ার সমস্ত ফাঁকটা ভরাট হয়ে গেল একটা আর্তনাদে। ১৯৫৪ সালের ১০ই জুলাই আইন পাশ হলো আমেরিকার সিনেটে। লেখা হলো— Be it enacted by the Senate and House of Representative ইত্যাদি ইত্যাদি। আমেরিকার সিনেট থেকে ঝুড়ি-ঝুড়ি গম, আটা, ময়দা, তামাক, সব আসতে লাগলো। আসতে লাগলো মোটা-মোটা বই। এখান থেকে যাবে মাস্টার, ছাত্র, বৈজ্ঞানিক, ওখান থেকেও তারা আসবে। আসা-যাওয়ার আদমসুমারিতে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা থাকবে—"ভারতবর্ষের বৈষয়িক

উন্নতির জন্য আমেরিকার দান। পাবলিকা-ল' ৪৮০।"

এমনি করে আমেরিকার অকৃপণ দান শুধু একলা ইন্ডিয়াই পায়নি। ইন্ডিয়ার সঙ্গে পেয়েছে আফ্রিকা, মালয়, ইরান, পাকিস্তান সবাই। তার সঙ্গে সঙ্গে কেউ পেয়েছে বোমা-বারুদ-প্যাটন ট্যাঙ্ক স্যাবার-জেট সব কিছু। যত খয়রাতি পেয়েছে তত জিনিসের দাম বেড়েছে, তত মানুষ বেকার হয়েছে; যত এড্ পেয়েছে তত চিৎকার করেছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

—কে?

শিরীষবাবু ঘটনাক্রমে যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে। গাড়িতে বসেই দেখতে পেলেন—তাঁরই তো গাড়ি, দাঁড়িয়ে আছে গলিটার সামনে। কে? গাড়িতে কে বসে আছে?

রামধনি ও-গাড়িটা নিয়ে গোস্বামীকে আনতে গিয়েছিল। গোস্বামী কোথায়?

শিরীষবাবু ড্রাইভারকে বললেন—এখানে একটু রাখো তো, রাখো তো—

গাড়ি থামলো। শিরীষবাবু হন্তদন্ত হয়ে নামলেন গাড়ি থেকে। তারপর গাড়িটার কাছে গিয়ে দেখলেন চেহারাটা ভালো। একে আবার কোথা থেকে যোগাড় করলে গোস্বামী!

—কে আপনি?

সুরমা মুখখানা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে। এ ভদ্রলোক আবার কে? ঠাকুরপো তাকে একলা ফেলে কোথায় গেল? ও ঠাকুরপো, কোথায় গেলে তুমি?

—কে আপনি? গোস্বামী কোথায় গেল?

সুরমা বললে—ঠাকুরপো আমাকে বসতে বলে কোথায় চলে গেল, এখনও আসছে না—

—আপনি কে? কোথায় থাকেন?

রামধনি এতক্ষণ বুঝি কোথাও গল্প করছিল। হঠাৎ সাহেবকে দেখে দৌড়তে দৌড়তে কাছে এসেই স্যালিউট করেছে।

—কোথায় থাকিস তুই? গোস্বামী কোথায় গেল?

রামধনি বললে—গোস্বামীবাবু তো এই সামনের কোঠিতে গেছে হুজুর—

শিরীষবাবু বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর সুরমার দিকে চাইলেন; বললেন—গোস্বামী আপনার কে?

সুরমা বললে—কে আবার? নিজের কেউ না। আমাদের পাড়ার ছেলে.. ঠাকুরপো বলে ডাকি—

—বাড়িতে আপনার কে আছেন?

—আমার স্বামী আছেন।

—তিনি কী করেন ?

—তিনি গোবরডাঙ্গা কলেজে মাস্টারি করেন।

—তাঁকে বলে এসেছেন ? আপনি যে এখানে গোস্বামীর সঙ্গে এসেছেন, তা আপনার স্বামী জানেন ?

সুরমা হতাশ দৃষ্টিতে তাকালো শিরীষবাবুর দিকে। বললে—না, তাঁকে বলে আসিনি—

—কেন, বলে আসেননি কেন ?

—বললে তিনি আসতে দিতেন না।

শিরীষবাবু মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু সব বুঝলেন। সামনে দিয়ে প্রোসেশান চলেছে। ইনক্লাব বলে চেঁচাচ্ছে সবাই। শিরীষবাবু নিজেও এই কলকাতার আর এক মিছিলের শরিক। সে মিছিলে তিনি সকলের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আর এক দাবী জানিয়ে আসছেন। আর সকলের মত তাঁরও টাকা চাই, অগাধ টাকা, অসীম প্রতিপত্তি, অভ্রভেদী সম্মান, অজস্র সুখ, অখণ্ড ভোগসামগ্রী। এই কলকাতার কত অলিতে গলিতে এই তিনিই ঘুরেছেন এক-দিন নারীর সন্ধানে। অবৈধ সুখ আর সম্ভোগের উপচার নিয়ে তিনি কতদিন আসর জাঁকিয়ে ঐশ্বর্য বিলিয়েছেন। শুধু কি হারান নস্কর লেন ? শুধু কি হরিতকী বাগান লেন ? কোন্ লেন, কোন্ গলি বাকি আছে শিরীষবাবুর পদ-স্পর্শ পেতে ?

কিন্তু মেয়েটার চোখ-মুখের ভাব দেখে যেন কেমন মায়া হলো শিরীষবাবুর। বললেন—আপনার বাড়ি কোথায় ?

—হরতুকী বাগান লেন।

—কত নম্বর ?

সুরমা বললে—তা জানি না। গলিটার ভেতর ঢুকেই বাঁদিকের শেষ বাড়িটা। আমার ঠাকুরপোকে একবার ডেকে দিন না! আমাকে বাড়ি পেঁছে দেবে, এতক্ষণে আমার স্বামী বোধহয় কলেজ থেকে এসে গেছে—

—চলুন, আমার গাড়ি আপনাকে বাড়ি পেঁছে দেবে।

সুরমা বললে—কিন্তু ঠাকুরপো— ?

—সে পরে আসবে, তার আসতে দেরি হবে। আপনি আমার এই গাড়িতে উঠুন।

সুরমার ভয়-ভয় করতে লাগলো। কা'র গাড়িতে সে উঠবে! লোকটা কে তাও জানা নেই।

বললে—আপনি কে ? আপনার গাড়িতে আমি কেন উঠবো ? আমার ঠাকুরপোকে আপনি ডেকে দিন। আমি তার সঙ্গে বাড়ি যাবো—

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল সুরমার মুখটা। এতক্ষণ যদি নিরঞ্জন এসে গিয়ে থাকে কলেজ থেকে!

শিরীষবাবু রামধনির দিকে চেয়ে বললেন—রামধনি, একে বুঝিয়ে দে তো, আমি কে—

রামধনি বুঝিয়ে দিলে সুরমাকে। সুরমা শিরীষবাবুর নাম শুনে অবাক হয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে দিলে। তারপর মুখটা নিচু করে বললে—আমি ঠাকুরপোর কাছে আপনার নাম শুনেছি—

শিরীষবাবু বললেন—আপনার কোনও ভয় নেই, আমি নিজে আপনাকে বাড়ি পেঁাছিয়ে দেব—

সুরমা বললে—কিন্তু আমি আমার বাড়ির সামনে আপনার গাড়ি থেকে নামবো না, আমাকে একটু দূরে নামিয়ে দেবেন, নইলে সবাই দেখে ফেলবে—

গাড়ি তখন চলছে। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসেছেন শিরীষবাবু।

সুরমা আবার বললে—ঠাকুরপো আমাকে খুব খুঁজবে, কিছু বলে আসা হলো না—

শিরীষবাবু বললেন—তা খুঁজুক, কেন ওর সঙ্গে আপনি বেরোলেন? কী জন্যে?

সুরমা বললে—আমি বাড়ির মধ্যে থাকি, কিচ্ছু দেখতে পাই না, তাই ঠাকুরপো বলেছিল আমাকে মটর-গাড়িতে করে সব দেখাবে—আমি কখনও মটর-গাড়ি চড়িনি—

—গোস্বামীকে আপনি কতদিন চেনেন?

—ওমা, ঠাকুরপোকে কি আজ থেকে চিনি? রোজ কেবল আমাকে বেড়াতে যেতে বলে, তাই আমি ভাবলাম আজকে উনি দেরি করে ফিরবেন কলেজ থেকে, আজ যাই—

শিরীষবাবু বললেন—আর কখনও কারোর সঙ্গে এমন করে কলকাতা দেখতে বেরোবেন না, সে আপনার ঠাকুরপোই হোক আর যাই হোক, কলকাতার কাউকে বিশ্বাস করবেন না—

সুরমা বললে—কিন্তু আপনার কথায় যে আমি বিশ্বাস করলাম, আপনার কথায় বিশ্বাস করে যে আপনার গাড়িতে উঠলাম—

শিরীষবাবু বললেন—আমাকে বিশ্বাস করবেন না—

—কেন? ও কথা বলছেন কেন?

—কলকাতায় কাউকেই বিশ্বাস করতে নেই বলেই ও-কথা বলছি।

—কেন, কেউ এখানে ভালো লোক নেই বুঝি?

শিরীষবাবু বৌটার কথায় অবাক হয়ে গেলেন। এমন একজন বৌকে গোস্বামী

এখানে নিয়ে এসেছে। গোস্বামীটা আসল হারামজাদা!

বললেন—ভালো লোক? ভালো লোক অভিধানে আছে—ছাপানো বইতে আছে—

বলে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কেন যে এ-রকম হলো কে জানে! এমন তো কখনও হয়নি আগে শিরীষবাবুর। বরাবর খুঁজে বেড়িয়েছেন কোথায় পাওয়া যাবে ভোগ, শুধু ভোগ নয়, অবৈধ সম্ভোগের উপচার। তিনি নিজেই অবাক হয়ে গেলেন নিজের ব্যবহার দেখে।

সুরমাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এসেই খুব ধমক দিলেন গোস্বামীকে।

—তুই লোক চিনলি নে গোস্বামী? ও তুই কাকে নিয়ে এসেছিলি গাড়ি করে? ও কে তোর?

—আজ্ঞে, ও তো আমার পাড়ার বৌদি।

—দূর হারামজাদা, তোর একটা আক্কেল-বিবেচনা বলে কিছু নেই? কাজ হাসিল করতে হবে বলে কি লজ্জা ভদ্রতার বালাই বলে কিছু থাকবে না? আর মেয়েমানুষ পেলি না? বাজারে কি মেয়েমানুষের দুর্ভিক্ষ হয়েছে? এতদিন এ লাইনে আছিস, এ বুদ্ধি তোর হলো না?

সেদিন গোস্বামীর বড় লজ্জা হয়েছিল। অথচ এ-সব কথা কাউকে বলাও যায় না। গোস্বামীর মনের দুঃখ কেউ বুঝবে না। কেউ বুঝবে না কত মেহনত করে তাকে সংসার চালাতে হয়। কত কষ্ট করে শিরীষবাবুর পারমিট লাইসেন্স সব কিছু যোগাড় করে দিতে হয়। বাগচী সাহেবও অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—তোমাকে তো খুব খাটতে হয় গোস্বামী, কখন বেরিয়েছ?

সে-সব কথায় কান না দিয়ে রামধনিকে জিজ্ঞেস করলে গোস্বামী—কীরে রামধনি, বৌদি কোথায় গেল? বৌদিকে যে গাড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম?

—হুজুর, ও তো সাহেব নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে।

—সে কীরে? সাহেব এখানে কোত্থেকে এল? সাহেব এ-পাড়ায় এসেছিল নাকি?

তাজ্জব কাণ্ড। গেল কোথায় তাহলে? বৌদিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সাহেব বাগানবাড়িতে গেল নাকি? কি আশ্চর্য!

এস-কে-বাগচী পেছনে বসে ছিল। গোস্বামী পেছন ফিরে বললে—একটু অনুমতি দেবেন স্যার সিগারেট খাবো—

খানিক পরেই বাগচি সাহেব বললে—থামো—থামো—

একটা হোটেল। হোটেলের সামনেই গাড়ি দাঁড়ালো। বাগচী সাহেব নামতেই গোস্বামী মনে করিয়ে দিলে—তাহলে শনিবার ঠিক সন্ধ্যে সাতটায় স্যার—

বাগচী সাহেব সে-কথার উত্তর না দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল।

১১১

কালিঘাট ট্রাম-ডিপোর সামনেই ওরা বসে থাকে।

ট্রাম-বাস থেকে যে-সব যাত্রী নামে তাদের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখে ওরা। অনেকে নিজেরাই পাঁঠা কিনে আনে। বেশ নধর পুষ্ট দেখে পাঁঠা আনা যায় বাইরে থেকে। কিন্তু কালী-মন্দিরের গায়ে যেসব পাঁঠা বিক্রি হয় তাদের দেখতে কচি বটে, কিন্তু আসলে বয়েসে বুড়ো। না-খাইয়ে-খাইয়ে তাদের রোগা মরকুটে করে রেখেছে ওরা। কচি পাঁঠার দর বেশি। ওই বুড়ো-মরকুটে পাঁঠাগুলোকেই ওরা কচি বলে চালায়—

সুরু হয় সেই ট্রাম-ডিপোর কাছ থেকে। সেখান থেকেই দরদস্তুর দর-কষাকষি, টানাটানি মারামারি, আর ধরাধরির সূত্রপাত।

কেউ চুপটি করে গাছের ছায়ায় রাস্তার ওপরেই উবু হয়ে বসে থাকে।

আবার কেউ বিড়ি টানে, কেউ সিগারেট খায়। কেউ আবার তারই ফাঁকে এক ভাঁড় চা নিয়ে চুমুক দেয়।

কিন্তু সকলেরই চোখ একমুখী। দূর থেকে লোক দেখলেই ওরা চিনতে পারে। গোঁফ দেখলেই ইঁদুর যেমন শিকারী বেড়ালকে চেনে। কেউ নামে নতুন জামা-কাপড় পরে, কেউ খালি গায়ে। ওই কালি-টেম্পল রোডের মোড় থেকেই ওদের দেখা যায়।

ওরা বলে—মন্দিরে পুজো দেবেন নাকি মা?

কেউ জিজ্ঞেস করে—মা'কে দর্শন করবেন বাবুজী? আমি মায়ের পুরোন পাণ্ডা আছি, গঙ্গাজীমে স্নান করবেন, পুজো দেবেন। হামি সব কুছুর বন্দোবস্ত করে দেব বাবুজী—

ওদিক থেকে আর একজন চিৎকার করে ওঠে—এই, বেরো শালা এখান থেকে! আমার যজমান ভাঙাচ্ছিস! হুকুমচাঁদ ভাটিয়া আমার পৈতৃক যজমান, সেই ফ্যামিলির লোক, হীরের বোতাম দেখে চিনতে পারছিস না?

হীরে বোতাম পরে যারা আসে তারা অবশ্য হেঁটে আসে না। বিরাট বিরাট সব গাড়ি। এই বিলিতি-টাকার কম্‌তির যুগে কোত্থেকে যে সে-সব গাড়িগুলো আমদানি হয় তা কেউ বলতে পারে না। গাড়িগুলো হুড়মুড় করে একেবারে পাণ্ডাদের গায়ের ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তবু তারা দমে না। কোনও রকমে সামলে নিয়ে হাওয়া-গাড়ির পেছন-পেছন দৌড়োয়। পাঁই-পাঁই করে দৌড়োয়। দৌড়তে দৌড়তে যেখানে এসে থামে সেটা মন্দিরের পেছন দিক। সেইখানে এসেই তদবির সুরু হয়ে যায়—আমি লছমন পাণ্ডার পোতা হুজুর, আমি মন্দিরের হেড পাণ্ডা হুজুর···

কিন্তু যেদিন হরতাল হয়, স্ট্রাইক হয়, বাস-ট্রাম চলে না, রাস্তায় রাস্তায়

পুলিশ টহল দিয়ে বেড়ায়, সেদিন বড় মুশকিল হয় এদের। এই কালিঘাটের পাণ্ডা আর তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের। সেদিন আর বাজার-খরচটা ওঠে না। চার আনা, চার আনাই সই। দু আনা দু আনাই সই। একটা দোকানে গিয়ে তোমার নামে সওয়া পাঁচ আনার ডালা সাজিয়ে একেবারে মায়ের মাথায় চড়িয়ে দেব। আমি লছমন পাণ্ডার পোতা, আমি মন্দিরের হেড পাণ্ডা হুজুর—

সেদিন ইনক্লাব দেখে পাণ্ডাদেরও কেমন ভয় লেগে গিয়েছিল। আর বোধ হয় কোনও যাত্রী এলো না আজ। এক-একটা করে অনেকগুলো বিড়ি ফুঁকেও কোনও সুরাহা হলো না। সকাল থেকে একটা যাত্রীরও টিকি দেখা যাচ্ছে না।

লছমন পাণ্ডার নাতি শিউকিষণ আসলে পাণ্ডাই নয়, ছড়িদার। তবু দুটো পয়সা পাবার জন্যে যজমানের কাছে পাণ্ডা বলে নিজের পরিচয় দিতে হয়। সেদিন ভোরবেলাই উঠেছে শিউকিষণ। ভোরবেলাই চান করে নেওয়া এদের নিয়ম। তখন কালিঘাটের মন্দিরে দিনের আলো ফোটেনি। অত ভোরেও ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজে। যাত্রীরা এসে মায়ের মন্দিরে ডালা দেয়। মন্তর পড়ে। তারপরে যত বেলা বাড়ে হাড়িকাঠের কাছে জমা হয় যাত্রীরা। কারো মানত আছে পাঁঠা বলি দেবে। কেউ মামলায় জিতেছে, হাইকোর্টের রায় বেরিয়ে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে কালিঘাটে এসে একটা নধর দেখে পাঁঠা কিনে নিয়ে উৎসর্গ করে দিয়েছে মায়ের নামে। সেই পাঁঠাকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে পুরুত ডেকে পুজো করতে হবে। পুরুতকে দক্ষিণা দিতে হবে। তারপর বলি। কামাররা সাত পুরুষ ধরে ওই কাজ করে আসছে। মন্দিরের পুণ্যার্থীদের বাসনা-কামনা-আকাঙ্ক্ষার বলি দিয়ে মজুরির সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠার মুণ্ডুটা ফাউ জুটবে।

কিন্তু সেদিন কেউ এল না। সমস্ত মন্দির থম-থম করছে। যাত্রী নেই, তবু ফাঁকা ঘণ্টাটা ঢং-ঢং করে বাজিয়ে দিলে হেড পুজারী-বামুন মশাই—। এমন সময় ট্রাম-রাস্তার মোড়ে হাজির হলো বুধবারিদের দল। কাঁধে একটা পাঁঠা। বেশ নধর চেহারা। ও আর দেখতে হয় না, না দেখেই চেনা যায়।

—জায়, কালীমাঈকী জায়!

শিউকিষণ দৌড়ে গিয়ে বুধবারিকে আঁকড়ে ধরেছে। আর ওদিক থেকে কালি হালদার। সে এতক্ষণ বিড়ি খাচ্ছিল একখানা আধলা ইটের ওপর বসে বসে।

সেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে বুধবারির ওপর। জায়, কালী মাঈকী জায়!

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

যেন ঠিক একই সঙ্গে গর্জন করে উঠলো ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা। আমরা এড দিচ্ছি, তার বদলে তোমরা আমাদের সেলাম দিচ্ছ না কেন? নেমক্-হারাম, আন্‌গ্রেটফুল জাত, আমরা তোমাদের জন্যে কত মেহনত করছি, তোমাদের ফুড নেই দেখে আমরা কত দয়া করছি, করুণা করছি। আমরা বাড়তি গম, ধান, দুধ, সব কিছু তোমাদের জন্যে পাঠাচ্ছি আর তোমরা আমাদের ধন্যবাদটুকুও

তো কই দিচ্ছ না।

সেই কথাই সেদিন স্ট্র্যান্ড হোটেলের ঘরে বসে বলছিল জুডি হবসন।

এই হোটেলের ভেতরেই আর একটা দল এসেছে আমেরিকা থেকে। তারা ফাউন্ডেশনের টাকা পেয়ে ডেভেলপিং কান্ট্রির মানুষদের কল্যাণের জন্যে অনেক কষ্ট করে দল বেঁধে এখানে এসেছে। তারা জানতে এসেছে কলকাতায় প্রব্লেম কী! এই কলকাতার লোক কী চায়। জানতে এসেছে এখানে বাসে-ট্রামে এত ভিড় কেন হয়। জানতে এসেছে এ-ভিড় কমানো যায় কী করে। আরো জানতে এসেছে এখানকার লোকের আর্থিক অবস্থা কেমন, এখানকার মানুষের মাথা-পিছু আয় কত। এই গরীব মানুষদের কী করে কমিউনিস্টদের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

জুডি বললে—ডু ইউ নো মিস্টার পারকিনসন, তুমি কি জানো, এখানকার হাঙরি লোকরা এখনও ব্রিটিশদের চায়?

মিস্টার পারকিনসন হোয়াইট লেবেল-এর গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলে—হাউজ্ দ্যাট?

—ইয়েস, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। দে ওয়ান্ট আস, দি ব্রিটিশ। দে হ্যাভ টোলড্ মি সো—তারা আমাকে সে-কথা বলেছে—

পারকিনসন-এর তখন বেশ নেশা হয়েছে। বললে—ভেরি ইন্টারেসটিং—তারপর?

ফাউন্ডেশনের লোকেরা ইন্ডিয়ার টাকায় এসেছে অনেক দূরের দেশ থেকে। একদিনে অনেক টাকার হোয়াইট লেবেল আর অনেক টাকার সিগারেট উড়িয়েছে। মাথা ঘামাতে ফাউন্ডেশনের মেম্বারদের অনেক পরিশ্রম হয়েছে। তবু সমাধান হয়নি সমস্যার। সেন্টার বলছে টাকা নেই, হোয়াইট-হাউস বলছে আমরা টাকা দেব। কিন্তু ইন্ডিয়ার ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলছে অত টাকা আমরা কলকাতার পেছনে খরচ করতে দেব না।

—কেন?

এই কেনর উত্তর পেতেই বছরের পর বছর কেটে গেছে। ফাউন্ডেশন থেকে দলের পর দল একস্পার্টরা এসেছে আর শুধু প্ল্যানিং করেছে। এখানে সার-কুলার রেল করবে, মানুষকে আর বাদুড়ের মত ঝুলে-ঝুলে অফিসে-কাছারিতে যেতে হবে না। এখানে বাড়ির অভাবে আর মানুষকে একটা ঘরের মধ্যে বেড়াল-ছানার মত বাস করতে হবে না। এখানকার মানুষ খেতে পাবে, পরতে পাবে, বাঁচতে পাবে, মানুষের মত মাথা উঁচু করে চলতে পাবে। সেই প্ল্যানই তো দিয়ে গেছে এক্সপার্টের দল। কিন্তু…

কথা বলতে বলতে অনেক রাত্রে নেশায় বুঁদ হয়ে আসে এক্সপার্টদের চোখ। সারাদিন কলকাতার মানুষদের জন্যে ভেবে ভেবে তারা অস্থির হয়েছে। সেই

১০ই জুলাই ১৯৫৪, যেদিন থেকে পি-এল ৪৮০ আইন পাশ হয়েছে, সেদিন থেকেই তারা আসা-যাওয়া সুরু করেছে। আর ইন্ডিয়ার উন্নতির কথা ভেবে ভেবে তারা অস্থির হয়েছে।

শুধু মিস্টার পারকিনসন নয়। সংগে আরো এক্সপার্টের দল আছে। তারাও হোয়াইট-লেবেলের নেশা দিয়ে কলকাতার মানুষের দুর্দশার কথা ভুলতে চেয়েছে। তারপর যখন সব এনকোয়ারি শেষ হয়েছে তখন একদিন প্রেস-কনফারেন্স ডেকেছে। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ডেকে চা-কফি-ককটেল-পার্টি দিয়েছে।

প্রেস-কনফারেন্সে মিস্টার পারকিনসন বলেছে—ইন্ডিয়া এক ডেভেলপিং কান্ট্রি। একদিন এ-শহর পাঁচ লক্ষ লোকের জন্যে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু লোক এখন বেড়েছে। এখন এখানে ষাট লক্ষ লোক বাস করছে, কিন্তু এ শহর বাড়েনি। শহরের জলের সাপ্লাই বাড়েনি, শহরের বাড়ির অভাব মেটেনি, শহরের ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা হয়নি। কিন্তু আমরা এসেছি এই শহরের মানুষদের বাঁচাতে। কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এ-শহর না-বাঁচলে ইন্ডিয়া বাঁচবে না। আর এ কলকাতা-শহরকে বাঁচাতে হলে এর কমার্স, এর কালচার, এর সমাজ-ব্যবস্থা, এর সংসার, এর মানুষকেও বাঁচাতে হবে। একদিন যুদ্ধ হয়েছিল, সেকেন্ড গ্রেট্ ওয়ার্লড ওয়ার। সে-ওয়ারে ক্যালকাটা ভাইট্যাল রোল প্লে করেছিল। এখানে এই কলকাতা শহর ছিল সাউথ-ইস্ট-এশিয়ায় সাপ্লাই-বেস। এই সাপ্লাই-বেস থেকেই এখানকার মানুষ পৃথিবীর শান্তির জন্যে অর্থ দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে, ফুড দিয়েছে, যা-কিছু সবই যুগিয়েছে এই শহর। তার ফলে দুর্ভিক্ষ হয়েছে এই কলকাতাতেই। এই দেশ দুভাগ হওয়ার ফলে রেফিউজীরা এসে মাথা গুঁজেছে এই শহরেরই আনাচে-কানাচে। সুতরাং পোস্ট-ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ার স্বার্থে এই শহরের মানুষ যা কিছু স্বার্থত্যাগ করেছে তার জন্যে সে কোনও মূল্যই পায়নি। কোনও স্বীকৃতিই পায়নি। তাই সেই শহরের ইমপ্রুভ-মেন্টের জন্যে আমরা ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গ্যানিজেশান-এর হয়ে এখানে এক্সপার্টের দল এসেছি। এবার আশা করছি এই শহরের বহুদিনের অসুবিধে দূর হবে। যাতে তাড়াতাড়ি তা হয়, তার ব্যবস্থা আমরা করছি। আনন্দের সংগে জানাচ্ছি, আমরা যে প্ল্যান তৈরি করেছি, তা অচিরেই কার্যকরী হবে—

প্রেস-কনফারেন্সে যা-কিছু হবার তা হয়েছে। কিছু কলম, কিছু কাগজ, কিছু কালি নষ্ট হয়েছে। আর এক্সপার্টের দল রিপোর্টে দিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেনে চড়েছে।

কিন্তু তবু সুসীরা আর ঘরে ফিরে যায়নি। অরবিন্দরা এক-কিলো মাংস কিনে নিয়ে গিয়ে গোপাদের খাওয়াতেও পারেনি, অরবিন্দদের মায়েদের অন্ধ চোখে চশমাও ওঠেনি। শিরীষবাবুদের দেওয়া রাবড়ি খেয়ে আফিমের নেশায় শুধু

মৌতাতে মেতে থেকেছে।

আর ওদিকে পি-এল-৪৮০-র দেনা কেবল দফায় দফায় বেড়েছে।

সেদিন আবার টেলিফোন।

—কে?

—আমি গোস্বামী, বেণুদি।

—কী খবর?

—আমি সেদিন টেলিফোন করেছিলাম তোমাকে। তুমি ছিলে না।

বেণুদি বললে—কাজের কথা টেলিফোনে হয় না ভাই, তুমি সামনে এসো। এখানে এসে কথা বলতে হবে—

ঠিক আছে। গোস্বামী সেদিন ভুল করেছিল। মনে মনে আফসোস করেছে সেদিন খুব।

শিরীষবাবু বললেন—তোর কোনও বুদ্ধি সুদ্ধি নেই গোস্বামী—কোন্‌দিন তুই জেল খাটবি দেখছি—কী বলে তোর পাড়ার বউকে গাড়িতে উঠিয়েছিলি, শুনি? কে তোকে ও মতলব দিলে?

গোস্বামী বললে—কেউ মতলব দেয়নি স্যার, বৌদি নিজেই বলেছিল। বৌদিই অনেকদিন ধরে মটরে চড়ে কলকাতা দেখতে চাইছিল—

—তা'বলে গেরস্থ বউকে নিয়ে হাড়িকাটে বলি দিবি?

গোস্বামী মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে—আজকাল স্যার অমন তো আকছার হচ্ছে—

—হোক। তুই একটা গাধা! তোর একটা আক্কেল বলে কিছু নেই! বাগচী কি গেরস্থ মেয়েমানুষ চেয়েছে?

—না, তা চায়নি। মেয়েছেলের কথাই মুখ ফুটে বলেনি বাগচী সাহেব!

—তা ভালো করেছিস! ও-সব কেউ মুখ ফুটে কখনও বলে?

গোস্বামী বললে—আমি ভেবেছিলাম বাগচী সাহেবকে একটু বেশি খুশী করে দেব আর কি—

শিরীষবাবু বললেন—খবরদার, সব দিক ভেবে-চিন্তে কাজ করবি।

সেই কথাই ঠিক ছিল। গোস্বামী টাকাগুলো পকেটে পুরে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। তারপর সেখান থেকে সোজা গিয়ে উঠলো একেবারে পার্ক স্ট্রীটের গ্রীন-গ্রোভে।

কাঁটায় কাঁটায় তখন সন্ধ্যে সাতটা বেজেছে।

একটা বড় কেবিন দেখে সেখানে গিয়ে ঢুকলো। হোটেলের বয় এসে সেলাম

করলে।

আর সংগে সংগে এসে হাজির হলো বাগচী সাহেব।

—এসেছেন? আমি আপনার জন্যে হাঁ করে বসে আছি স্যার। বসুন!

এস-কে-বাগচী বসলো।

—কী খাবেন?

এস-কে-বাগচী বললে—ব্ল্যাক ডগ—

ব্ল্যাক ডগ এল। এস-কে-বাগচীর বড় ফেভ্‌রিট ড্রিংক।

—আপনি খান?

গোস্বামী বললে—আপনি অনুমতি না করলে কী করে খাই স্যার—'

এক চুমুক দিয়েই গোস্বামী উঠলো।

—স্যার, কিছু মনে করবেন না, একটা ভুল হয়ে গেছে, চাবিটা ভুলে এসেছি—

—কীসের চাবি?

—অফিসের ক্যাশের চাবি। আমি যাবো আর আসবো—

তারপর হঠাৎ পকেট থেকে নোটগুলো বার করলে।

বললে—এই টাকাগুলো রাখুন স্যার,—

—কেন, টাকা রাখবো কেন?

—আপনার কাছে একটু রেখে দিন স্যার, আমার যদি একটু আসতে দেরি হয়!

বলে, উঠলো। তারপর তাড়াতাড়ি বাইরে এসেই গাড়িতে উঠে বসলো। বললে—রামধনি, শিগগির চলো, একটু ভবানীপুরে যেতে হবে, শিগগির—

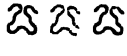

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

—বলো ভাই, ইনক্লাব জিন্দাবাদ!!

অরবিন্দ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কেলো-ফটিক বললে—কী ভাবছেন অরবিন্দবাবু—চেঁচান, চেঁচান—

অরবিন্দ চিৎকার করে উঠলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

কেলো-ফটিক পকেট থেকে কী যেন বার করে মুখে পুরে দিলে।

—কী খাচ্ছো ভাই?

কেলো-ফটিক বললে—চিনেবাদাম ভাজা—পকেটে কিনে রেখেছি দু' আনার, যদি খিদে পায়, তা আপনিও কিনে রেখে দিলে পারতেন—

অরবিন্দ বললে—আমি তো জানতুম না ঠিক, এখন একটু-একটু খিদে পাচ্ছে—

কেলো-ফটিক বললে—খাবার জন্যে আমি আটার রুটি এনেছি, আপনাকে দেব'খন—

—আটার রুটি ? তোমরা সবাই এনেছ ?

কেলো ফটিক বললে—অনেকেই এনেছে, কেউ-কেউ পরোটা আর আলুর দম করে নিয়ে এসেছে। প্ল্যাস্টিকের প্যাকেটে মুড়ে এনেছে। আপনার কিছু ভাবনা নেই, একটু পরেই সবাইকে কোয়ার্টার-পাউন্ড পাঁউরুটি দেবে—

—কারা দেবে ?

—কেন, আমরা এত খাটছি, অমনি অমনি ? আমাদের মেহনত হচ্ছে না ? ফিরে যাবার বাস-ভাড়াও দেবে আমাদের—

তা সত্যিই তাই। খানিক পরে দলের একজন মাতব্বর এক ঝুড়ি পাঁউরুটি নিয়ে সামনের দিকে দৌড়তে লাগলো।—কেউ লাইন ভেঙো না, দু'জন করে চলো।

পাঁউরুটির লোভে যারা লাইন ভাঙতে গিয়েছিল, তারা আবার লাইন মেনে চলতে লাগলো। আর বেশি দেরি নয়। এবার সোজা পা চালিয়ে চললেই একেবারে রাজভবন। কে একজন বললে—ওখানে পুলিশ লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে এগোতে দেবে না। এগোতে না দিক, আমরা তবু এগোব, পুলিশের সাধ্যি থাকে আমাদের আটকাক।

আবার একবার হুড়োহুড়ি পড়লো। পাঁউরুটি! পাঁউরুটি।

—সকলকেই পাঁউরুটি দেওয়া হবে, কেউ লাইন ভাঙবে না। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

—কী হলো অরবিন্দবাবু ? অত অন্যমনস্ক কেন ? সামনে দিয়ে পাঁউরুটি চলে গেল, নিলেন না ?

সত্যিই খেয়াল ছিল না অরবিন্দর। সুসীটা বাড়ি থেকে চলে যাবার পর থেকেই মনটা খারাপ হয়ে ছিল। জামীনের আসামী। দিলীপদা কী ভাববে! যদি আর না পাওয়া যায় সুসীকে। সুসী যদি আর বাড়ি ফিরে না আসে ?

মা সেদিন বলছিল—হ্যাঁরে, তোর সেই বন্ধু আর আসে না তো ?

—কোন্ বন্ধু ?

—সেই যে খুব বড়লোক, এক কিলো রাবড়ি দিয়েছিল, খুব ভালো রাবড়ি ছিল সেটা, তেমন রাবড়ি আর কখনও খেলুম না!

অরবিন্দ রেগে গিয়েছিল। বলেছিল—কেন আসবে সে ? কেন আর রাবড়ি দেবে তোমাকে ? এ-বাড়িতে এসে কি সে খাতির পায় ? কেউ কি তাকে এক-কাপ চা হাতে তুলে দিয়েও খাতির করে ? তার বুঝি মান-অপমান জ্ঞান নেই ?

—কেন, বৌমা খাতির করতে পারে না একটু ? আমার চোখ গেছে, আমি কানা মানুষ তাই, নইলে আমি নিজেই খাতির করতুম—

অরবিন্দ বলেছিল—কেন, তুমি ছাড়া কি খাতির করবার মানুষ নেই বাড়িতে? তোমার মেয়ে তো কেবল খাবে আর ঘুরে বেড়াবে, সে একটু চায়ের কাপটাও এগিয়ে দিতে পারে না?

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

—ও অরবিন্দবাবু, অত অন্যমনস্ক কেন, চেঁচান চেঁচান, ইনক্লাব জিন্দাবাদ! বলুন বলুন, ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

এবার এতক্ষণে একটা কোয়ার্টার-পাউন্ড পাঁউরুটি অরবিন্দের হাতের ভেতর কে গুঁজে দিয়ে গেল। আর বেশি দেরি নেই। এবার বড় হোটেলটার কাছে এসে গেছে। হোটেলের দোতলার বারান্দা থেকে সাহেব-মেমরা ঝুঁকে দেখছে।

—বলো ভাই, ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

মিস্টার পারকিনসন এসেছিল সি-এম-পি-ও-র কাজে এ্যাডভাইস দিতে। ফরেন এক্সপার্ট, অনেক টাকা মাইনে তার। সব নিয়ে মাসে ষোল হাজার টাকা। ওয়ারের সময় আমেরিকান আর্মির কাজে সাহায্য করেছে। অংক কষে কষে বলে দিত সাহেব, কত পয়েন্টে কামান ছুঁড়লে বোমা কত দূরে গিয়ে পড়বে। অনেক সময় এনিমি'র টার্গেটের ওপর এক-একটা বোমা গিয়ে অব্যর্থ আঘাত দিয়েছে। সবই মিস্টার পারকিনসনের কৃতিত্ব। তাকে ইন্ডিয়ায় পাঠানো হয়েছে কলকাতার উন্নতি করবার জন্যে। সাহেব এসে এই স্ট্র্যান্ড হোটেলে উঠেছে আর কলকাতার কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছে।

হঠাৎ রাস্তায় গোলমাল শুনে মিস্টার পারকিনসনও বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে—হোয়াট ইজ দ্যাট?

জুডি আর ক্লারা হবসন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। জুডি বললে—দ্যাট ইজ দ্যাট—

নিচে থেকে অরবিন্দও দেখলে ওপর দিকে চেয়ে। কেলো-ফটিকও দেখলে। সবাই-ই দেখলে।

অরবিন্দ বললে—ও বেটারা বেশ আছে, না রে কেলো-ফটিক?

কেলো-ফটিক বললে—ওরাই তো এখন ইন্ডিয়া চালাচ্ছে অরবিন্দবাবু—

—কেন?

অবাক হয়ে গেল অরবিন্দ। ওরা চালাচ্ছে কেন? আমরা তো এখন স্বাধীন হয়ে গেছি। সাহেবরা তো চলে গেছে—

—আরে না। কে আপনাকে বললে সাহেবরা চলে গেছে?

অরবিন্দ বললে—সে কী? সাহেবরা যায়নি?

—না যায়নি। আপনি তো আমাদের পার্টির মীটিং-এ যাননি। সেদিন তো আমাদের লীডার এসে তাই বলে গেল। পি-এল-৪৮০'র নাম শুনেছেন?

—না তো! সেটা আবার কী?

কেলো-ফটিকরা লেখা-পড়া জানে না বটে, চায়ের দোকানে বসে দিনরাত আড্ডা দেয়। কিন্তু খবর রাখে সব। সারা দুনিয়ার হাঁড়ির খবর মুখস্থ। রাশিয়া ইন্ডিয়াকে 'মিগ' দেবে কিনা, পি-এল ৪৮০ মানে কী, পাকিস্তান আমেরিকার দলে না চায়নার দলে, সব কিছু সে জেনে বসে আছে। এমন ভাবে সে কথাগুলো বলে যেন জনসন কি কিসিগিন কিংবা উইলসন তার কাঁধে হাত দিয়ে আড্ডা দেয়। সে বলে—ব্রিটিশরা চলে গেলে কী হবে, এখন তো তার জায়গায় আমেরিকা এসেছে—

—কী রকম? কোথায় এসেছে? তাদের তো দেখতে পাই না।

কেলো-ফটিক বলে—ওই তো কায়দা রে, পি-এল-৪৮০'র তো ওই কায়দা। জানিস ৫৯৪ কোটি টাকা দেনা আছে আমাদের আমেরিকার কাছে—। আপনার আমার মাথার ওপর সেই দেনা ঝুলছে—

—তোকে কে বললে?

কেলো-ফটিক বললে—ওই যে পাঁউরুটি দিচ্ছে, ও-ই বলেছে—এখন যদি জনসন টাকাটা চেয়ে বসে তাহলেই ইন্ডিয়া চিত্তির—ওই জন্যেই তো ডি-ভ্যালুয়েশন হলো রে—

এসব জানবার কথা নয় অরবিন্দর। তবু কেলো-ফটিকের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে—তাহলে এখন আমেরিকাই আমাদের কর্তা?

—আরে তাছাড়া কী?

হঠাৎ ওদিক থেকে চিৎকার উঠলো—বলো ভাই, ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

আর সকলের সঙ্গে অরবিন্দও চিৎকার করে উঠলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—

জুডি হবসন মিস্টার পারকিনসনের দিকে চেয়ে বললে—লুক লুক—লুক এ্যাট দ্য ফান—

মিস্টার পারকিনসন আমেরিকান আর্মির এক্সপার্ট। গম্ভীর হয়ে সব দেখতে লাগলো। তারপর একটা আমেরিকান সিগ্রেট ধরিয়ে বললে—ইয়েস, দে আর অল কম্যুনিস্টস—

ঌ ঌ ঌ

বুধবারিদের নিয়ে তখন টানাটানি পড়ে গেছে। কালিঘাটের ট্রাম-ডিপোর সামনে কালি হালদার বুধবারির পাঁঠাটার গলা টিপে ধরেছে। বললে—ইধার আও, হাম সব কুছ ফয়শলা কর দেঙ্গে—

শিউকিষণ ছড়িদারও কম যায় না। বললে—ভাগ, তু ভাগ ইঁহাসে, ভাগ—ইয়ে হামার দেশ-ওয়ালি ভাই, ইয়ে হামারা যজমান হ্যায়—

কিন্তু শুধু তো তারা নয়। কালিঘাটের পাণ্ডা আরো আছে। প্রতিদিন তারা উপোষী ছারপোকার মত চুপ করে আড়ালে লুকিয়ে থাকে, আর যাত্রী পেলেই তার টুঁটি টিপে রক্ত চোষে। তারাও কোত্থেকে এসে হাজির হলো সশরীরে। তারাও এসে টানাটানি আরম্ভ করে দিলে।

বুধবারি বললে—ই কেয়া হ্যায় ভাইয়া, কেয়া দিক কর রহা হ্যায়—

বুধবারির বুড়ি মা ভয় পেয়ে গেল। বললে—অ বুধবারি, ই লোগ ক্যায়া কর রহা হ্যায়—

বুধবারির বউ, মেয়ে তারাও হকচকিয়ে গেছে। টানাটানিতে তাদের কাপড়ের গিঁট খুলে যাবার যোগাড়। বুধবারির বউ মেয়েটার হাত ধরে আটকে রাখলে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে না যায়।

আর ওদিকে তখন গোস্বামী ভবানীপুরের একটা সিনেমা হাউসের সামনে গিয়ে বললে—রামধনি, রোখকে—থামো এখানে—

গোস্বামী গাড়ি থেকে নেমে সামনের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে তর-তর করে ওপরে উঠে গিয়ে একটা ফ্ল্যাটের সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।

ফুটো দিয়ে ভালো করে দেখে নিয়ে বেণুদি দরজা খুলে দিলে।

—ওমা, কী খবর গোস্বামী? বলি, এতদিনে মনে পড়লো বেণুদিকে?

গোস্বামী বললে—বা রে বা, তুমি তো বেশ। আমি তোমাকে টেলিফোন করে করে পাই না।

—ওমা, তুমি আবার কবে টেলিফোন করলে আমাকে?

—জিজ্ঞেস করো, তোমার বাড়িতে কে একজন ছিল, সে-ই ফোন ধরেছিল—জিজ্ঞেস করো তাকে—

—আমার বাড়িতে কে আর থাকবে। এক আছে সুসী।

—সুসী কে?

—ওমা, সুসীকে তুমি চেনো না? আমার মেয়ে, বড় ভালো মেয়ে বাবা। যেখানে যাবে একেবারে ঘর আলো করে থাকবে—

গোস্বামী বললে—না না, ঘর আলো করবার দরকার নেই আমার, ঘণ্টা দু'একের মামলা, একটা ইমপোর্ট লাইসেন্সের ব্যাপার—

—ইমপোর্ট লাইসেন্স? তাহলে তো বাবা রেট একটু বাড়াতে হবে।

গোস্বামী বললে—রেট নিয়ে গণ্ডগোল হবে না। তুমি যা চাও তাই দেব—

বেণুদি বললে—আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখি বাবা, শেষকালে তোমার পার্টি কিছু অভদ্রতা করবে না তো?

—অভদ্রতা মানে?

—এই কিস্-টিস্ খেতে পারবে না। গায়ে হাত দিতেও পারবে না।

গোস্বামী অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী? কিস্ না খেলে চলবে কী

করে ? আর শুধু বিস্ তো নয়, যদি শুতে চায় আমার পার্টি, তখন আমি কী বলে ঠেকাবো ?

বেণুদি যেন সাপ দেখে দশ পা পেছিয়ে এসেছে।

বললে—না না না বাবা, আমার সুসী তো বাজারের মেয়ে নয়। সে-সব তুমি আমার কাছে পাবে না। লক্ষ টাকা দিলেও পাবে না। আমার এখানে শুধু স্টুডেন্ট খদ্দের, সে পেতে গেলে তুমি সোনাগাছিতে যাও বাবা—। আমার সুসী জমি কিনবে, বাড়ি করবে বলে ভাড়া খাটছে দু'দিনের জন্যে, তারপর টাকা জমিয়ে একদিন বিয়ে করবে, ঘর-সংসার করবে। এ হলো ভদ্রঘরের গেরস্থ মেয়ে, আমার কাছে ও-সব কথা বোল না বাবা—

তা তাই-ই সই।

—এ্যাডভান্স কত লাগবে ?

—ক'ঘণ্টা আটকে রাখবে আগে বলো ?

—এই ধরো ঘণ্টা তিনেক—তার বেশি নয়। মাল-টাল খেয়ে আমার পার্টি যখন বেহুঁশ হয়ে পড়বে, তখন আমি নিজে তোমার মেয়েকে তোমার বাড়িতে এনে তুলে দেব।

ঠিক আছে। সেই ব্যবস্থাই হলো। বেণুদি ভেতরের ঘরে গিয়ে বললে—সুসী, মা আমার, লোক এসেছে, চলো—

সুসী বললে—তুমি সব দর-দস্তুর করে দিয়েছ তো বেণুদি—

বেণুদি বললে—হ্যাঁ মা, আমি সব পাকা বন্দোবস্ত করে দিয়েছি, তোমার কোনও ভয় নেই, এও স্টুডেন্ট ! তোমাকে তো বলেইছি, আমার এখেনে ব্ল্যাক-মার্কেটারদের কোনও ঠাঁই নেই—আমার সব স্টুডেন্ট খদ্দের—

সুসী সেজে-গুজে তৈরিই ছিল। তবু আয়নাতে মুখখানা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে এল।

রাজভবনের সামনে তখন পুলিশ-পাহারার পাঁচিল উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে। একটা মাছি যেন না ভেতরে ঢোকে। স্ট্রিক্ট অর্ডার দেওয়া আছে পুলিশ-কমিশনারের। রাইফেল, বন্দুক, টিয়ার-গ্যাস সব রেডি। এতটুকু এগিয়েছ কি, তোমার বুকের মধ্যে বুলেট গিয়ে বিঁধবে। কলকাতা শহরে অনেকদিন পরে কিন্নরকণ্ঠী এম. এস. শুভলক্ষ্মী মাদ্রাজ থেকে এসেছে গান গাইতে। শুভ-লক্ষ্মীর গান শুনে রাজভবনের রাজপুরুষ একটু অশান্তি ভুলতে চান। তাই এবার গায়িকার ডাক পড়েছে এই কলকাতার রাজভবনের অন্তঃপুরে। খাদ্যের অভাব আছে বটে দেশে, তা'বলে গান শোনা তো আর বে-আইনী নয়। একটার

পর একটা গান গাও শুভলক্ষ্মী। তোমার গানে কলকাতায় প্রাণ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব হোক। শুভ হোক রাজভবনের রাজপুরুষের সিংহাসন। এমন স্বস্তি-বাচন করো যাতে আমার রাজ-সিংহাসন অটল থাকে।

একে একে গান গেয়ে চলেছেন শুভলক্ষ্মী। খেয়াল-ঠুংরি-ভজন।

রাজপুরুষ বললেন—এবার একটা বাংলা গান হোক্, শুনেছি আপনি বাংলা গানও গাইতে পারেন—

শুভলক্ষ্মী বাংলায় গান সুরু করলেন—রবীন্দ্র-সংগীত—

হে নূতন দেখা দিক আরবার
জন্মের প্রথম শুভক্ষণ!

হঠাৎ যেন মনে হলো বাইরে কাদের চিৎকার সুরু হয়েছে। একটা স্লোগানের মত। বড় কর্কশ শব্দ ওটা। নূতনের আবির্ভাবের সংগে ওই কর্কশ-শব্দটা কানে বড় বেখাপ্পা লাগলো। তাই পুলিশ-পাহারার দল সচকিত হয়ে উঠলো—হুঁশিয়ার—

একটা হুইশ্‌লের শব্দে সমস্ত এস্‌প্ল্যানেড যেন খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়লো।

—বলো ভাই, ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

অরবিন্দ হঠাৎ লক্ষ্য করলে কখন যেন অজান্তে সকলের সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে সে। কেলো-ফটিক কোথায় গেল? আশেপাশে অনেক অচেনা লোক। কাউকেই চিনতে পারলে না সে। তবু কোথা থেকে যেন কে তার সাহস যুগিয়ে দিলে। কে যেন বললে—এগিয়ে চলো অরবিন্দ, এগিয়ে চলো। চিৎকার করো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! দ্বিধা কীসের, সংকোচ কীসের? দেশ তো আমেরিকার হাতে! পাঁচশো চুরোনব্বই কোটি টাকার দেনা। প্রত্যেকের মাথা পিছু আট-হাজার টাকা লোন্। তুমিও খয়রাতির মানুষ। তোমার কে আছে যে তুমি এত ভয় পাচ্ছো? তোমার সুসী তো পালিয়েছে, তোমার মা তো অন্ধ, তোমার গোপা তো রুগ্ন। তোমার তো কেউ নেই দুনিয়ায়। তুমি কার জন্যে ভাবছো?

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

—জায়, কালী মাঈকী জায়!

বুধবারির দল যেন স্রোতের মুখে কুটোর মত তখন ভেসে চলেছে মন্দিরের দিকে। বুধবারিকে পেয়ে সবাই যেন একটা খোরাক পেয়েছে। বুধবারিরাই

তো মা-কালীর খোরাক। মা-কালীর খোরাক, মা-কালীর পাণ্ডাদের খোরাক, রাশিয়ার খোরাক, আমেরিকারও খোরাক। আবার পি-এল-৪৮০-রও খোরাক। কালি হালদার একদিকে আর একদিকে শিউকিষণ! দু'জনেরই যজমান বুধ-বারিরা। বুধবারিরা আছে বলে তাই ওরা পেট চালাতে পারছে। একজন ইণ্ডিয়ার গলা টিপে ধরেছে, আর একজন পা দুটো। একদিকে আমেরিকা, আর একদিকে রাশিয়া।

মিস্টার পারকিনসন হুইস্কির বোতল নিয়ে তখন চুমুক দিচ্ছে আর কথা বলছে জুডি হবসনের সংগে। ক্যালক্যাটাকে আমরা ইম্প্রুভ করবোই। উই মাস্ট্!

জুডি হবসন বললো—নো মিস্টার পারকিনসন, ইউ ওস্ট্। তুমি পারবে না ইম্প্রুভ করতে—

—কেন? হোয়াই?

জুডি হবসন বললে—আমি কথা বলেছি এখানকার সকলের সংগে, ইণ্ডিয়ার ফাইন্যান্স মিনিস্টার তোমাদের ক্যালকাটার উন্নতি করতে দেবে না। তারা বাঙালীকে হেট্ করে, বাঙালীর ভালো হোক সেটা কেউ চায় না।

—ইজ্ ইট্?

জুডি বললে—ইয়েস!

—কিন্তু কেন?

—বাঙালীরা যে সুভাষ বোসের জাত। নেতাজীর জাত। নেতাজীকে এক-দিন আমরা হেট্ করেছি। এখন আবার দিল্লীর রুলিং-পার্টিও বাঙালীদের হেট্ করে—আই পিটি দেম! কিন্তু আই টেল ইউ মিস্টার পারকিনসন্, আমরা নেতাজীকে হেট্ করতুম বটে; কিন্তু প্রেজ্ও করি। হি ওয়াজ আওয়ার উইলিয়াম দ্য কনকারার! কিন্তু সেই নেতাজীর বংশধরদের দেখে এখন আমার মায়া হয়! ইয়েস, মায়া হয়। দুনিয়ার লোকে আমাদের বলে বেনের জাত, বেনের জাত বলে আমাদের হেট্ করে। কিন্তু মিস্টার পারকিনসন্, তোমরা পি-এল-৪৮০ দিয়ে আজ আমাদেরও হারিয়ে দিলে—

রাজভবনের রাজপুরুষের চোখের তারায় তখন নতুন স্বপ্নের ঘোর লেগেছে।

হে নূতন দেখা দিক আরবার
জন্মের প্রথম শুভক্ষণ!

আর পার্ক স্ট্রীটের গ্রীন-গ্রোভের ভেতরে একটা কেবিনের অন্ধকারে বসে এস-কে-বাগচী তখন কিপলেক্স-গ্লাসের ইমপোর্ট-লাইসেন্স নিয়ে পাকা দলিল বানাচ্ছে। ব্ল্যাক-ডগ্ হুইস্কির কড়া মেজাজ, আর তার সংগে আরো কড়া

মেজাজের মেয়েমানুষ সুসী। সুসী জমি কিনবে, বাড়ি করবে, তারপর বিয়ে করবে, সংসার করবে। সুসীর জীবনের ইমপোর্ট লাইসেন্স পাইয়ে দেবে এস-কে-বাগচি। এস-কে-বাগচীর কোলের ওপর বসে সুসী সেই কথাই বলছিল তখন।

হঠাৎ গোস্বামী বললে—স্যার, সুসীকে যেন কিস্-টিস্ করবেন না, বেণুদি মানা করে দিয়েছে—

—ইউ, ব্লাডি ব্যাসটার্ড, সন্ অব্ এ বীচ্—

ব্ল্যাক-ডগ্-এর মেজাজ তখন এস-কে-বাগচীর মাথার রগে গিয়ে ঠেকেছে। মাত্রার ঠিক নেই আর তখন। গেট্ আউট্, গেট্ আউট্ ফ্রম হিয়ার, উইল ইউ?

—না স্যার, আমি কথা দিয়েছি বেণুদিকে, কিস্ খেতে পারবেন না, গায়ে হাত দিতে পারবেন না। ওর সঙ্গে শুতে পারবেন না—

এস-কে-বাগচী চিৎকার করে উঠলো—আমি কিপলেক্স-গ্লাস ইমপোর্ট-লাইসেন্সের মালিক, আই এ্যাম্ দ্য মনার্ক্, ইউ গো টু হেল—

ঌ ঌ ঌ

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

অরবিন্দ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে। কোয়ার্টার-পাউন্ড পাঁউরুটিটা বাঁ-দিকের পকেটে রয়েছে। আর একটা পকেটে রয়েছে বাজারের থলি। দিলীপদা'র কাছ থেকে টাকা হাওলাত্ নিয়ে হাফ-কিলো মাংস কিনতে বেরিয়েছিল। সে সকালবেলার ব্যাপার। তারপর অনেক সূর্য অনেক পথ পরিক্রম করে আরো অনেক দূরে অস্ত গেছে। সন্ধ্যে নেমে এসেছে রাজপুরুষের রাজভবনের অন্তঃপুরে। শুভলক্ষ্মী মাদ্রাজ থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে গান গাইতে এসেছেন। আবার নূতন দেখা দিক নতুন করে, আবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণের আবির্ভাব হোক। তখন আবার নতুন করে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। সেদিন এই মিছিল থাকবে না, এই স্লোগ্যান থাকবে না। সেদিন শুধু তোমার গান শুনবো এখানে বসে বসে শুভলক্ষ্মী। তুমি গাইবে আর আমি শুনবো। তখন পি-এল-৪৮০-র লোন্ শোধ হয়ে যাবে কড়ায়-গণ্ডায়-ক্রান্তিতে। সেদিন সি-এম-পি-ও এই কলকাতাকে আবার নতুন করে গড়ে তুলবে। সেদিন সবাই সস্তায় দু' কিলো করে চাল পাবে সপ্তাহে, চিনি পাবে, গম পাবে। সেদিন আর ভাতের বদলে আলু খেতে বলবো না তোমাদের, কাঁচকলা খেতেও বলবো না। সেদিন তোমাদের সন্দেশ খাওয়াবো, রসগোল্লা খাওয়াবো, রাজভোগ খাওয়াবো, রাবড়িও খাওয়াবো। সেদিন মাংস খাইয়ে তোমার গোপাকে মোটা করে দেব, তোমার মায়ের চোখ সারিয়ে চশমা করিয়ে দেব। সেদিন সুরমাকে গাড়ি চড়িয়ে কলকাতা দেখাবো,

নিরঞ্জনকে ডক্টরেট পাইয়ে দেব। সেদিন সার্কুলার রেল করে দেব, সেদিন সকলের ঘরে ঘরে জল দেব, সকলকে বাড়ি দেব, আশ্রয় দেব, বাসে-ট্রামে বসবার বন্দোবস্ত করে দেব।

কথাগুলো শুনে রাজপুরুষের অন্তঃপুরের সামনে হঠাৎ এক-চক্ষু কামানটা একটা কটাক্ষ করে উঠলো।

ও কামান আজকের নয়। বহুদিন আগে বাংলার গভর্নর-জেনারেল এডওয়ার্ড লর্ড এলেনবরা ওইখানে ওই কামানটা বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তোমাদের জন্যে। ১৮৪৩ সালে একদিন চীনেদের হারিয়ে ওইখানে ওই চীনে-কামানটা বসিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। ১৯৪৭ সালে আমরা চলে গিয়েছিলাম ইন্ডিয়া ছেড়ে কিন্তু ওটাকে রেখে দিয়ে গিয়েছি তোমাদের জন্যে। আমরা জানতুম একদিন তোমরা ওই রাজভবনের সামনে এসে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করবে—আর তোমাদের দিকে তাগ্ করে বুলেট ছুঁড়বে আমার প্রেতাত্মা।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

অরবিন্দ আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলো। ওদিকে বুধবারির পাঁঠাটাও আরো জোরে আর্তনাদ করে উঠলো।

—জায় কালী মাঈকী জায়!

সুসী বললে—আমাকে তুমি জমি কিনে দেবে? বাড়ি করে দেবে মিস্টার বাগচী?

গোস্বামী বললে—ও কী করছেন স্যার? চুমু খাচ্ছেন কেন? গায়ে হাত দিতে বারণ করেছিল যে বেণুদি, গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? আমি কিন্তু স্যার দায়িত্ব নেব না আর—

হঠাৎ ভীড়ের হুড়োহুড়িতে অরবিন্দর পকেটের কোয়ার্টার-পাউন্ড পাঁউরুটিটা পকেট থেকে পড়ে গেছে। কে যেন তুলে নিচ্ছিল। পাশ ফিরেই দেখলে একটা পুলিশ পাঁউরুটিটা কুড়িয়ে নিচ্ছে। আর থাকতে পারলে না। এক লাফে অরবিন্দ পুলিশটার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এক-চক্ষু কামানটা আবার কটাক্ষ করে উঠলো।

হে নূতন দেখা দিক আরবার
জন্মের প্রথম শুভক্ষণ!

হঠাৎ রাজপুরুষ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সুর কাটলো কেন? তাল কাটলো কেন? বাইরে কারা ডিসটার্ব করছে?

এক-চক্ষু কামানটা হঠাৎ আবার একশো বছর পরে সজোরে গর্জন করে উঠলো। আর অরবিন্দর হাত থেকে কোয়ার্টার-পাউন্ড পাঁউরুটিটা খসে পড়লো

এক মুহূর্তে। আর তার সেটা তুলে নেবার ক্ষমতা রইল না। একটা নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে সেই পাঁউরুটিটার দিকেই অরবিন্দ চেয়ে রইল।

আর কামারের খাঁড়ার ঘা লেগে কালীমন্দিরের উঠোনের হাড়িকাঠে বুধবারির পাঁঠাটার মুণ্ডুটা খসে গিয়ে পড়লো দশ হাত দূরে। একেবারে ঘাড় পেঁচিয়ে কাটা হয়েছে। এক মুহূর্ত শুধু। একটু নেচে উঠলো মুণ্ডুটার দু'চোখের তারা দুটো। তারপর সব স্থির। আর ওদিকে রাজভবনের সামনে অরবিন্দর নিশ্চল চোখ দুটোও শুধু সেই চীনে-কামানের দিকে বোবা হয়ে চেয়ে রইল। আর কথা বলতে পারলো না।

রাজভবনের রাজ-অন্তঃপুরে তখন শুভলক্ষ্মীর গানের প্রথম-কলি দু'টো বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

হে নূতন দেখা দিক আর বার ·

সুসীও তখন একেবারে অচৈতন্য। ব্ল্যাক ডগ্ বুঝি হোয়াইট ডগকেও হারিয়ে দিলে। কিপলেক্স গ্লাসের ইমপোর্ট-লাইসেন্স নিয়ে শিরীষবাবুরা আর একটা পাঁঠা সদ্য বলি দিলে গ্রীন-গ্রোভের হাড়িকাঠে।

অরবিন্দ, সুসী, আর বুধবারির পাঁঠাটা তিনজনেই সেদিন একসঙ্গে নিথর নিশ্চল হয়ে বোবা দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রইল কলকাতার দিকে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

ঌ ঌ ঌ

এয়ার-পোর্টে তখন মিস্টার পারকিনসন প্লেন ছাড়বার আগে প্রেস কনফারেন্স বসিয়েছে। সমস্ত নিউজ্‌পেপারের স্টাফ-রিপোর্টার গিয়ে হাজির হয়েছে সেখানে। আজ একটা খুব আনন্দের খবর দেবার আছে আপনাদের। আমরা পি-এল-৪৮০'র টাকা দিয়ে ক্যালকাটা ইমপ্রুভ করবো। আমাদের প্ল্যান কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর টেন ইয়ার্সের মধ্যে আপনারা কলকাতায় প্রচুর জল পাবেন, হাওয়া পাবেন, সারকুলার রেল পাবেন। মানুষের মত বাঁচবার জন্যে যা কিছু উপকরণ দরকার সব পাবেন। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের প্ল্যান সাক্‌সেসফুল।

খানিক পরেই আমেরিকান এক্সপার্টকে নিয়ে জেট্-প্লেন আকাশে গিয়ে উঠলো।

আর আকাশের নিচে মাটির পৃথিবীতে তখন রাজভবনের সামনে আবার আর এক দল মাটির মানুষ চিৎকার করে উঠলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! আর একজন সুসী আর একজন এস-কে-বাগচীর কোলে মাথা রেখে বলতে লাগলো—তুমি

আমাকে জমি কিনে দেবে মিস্টার বাগচী? তুমি আমাকে একটা বাড়ি করে দেবে? আর, আর একজন বুধবারি কালীমন্দিরে আর একটা পাঁঠা নিয়ে এসে আর একবার হাড়িকাঠে চড়িয়ে দিলে। আর একবার চিৎকার উঠলো—কালী মাঈকী জয়!

আর, রাজভবনের ভেতর থেকে রাজপুরুষের কানে আর একজন শুভলক্ষ্মীর গান আর একবার ভেসে আসতে লাগলো—হে নূতন দেখা দিক আরবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।